ভাগবত-ধর্ম্ম

দ্বিতীয় ভাগ।

মহোপদেশক

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ,

ভাগবতরত্ন, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তভূষণ

প্রণীত।

সন ১৩২৬।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

নদীয়া-প্রচার-সমিতি হইতে
শ্রীতারাদাস ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
পোষ্ট নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

কলিকাতা—৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস-লেনস্থ
"ঘোষ-মেশিন-যন্ত্রে"
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

গত বৎসর শ্রাবণ মাসে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে; 'বীরভূমি' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ভাগবত-ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধগুলির মধ্যে যাহা অবশিষ্ট ছিল, এই খণ্ডে সেগুলি পুস্তকাকারে বাহির করিয়া অদ্য কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলাম। "নদীয়ার প্রেমধর্ম্ম" নামে আমার যে খণ্ড-পুস্তকগুলি বাহির হইয়াছিল, তাহার দুইখানি এই খণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন লেখা হইয়াছিল, ঠিক্ সেইভাবেই প্রকাশিত হইল, কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। কেবল পার্শ্বসূচি নূতন যোজনা।

প্রথম ভাগ না পড়িলেও দ্বিতীয় ভাগ পড়িতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। দূরবর্ত্তী ভাবে প্রথম খণ্ডের সহিত সম্পর্কিত হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

প্রথম ভাগ এক হাজার পুস্তক ফুরাইয়া গিয়াছে, উহার দ্বিতীয় সংস্করণ তিন মাসের মধ্যে বাহির হইবে বলিয়া আশা করি।

পৌরাণিক সাধনা, লীলাবাদ ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা বলিবার আছে, এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগও সত্বর বাহির হইবে। এই গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য থাকিলে দয়া করিয়া "নবদ্বীপ" ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানাইবেন। এইরূপ পত্র পাইলে বিশেষ উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব।

ভক্তগণের কৃপাই একমাত্র সহায়—তাঁহারা কৃপা করিলে, এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা দেশবাসিগণকে শুনাইতে পারিব, ইতি।

কলিকাতা
৩রা আশ্বিন ১৩২৬।

কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীকুলদাপ্রসাদ দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র।

ভাগবত-ধর্ম্ম

দ্বিতীয় ভাগ।

১

ভাগবতের ছয়টি প্রশ্ন।

১ নৈমিষারণ্যে বসিয়া শৌণকাদি ঋষিগণ রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাসূতকে ছয়টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এই ছয়টী প্রশ্নের উত্তরে এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র কথিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই প্রশ্ন কয়টী এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

১। পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুম্ অর্হসি।

২। সর্ব্বশাস্ত্রসারং ব্রুহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি।

৩। দেবক্যাং কিমর্থং জাতস্তন্ন শুশ্রূষমানানামর্হস্যঙ্গানু বর্ণিতুম্।

৪। তস্য কর্ম্মাণি ব্রুহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ।

৫। অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতার কথাঃ শুভাঃ।

৬। ব্রুহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ।

ষড়েব প্রশ্নাঃ। এতৎ প্রত্যুত্তরাণ্যেব সপ্রসঙ্গানি শ্রীভাগবতমিতি বিবেচনীয়ম্।

হিন্দু সাধনার লক্ষ্য, সকলের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন কয়টী আমাদিগকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। প্রথম প্রশ্ন এই যে পুরুষ সকলের যাহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল তাহাই বল।

ইউরোপের হিতবাদের লক্ষ্য, এতদপেক্ষা ক্ষুদ্র—কিন্তু সে লক্ষ্য সাধনেও ইউরোপ অকৃতকার্য্য।

এই প্রশ্নের পশ্চাতে একটী খুব বড় রকমের সাহস ও জ্ঞান লুকাইয়া রহিয়াছে। একালের হিতবাদীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ (Greatest good to the greatest number) কি করিয়া হইতে পারে, সে জন্য অনেক আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা অনেক চিন্তা করিয়াছেন। এক দিন হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মত মনীষিও আশা করিয়াছিলেন যে জড়বিজ্ঞানের উন্নতি যেরূপ দ্রুতবেগে হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই এই সামরিক যুগের অবসান হইবে এবং পৃথিবীর সমস্ত মানব আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারই তাঁহার জীবনের শেষ অংশে এই আশায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন যে যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা মানবে মানবে ও জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধিলাভ করা ত দূরের কথা, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাবই আরও বাড়িয়া যাইতেছে। একালের মানুষ সেকালের মানুষ অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে শিখিয়াছে। ইহার নাম উন্নতি, ইহারই নাম সভ্যতা! আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সাহায্যে জগৎকে সুখস্থান করিতে যাইয়া তাহাকে আরও দুঃখময় ও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছি, তাহা একালের অনেক ধর্ম্মপ্রাণ মনীষি ব্যক্তিই অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছেন। যে সমস্ত দেশকে আমরা সভ্য ও উন্নত বলিয়া মনে করি এবং যে সমস্ত দেশকে অনুকরণ করাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র উপায় বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, সেই সমস্ত দেশের সমগ্র অধিবাসীগণের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব একজনকে ধনী ও ভোগশীল করিবার জন্য একশত বা এক সহস্র জন মনুষ্যকে নিরন্ন হইয়া হাহাকার করিতে হইতেছে, জীবন-সংগ্রামে নিষ্পেষিত হইয়া পশু

অপেক্ষাও হীনতর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কেবলমাত্র বাহ্য চাকচিক্যেই আমরা মুগ্ধ হইয়া ঐ সমস্ত দেশের অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, এমন কি জীবন-যাত্রার পদ্ধতি পর্য্যন্ত অনুকরণ করিতেছিলাম। কিন্তু অনুকরণের বিষময় ফল অল্পদিনের মধ্যেই আমরা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য জাতির বাহ্য চাকচিক্যের অন্তরালে যে বিভীষিকা রহিয়াছে, আমাদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে, আবার অপরদিকে পাশ্চাত্য সুধীগণের মধ্যে অনেকের দৃষ্টি, ভারতবর্ষের এই বাহ্য দীনতা ও নগ্নতার পশ্চাতে যে অক্ষয় শান্তি একদিন বিরাজমান ছিল, এত বিপ্লব ও অবস্থাবিপর্য্যয়ের দ্বারাও যাহার এখনও আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শান্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, আজ একটু নূতন অনুরাগের সহিত বিশেষরূপে শ্রদ্ধান্বিতভাবে, শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রথম প্রশ্নটী আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

সুতরাং ভক্তিপূর্ব্বক ও ধীরভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

প্রশ্নটী, পুরুষ সকলের একান্ত মঙ্গল। One ultimate good for all, আমরা বহির্ম্মুখ হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের সাহায্যে মানবের জন্য যে মঙ্গল আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা সার্ব্বকালীন ও সার্ব্বজনীন হয় নাই। যেমন ছোট কাপড় মাথায় দিতে গায়ে কুলায় না গায়ে দিতে মাথায় কুলায় না, আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। একজনের সুখ ও সুবিধা আর দশজনের অসুখ ও অসুবিধার দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে, একদলের সুবিধা অপর দলের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। এক জাতির মঙ্গল অপর জাতিকে দারুণ অমঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। আজ যেমন জগতে অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে কৈ, বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন সফল হইল কৈ? সুখ-সাধনায় বাহির হইয়া আমরা কৃতকার্য্য হইলাম কৈ? আজ যেমন প্রশ্ন উঠিয়াছে, প্রাচীন ভারতবর্ষেও একদিন ঠিক এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। দ্বাপরযুগের প্রকাণ্ড সভ্যতার বিজয়-পতাকা কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যখন একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল,

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান পূর্ণজ্ঞান নহে।

সকলের ঐকান্তিক হিত, কিপ্রকারে সাধিত হইতে পারে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগিয়াছিল, এইজন্য ইহাই ভাগবতের প্রথম প্রশ্ন।

সেই সময়ে এই প্রশ্নটি স্বভাবতঃ সুধীগণের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের প্রারম্ভে ছয়টী প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নটীই যে সকলের অগ্রে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তাহার একটী বিশেষ সার্থকতা আছে। আজ আবার এই প্রশ্ন কেবল ভারতে নহে, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়াই জিজ্ঞাসিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, আমাদিগকে এই উত্তরটী অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত মানবীয় সাধনার পুরোদেশে এক নবীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই সাধনাদর্শের মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। শেষে দেখা যাইবে যে পূর্ব্বোক্ত ছয়টী প্রশ্ন অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত বিজড়িত। সমগ্র ভাগবতগ্রন্থের মীমাংসা আমরা ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধান্বিত ভাবে উপলব্ধি করিব। সম্প্রতি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংক্ষেপে এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর—ভগবৎপ্রেম। ক্রমশঃ ভাগবতে তাহা বিচারিত হইয়াছে।

"তচ্চ প্রেমৈব, ন তু স্বর্গাপবর্গাদিকং ব্রহ্ম পরমাত্মা-ভগবৎসুমুখ্যস্য ভগবৎস্বরূপস্যাপি বশীকারকত্বাদিত্যগ্রিম গ্রন্থে ব্যক্তী ভবিষ্যতি॥"

এই যে একান্ত শ্রেয়ঃ ইহা প্রেম, স্বর্গ, অপবর্গ প্রভৃতি নহে, কারণ ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান এই ত্রিবিধ প্রকাশের মধ্যে শ্রীভগবানভাবই মুখ্য। এই প্রেমের দ্বারা সেই ভগবানকে বশীভূত করা যায়, ইহা এই গ্রন্থে পরে স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে। জগতের জন্য, মানবের জন্য, এই প্রেমের প্রয়োজন। "পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন" মানবজাতিকে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে, তবেই জগতের কল্যাণ হইবে। ইহা ছাড়া জগতের অন্য পথে কল্যাণ প্রাপ্তির আদৌ সম্ভাবনা নাই।

উপাখ্যানের দ্বারা প্রেম-সাধনার উদাহরণ।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে এই মহাধন প্রেম, যাহা বিশ্বকল্যাণের জন্য প্রয়োজন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রেমের সাধনসম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার একটী অতি সুন্দর উপমা দিয়াছেন, তাহা এইরূপ। একজন লোক অত্যন্ত দরিদ্র, বড়ই কষ্টে তাহার দিনপাত হয়। এক দিন একজন সর্ব্বজ্ঞ তাহার বাড়ীতে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন তাহার বড়ই কষ্ট। সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন বাপু, তোমার এত দুঃখ কেন? তোমার পিতার অনেক ধন আছে, তাহা কি তুমি জান না? তোমার পিতা বিদেশে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, এই জন্য তুমি তোমার পিতৃধনের সন্ধান পাও নাই। সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে লোকটী পিতৃধন খুঁজিতে লাগিল। মনুষ্য যেমন শাস্ত্রবাক্য অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ করে সেইরূপ। কিন্তু বাপের ধন আছে, শুধু এইটুকু জানিলেই কিছু ধন পাওয়া যায় না, তখন সর্ব্বজ্ঞ তাহাকে ধন-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিলেন, "এই স্থানে ধন আছে, যদি দক্ষিণ দিকে খনন কর ভীমরুল ও বোল্‌তা উঠিবে, ধন পাইবে না। যদি পশ্চিম দিকে খনন কর, বিপদ হইবে। সে দিকে এক যক্ষ আছে, সে বিঘ্ন ঘটাইয়া দিবে, ধন পাইবে না। যদি উত্তর দিকে খনন কর তাহা হইলে এক ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ অজগর সর্প উঠিয়া পড়িবে, সে হয় ত তোমায় গিলিয়া ফেলিবে; পূর্ব্ব দিকে অল্পমাত্র খুঁড়িলেই ধনের পাত্র হাতে পড়িবে।" সর্ব্বজ্ঞ দুঃখী ব্যক্তিকে এই কথা বলিয়া দিলেন, পরে জিজ্ঞাসিত হইয়া অভিধেয় বা প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যে ভক্তি, তাহার কথা বলিয়া দিলেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ছাড়িয়া * ভক্তিপথে শ্রীভগবানের অন্বেষণ করিতে হইবে। জগতের জন্য এই প্রেমের প্রয়োজন, শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রেম জগতে প্রচার করিছেন, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এই পথের পথিক হইলে তবেই জগতের কল্যাণ হইবে।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্প।

পিতৃধন গৃহে আছে, না জানিয়া কষ্টভোগ।

সাবধানে পিতৃধন বাহির করিতে হইবে।

---

* "ছাড়িয়া" বলিতে উপেক্ষা বা অনাদর বুঝায় না।

"কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেম সুখ-সিন্ধু, পাই তার একবিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়,
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ১।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় প্রশ্ন—প্রথম প্রশ্নে ঋষিগণ শ্রীসূতকে পুরুষ সকলের ঐকান্তিক মঙ্গল কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদের নিকটেও অনেক প্রশ্ন আসে, আমরাও তাহার উত্তর দিয়া থাকি। মানুষ অহঙ্কারী জীব। এই অহঙ্কার যে সব সময়ে মন্দ, তাহা নহে। তবে এই অহঙ্কার অনেক সময়ে তমোগুণের অভিমুখী হয়, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে কালিয় নাগের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। কালিয় খুব বিক্রমশালী, আত্মশক্তিতে তাহার যে নির্ভরতার ভাব তাহা খুবই ভাল, তবে সে বড় মূর্খ, এই জন্য এই আত্মশক্তির সীমা কতদূর তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাই সে গরুড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত তাহার অহিত হয় নাই, সে পলাইয়া যে সীমার মধ্যে আসিয়া লুকাইয়াছিল সেই খানেই শ্রীভগবানের লীলা হইল এবং সেও শ্রীভগবানের একজন চিহ্নিত সেবক হইয়া গেল। মানুষের অবস্থা যে কালিয়নাগের মত হয়, তাহা ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবালোক (Enlightenment) যাঁহারা ধীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। ইউরোপে একটা যুগ কালিয়-নাগের যুগ হইয়া গেল। কালিয় যেমন বিষবীর্য্যে বলীয়ান্ হইয়া বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল

কালিয় নাগের তত্ত্ব—তমোগুণের অভিমুখী রজোগুণ।

মানুষের অবস্থা কালিয়-নাগের মত।

ইউরোপের ইতিহাসে তাহার উদাহরণ।

১ প্রত্যয় করে।

তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নব নব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার সাহায্যে প্রকৃতির বিবিধ ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিয়া মানুষ অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিল। এই সময়ে অতীতের সভ্যতা ও সাধনা মানবের একটা অবজ্ঞার বিষয় হইয়া পড়িল। অতীতের অভিজ্ঞতার সাহায্য লইয়া. অতীতের সহিত পারম্পর্য্যের সূত্র অক্ষুন্ন রাখিয়া, কেবল ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিচারণা শক্তির বলে নহে, মানবকে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই সনাতন ব্যবস্থা; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার নেতৃস্থানীয় ফরাসীদেশ তাহা বুঝিল না। কালিয় যেমন বিষ্ণুর আসন গরুড়ের নিকট মস্তক অবনত করিতে সম্মত না হইয়া তাহার সহিত ফণা তুলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল,—অষ্টাদশ শতাব্দীও তেমনি অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার (the accumulated experiences of the past) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বা শ্রদ্ধান্বিত ভাবে তাহার নিদেশানুযায়ী বিপুল আত্ম-শক্তিকে সংযত করিতে কেমন লজ্জা বোধ করিল। ইহার ফলেই ফরাসী-বিপ্লব। অবশ্য কালিয়ের এই গরুড়ের সহিত যুদ্ধ ও পরাজয় যেমন একেবারে নিস্ফল হয় নাই, প্রথমটা দেখিতে যতই শোচনীয় হউক না কেন, এই ঘটনাই চরমে তাহার পরম কল্যাণ প্রসব করিল, সেইরূপ সমাজ-তত্ত্ববিৎগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে ফরাসী-বিপ্লবের স্বাধীনতাসমরের পরিণতি যতই শোচনীয় হউক না কেন, এই ঘটনাতেই জগৎ এক নবরাজ্যের মধ্যে, এক নবীন বিশ্বজনীন প্রেম ও সাম্যের আদর্শ-নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কালিয় বিষহ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু এই বিষ-হ্রদের তীরে একটি কদম্বতরু আছে, যাহার উপর আরোহণ করিয়া এক দিন কালিয়-দমনকারী শ্রীহরি এই বিষহ্রদে লাফাইয়া পড়িবেন ও ফণার উপর নৃত্য করিয়া কালিয়কে আত্মসাৎ করিবেন।

নবালোক বা Enlightenment এর সময় অতীতকে উপেক্ষা করিয়া ইউরোপের ঔদ্ধত্য— কালিয়-নাগের তুল্য।

যাহা হউক ইহার শেষ-ফল ভাল।

আমাদের দেশে এই অবস্থা কি ভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহারও একটা ইতিহাস আছে। এক দিন রজোগুণ বা অহঙ্কা

আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পূর্ব্বে, সত্য সত্যই আমরা কিছু দিন হইতে একেবারে তমোজালে জড়িত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই জাগরণ যখন আসিল তখন আমরা কালিয়-নাগের মত কিছু বেশী রকমের বাহাদুর হইয়া পড়িলাম। শাস্ত্র না পড়িয়াই পণ্ডিত ও ধর্ম্মবেত্তা হইয়া পড়িলাম। সমস্ত অতীতের সাধনা আমাদের নিকট অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম যে না পড়িয়া ও না ভাবিয়া আমরা সবই বুঝিয়াছি। অতীতের সবই ভুল, সবই কুসংস্কার। ইহাই গরুড়ের সহিত কালিয়ের যুদ্ধ! এই সময়ে বিলাতী "বিবেকবাদ" ও "ব্যক্তিগত অনধীনতাবাদ" আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এইগুলি কালিয়-নাগের ফণা। এখন কালিয় পরাস্ত হইয়াছে, কালিয় হ্রদ বিষময়, এখন কালিয়-দমন হরি হ্রদ মধ্যে উদয় হইলেই কালিয়ের ঐ ফণার উপর তিনি নৃত্য করিবেন। ইহাই আমাদের বর্ত্তমানযুগের ইতিহাস। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ও শ্রীভগবান অভিন্ন। ইহা প্রাচীন মত। ভাগবতধর্ম্মের যদ্যপি যথার্থ আলোচনা হয়, তাহা হইলে আমাদের যুগের যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসম্ভ্রমের ভাব তাহা দূর হইবে, 'বিবেকবাদ' সাধনার দ্বারা অন্তর্যামী চৈত্যগুরু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে পরিণতি লাভ করিবে, "অনধীনতা" কৃষ্ণদাস রূপে আত্মপরিচয় লাভ করিয়া যাহা যথার্থ স্বাধীনতা তাহা অর্জ্জন করিবে। ইহাই আমদিগের জাতীয় সাধনার পথ, শ্রীমদ্ভাগবত এই পথের গুরু। এই যুগের যে তেজস্বিতা ও অনধীনতার ভাব তাহা এখন যতই মন্দ বলিয়া মনে হউক না কেন, শেষে দেখা যাইবে, এ অবস্থা না আসিলে, মঙ্গল হইত না। প্রসঙ্গটী বড়ই জটিল, যাহা হউক পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার আকাঙ্খা রাখিয়া মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতকে পুরুষ সকলের একান্ত মঙ্গল সম্বন্ধে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, সুত নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা বলে তাহার একটা উত্তর দিতে পারেন। যেমন আমরা দিয়া থাকি।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগের সাধনায় কালিয়-নাগের ক্রিয়া।

বিলাতী "বিবেকবাদ" ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বাদ।

ইহা প্রথমে নিন্দনীয়, কিন্তু শেষে শুভকর।

ভাগবত আলোচনায় এই শুভ লাভ করা যাইবে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর নিজের বুদ্ধির সাহায্যে দিলে হইবে না।

ঋষিগণ বলিতেছেন আমরা এপ্রকারের (কালিয়নাগের মত আর কি !) উত্তর চাই না। এই জন্য বলিতেছেন সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম্ম বিচার করিয়া তদনুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্র ও সজ্জনের উপদেশ-নিরপেক্ষ দুর্য্যোধনের আত্মশক্তিতে অতি-বিশ্বাস ও আত্ম-পুষ্টির অবৈধ প্রয়াসেই এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পতনও একটা বড়দরের কালিয়-দমন। কাজেই ঋষিগণ অতীতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন—এই জন্যই সূতকে বলিলেন, "তুমি যাবতীয় ব্রহ্মবিৎ-গুরুগণের চরণমূলে বসিয়া পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, তাহা-দের ব্যাখ্যাসহ পাঠ করিয়াছ—সেই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনার ফলস্বরূপ তোমার যে উত্তর তাহাই আমরা শুনিতে চাই।"

শাস্ত্রানুযায়ী উত্তর চাই—অর্থাৎ অতীতের অভিজ্ঞতার উপর তাহার প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই। ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

শাস্ত্র ও সজ্জন, এই দুইকে বাদ দিয়াই দুর্য্যোধনের বিপদ।

"প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যাহ্যুপদ্রুতাঃ ॥
ভূরিণি ভূরি কর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রুহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

হে সূত ! তুমি দেশকাল-পাত্রজ্ঞ, তুমি সমস্তই জান। এই কলিতে অধিকাংশ লোকই অল্পায়ুঃ, যদি বা কাহারও আয়ুষ্কাল কিছু দীর্ঘ হয় তাহা হইলেও মন্দ অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ে বড়ই অলস। যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহা উপস্থিত সুখ দিয়া পরে দুঃখ দেয়, সে বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যবসায় আছে, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে বা শাশ্বত মঙ্গল সাধনের চেষ্টায় একেবারে পরাঙ্মুখ। যদি বা কেহ উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে সে নির্ব্বুদ্ধি। আর যদি বা দৈবক্রমে সুবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও মন্দভাগ্য, তেমন সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হয় না। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে সুসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহা হইলে রোগ

শোক অভাব প্রভৃতির তাড়নায় সেই সাধুমুখে পরমার্থ বিষয় শুনিবার ও শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার সুবিধা ও অবকাশ ঘটিয়া উঠে না। শাস্ত্রে হয়ত শ্রেয়ঃসাধনের নানারূপ উপায় কথিত হইয়াছে। আমরা তোমার নিকট এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ এবং কলিকালের মানবের পক্ষে সুসাধ্য তাহাই শুনিতে চাই; তাহাই বল। শাস্ত্র অসংখ্য, তৎসমুদয় শ্রবণ করা বহুকাল-সাধ্য ব্যাপার—সুতরাং সেই সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া শ্রেয়ঃ-সাধন নিরূপণ করিবার সম্ভাবনা নাই। বহুবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয় নিশ্চয় করা সুকঠিন, অতএব নিজবুদ্ধির দ্বারা যে সার উদ্ধার করিয়াছ, লোক সকলের মঙ্গলের জন্য, আত্মার প্রসন্নতা-বিধায়ক তাহাই বল।

উত্তর শাস্ত্রানুযায়ী হইবে—কিন্তু অন্ধভাবে তাহা মানিব না—তাহাতে আত্মার সুপ্রসাদ হওয়া চাই।

ঋষিগণ যাহা বলিলেন তাহার আর একটু রহস্য আছে। কেবলমাত্র শাস্ত্রের মর্ম্মানুযায়ী একান্ত মঙ্গল নিরূপণ করাও ঠিক তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে; "যেনাত্মা সুপ্রসীদতি" যদ্দ্বারা আত্মপ্রসাদ হয়। কারণ শাস্ত্র অন্বেষণ করিয়া তো অধিকার ভেদে কথিত নানারূপ কথাই পাওয়া যায়, সে সমস্তকে উচ্চতম সমন্বয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা মানবীয় সাধনার একটী আবশ্যকীয় কথা, এই জন্য আত্মপ্রসাদের কথা বিশেষরূপে বলা হইল। বাহিরে শাস্ত্র ও অন্তরে আত্মপ্রসাদ এই উভয়ের পূর্ণ সমন্বয় যেখানে, সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, যাহার নাম পঞ্চম পুরুষার্থ—

"আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান"

ব্যক্তিগত মনীষা ও স্বাধীন আলোচনা চাই, কিন্তু শাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর দ্বারা তাহা আলোকিত না হইলে বিপদ।

এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ব্যক্তিগত মনীষা অনাদরের বিষয় নহে। তবে শাস্ত্র ও গুরুর দ্বারা আলোচিত ও উপদিষ্ট মনীষার উপরেই নির্ভর করা যায়। নতুবা অসংযত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির মনীষার উপর নির্ভর করিলে অনর্থ অবশ্যম্ভাবী। কালিয়-নাগ প্রথমটা তাহাই করিয়াছিল, তবে সরলভাবে সাহসের সহিত চলিয়াছিল বলিয়া শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারা তাহার জীবন সফল হইয়াছিল।

তৃতীয় প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত পাঁচটী শ্লোকের দ্বারা তৃতীয় প্রশ্নটী কথিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্ন।

"সূত জানাসি ভদ্রংতে ভগবান সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া।
তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারোভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ॥
আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ংভয়ং॥
যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোনুসেবয়া॥
কোবা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্য কর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃনুয়াদ্ যশো কলিমলাপহং॥

শ্রীমদ্ভাগবৎগ্রন্থের যাহা মুল প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রশ্নটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক কয়টীর অর্থ এই।

শ্লোক পাঁচটির অর্থ।

হে সূত তোমার মঙ্গল হউক। সাত্বতপতি শ্রীভগবান্ বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে যে জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা তোমার জানা আছে। তাঁহার অবতার, ভূতসকলের রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য। আমরা শুনিতে ইচ্ছুক, অতএব আমাদের নিকট তাহা বর্ণনা কর। ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়া যাহার নাম গ্রহণ করিলে সদ্যবিমুক্তি লাভ করে এবং স্বয়ং ভয় যাঁহাকে ভয় করে, যাঁহার চরণ মুনিদিগের আশ্রয়, এজন্য তাঁহারা আসিবামাত্র লোকে পবিত্র হইয়া যায়, আর সুরনদী তাঁহার চরণ হইতে নিঃসৃতা, কিন্তু তথায় বিরাজমানা নহেন, এজন্য অবগাহনাদি করিলে শুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই প্রকারের সেই ভগবান্, পুণ্যশ্লোক মনুষ্যগণ তাঁহার কর্ম্ম-সকলের সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন, অতএব আমি পবিত্র হইব বলিয়া কোন্ ব্যক্তি কলিকলুষনাশক তাঁহার যশঃ শ্রবণ না করিবে?

প্রাচীন আচার্য্যেরা সকলেই এই কয়েকটী শ্লোকের বিশেষ মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীপাদ বলিয়াছেন এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিবার সময় ঋষিগণের অত্যধিক ঔৎসুক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ তাঁহারা বিশেষভাবে এই প্রশ্নটীর উত্তর শুনিবার জন্যই যেন লালায়িত। এ জন্য "ভদ্রং তে" তোমার মঙ্গল হউক, এই বলিয়া সূতকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীকৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকায় নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গশ্রবণই শৌণকাদি ঋষিগণের উদ্দেশ্য। শৌণকাদি ঋষিগণ প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, পুরুষ সকলের একান্ত মঙ্গল কি? এই শ্রেয়ঃ সকল শাস্ত্রের সার নিষ্কাষণ করিয়া আমাদের যাহাতে আত্মপ্রসাদ হয়, এমন ভাবে নির্ণয় কর। (কেবল শাস্ত্র-সিদ্ধ হইলেই যে হইবে তাহা নহে, আত্মপ্রসাদও চাই।) এই দুইটি প্রশ্ন করার পর ঋষিগণ বলিতেছেন "দেখ সূত, এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি, আমাদের এইরূপ মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনাই শাস্ত্র ও আত্মপ্রসাদের দ্বারা স্বীকৃত সেই অব্যভিচারী মঙ্গল।" শ্রীজীব গোস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আত্মপ্রসাদের দ্বারা স্থিরীকৃত যে অব্যভিচারী মঙ্গল—তাহা কৃষ্ণলীলা আলোচনা দ্বারা প্রাপ্তব্য ঋষিগণ ইহা সাধারণভাবে জানিতেন—ভাল করিয়া জানিবার জন্য প্রশ্ন করা হইতেছে।

এইবার প্রশ্নটী বেশ ধীরভাবে আলোচনা করা যাউক। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাত্বতপতি শ্রীভগবান্, বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন (মূল শ্লোকে 'জাত' এই পদটী আছে, ক্রমসন্দর্ভ টীকায় ইহার অর্থ করা হইয়াছে "জগদ্দৃশ্যোবভূব") তোমার অবশ্য তাহা জানা আছে। তুমি পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ, বেদব্যাস ও অন্যান্য পারদর্শী গুরুগণের নিকট পাঠ করিয়াছ ও ব্যাখ্যা করিয়াছ, অতএব এত বড় আবশ্যকীয় একটী বিষয় তোমার কেননা জানা থাকিবে? প্রশ্নটীর ভাষা হইতে এই-টুকু পাওয়া যাইতেছে যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ জগতে প্রচারিত হওয়ার বহুপূর্ব্ব হইতেই শ্রীভগবান্-রূপে সেই পরতত্ত্বের উপাসনা, বিশ্বের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁহার জগতে আবির্ভাব, বিশেষ করিয়া

বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে তাঁহার জগতে লীলা, ইহা প্রচারিত ছিল। কিন্তু সকল শাস্ত্রের সার, সকল তত্ত্বের ও সকল সাধনের শিরোমণি এই গূঢ় তত্ত্ব সার্ব্বজনীন ছিল না, অথবা ইহা বুঝিবার ও ইহাতে বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের ছিল না; কিন্তু এই তত্ত্ব চিরকালই জগতে প্রচলিত ছিল। শ্রীভগবান্‌কে এই স্থলে "সাত্বতাং পতিঃ" বলা হইয়াছে, ইহার একটী বিশেষ সার্থকতা আছে। পদটির অর্থ এই "সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ যাহাদের উপাস্য, তাঁহারা সাত্বত বা ভক্ত।" শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রচার হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বা সৃষ্টির প্রথম হইতেই এই সাত্বত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গূঢ় তত্ত্ব প্রচলিত ছিল, তাঁহারা এই রহস্য আনুপূর্ব্বিক জানিতেন, তাঁহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে, তবে সাধারণ লোক ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী ছিল না। (সাধারণ লোক বলিতে তত্ত্ববিৎগণ এই বুঝেন যে যাহারা এই কল্পের প্রথমে জীবনপথে পর্য্যটন আরম্ভ করিয়াছেন এবং ক্রমোন্নতির পথে সাধারণভাবে অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত সাধন-ব্যতিরেকে অগ্রসর হইতেছেন। কারণ সাত্বতগণ অগ্রবর্ত্তী জীব, আর নারদ প্রভৃতি যাঁহারা এই সম্প্রদায়ের গুরু, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেই জীবন্মুক্ত হইয়া কেবল এই তত্ত্বপ্রচারের দ্বারা জগতের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য দেহধারণ করিয়াছেন।)

কৃষ্ণের উপাসনা সাত্বতগণ পূর্ব্ব হইতেই করিতেন, তবে সর্ব্বসাধারণে তেমন জানিতেন না।

এখানে আমরা এইটুকু পাইতেছি যে শ্রীভগবান্‌রূপে পরতত্ত্বের উপাসনা, তাঁহার বিশ্বমঙ্গলের জন্য আবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার লীলা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত ছিল। শৌণকাদি ধর্ম্ম-পিপাসু ঋষিগণ পরম্পরায় এ কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে জানিবার তাঁহাদের পূর্ব্বে সময় হয় নাই। এখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বাপরযুগ অবসান, আর তাঁহারাও নানারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, কত যজ্ঞ তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে তাঁহারা অকূল

ঋষিগণ জীবন-ব্যাপী সুকঠোর সাধনায় বুঝিয়াছেন, এই কৃষ্ণকথা মানবের চরম ও পরম মঙ্গল-দায়ক—সেই জন্য প্রশ্ন করিয়া সূতের নিকট সকল কথা শুনিতে চাহেন

পাথারে ভাসিতেছেন, আবার নিজেদের জন্য যতটা না হউক, আসন্ন কলিযুগে জীবগণের কি উপায় হইবে, এই চিন্তায় তাঁহারা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এখন সেই সাত্বত-সম্প্রদায়ের মত তাঁহাদের মনে পড়িয়া গেল, মনে হইল ইহাই একমাত্র ঔষধ, যাহার সাহায্যে আমাদের ও কলিসাগরে নিপাতিত নিখিল জীবের কল্যাণ হইবে। তৃতীয় প্রশ্নটী বেশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া ধীরভাবে ইহার অর্থ চিন্তা করিলে, যাহা বলা হইল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

হিন্দু সাধনার প্রকৃতি না জানায় আধুনিক সমালোচকেরা গুরুতর ভ্রান্তি করিয়া থাকেন।

এইটুকু বুঝিতে পারিলে আর একটী অতি আবশ্যকীয় কথা বুঝিতে পারা যাইবে। একালের একদল সমালোচক আমাদিগকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন যে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হয় নাই, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে এই সমস্ত বিষয় কাল্পনিক। পরবর্ত্তী গ্রন্থে রহিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে নাই, সুতরাং ঐতিহাসিকের সাধারণ ধারণা অনুসারে পরবর্ত্তী গ্রন্থের কথার বিশেষ প্রামাণিকতা নাই। ঠিক এই ভাবের চিন্তাপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের যাহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে নাই, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বা শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে আছে, তাহাও এইরূপ কল্পনাপ্রসূত। এই প্রশ্নটীর এই স্থলে উত্তর দেওয়া আবশ্যক। হিন্দুর পৌরাণিক বা অন্তর্জ্জাগতিক চিন্তা-পদ্ধতির সহিত একেবারে পরিচয় না থাকার জন্য, পুরাণ ও লীলা জিনিষটা কি, কি প্রকারে তাহা প্রাচীনেরা বুঝিতেন, তাহা আদৌ না জানার জন্যই, এই প্রকারের মতবাদ নির্ভয়ে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রথমে একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। সেক্‌স্‌পীয়র যখন জীবিত ছিলেন সে সময়ে তাঁহার কবিপ্রতিভার অলৌকিকতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই, এমন কি স্বদেশে তাঁহার শক্তির মূল্যও অবধারিত হয় নাই, তাহার পর যত দিন যাইতেছে তাঁহার

প্রতিভার অলোকসামান্যত্ব সম্বন্ধে ততই নব নব মত প্রচারিত হইতেছে। ইহা হইতে কি এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে, সমসাময়িক লেখকগণ এই অনন্যসাধারণত্ব উল্লেখ করেন নাই বলিয়া ইহা কাল্পনিক ?

শ্রীকৃষ্ণের যে শ্রীবৃন্দাবন-লীলা তাহা মানব-হৃদয়ে মাধুর্য্যানুভূতির পরাকাষ্ঠা। শ্রীভগবান্ লীলা করিয়াছেন; যাহা নিত্য ও প্রপঞ্চাতীত, যোগমায়া-প্রভাবে প্রাকৃত প্রপঞ্চে তাহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অহঙ্কারী মানব আত্ম-কর্তৃত্বই দর্শন করে, সে লীলা দর্শন করে না, তাহার সম্মুখে লীলা হইলেও তাহার গভীরতার মধ্যে সে প্রবেশ করিতে পারে না।

শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবন-লীলা সম্বন্ধে আচার্য্যগণ যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে, ভগবদ্গীতা সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে বিঘোষিত হইবার পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রচার করা অনাবশ্যক। দু-এক জন ব্যতীত সাধারণের তাহা ধারণার অতীত। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের এই নবধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে একটী অতি আবশ্যকীয় ঘটনা, এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহা আমাদিগকে বেশ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বের ঘটনা হইলেও, কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে কৃষ্ণকথা প্রচার হইতে পারে না।

অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা, ভারতের যাবতীয় ক্ষত্রিয় বীর, অষ্টাদশ দিবস রণহুঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া, স্বর্গে দেবগণের ও পাতালে নাগগণের ত্রাস উৎপাদন করিয়া আজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য কামনা করিয়াছিলেন "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও ছাড়িয়া দিব না," ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিজ্ঞা, আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, জয়দ্রথ, শল্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরেন্দ্রগণ জীবন পণ করিয়া তাঁহার কামনা পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কামনা পূর্ণ হইল না। এই চেষ্টায় দ্বাপরের ক্ষাত্রশক্তিপ্রধান বিরাট সভ্যতা একেবারে

অহঙ্কারের যুগ বা ক্ষাত্রশক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ অবসান হইলে

চূর্ণ হইয়া গেল। হায় অহঙ্কার, হায় আত্মপুষ্টির চেষ্টা। এই অবস্থায় সকলেরই দৃষ্টি স্বভাবতঃ সেই অর্জ্জুনের রথের সারথি নিরস্ত্র নবীন জলদশ্যাম "বাঁকা বংশীধারী"র প্রতিই পতিত হইল।

নারদের উপদেশে এই কথা ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হইয়াছে।

অহঙ্কার চূর্ণ হওয়ার পর, রজঃগুণপ্রধান ক্ষাত্রযুগ শেষ হওয়ার পর, যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, যেমন ভীষ্মদেব ও কুন্তীদেবী, যাহারা এই লীলার কিছু কিছু জানিতেন, তাঁহারা নির্ভয়ে সমস্ত কথা বলিলেন। লোকে শুনিল, শুনিয়া বিস্মিত হইল, এক নূতন রহস্য-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল, এতদিন জগৎব্যাপারসম্বন্ধে তাঁহাদের যে সব ধারণা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গেল—লোকের, এই শ্রীকৃষ্ণ রহস্য সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্য আগ্রহ হইতে লাগিল। নারদ সমস্তই জানিতেন, তিনি ব্যাসদেবকে সূত্র বলিয়া দিলেন, নারদের শক্তিতে এক নবচেতনায় জাগ্রত হইয়া ব্যাসদেব সমাধিস্থ হইলেন, যেমন দেখিলেন, বর্ণনা করিলেন! তাঁহার পুত্র শুকদেব, এত দিন নির্গুণ ব্রহ্মবাদে তুষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, এই নূতন তত্ত্ব তাঁহাকে সুধার ন্যায় মিষ্ট লাগিল। তিনি পিতার নিকট এই তত্ত্ব শিক্ষা করিলেন। তাহার পর মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও প্রায়োপবেশন, বিশাল ঋষি-সভায় এক সপ্তাহ ধরিয়া শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে এই শাস্ত্র কথিত হইল। উগ্রশ্রবা সূত তাহা শুনিলেন, তিনি আসিয়া নৈমিষারণ্যে শৌণকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত ছয়টী প্রশ্নের উত্তরে এই গ্রন্থ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন, নৈমিষারণ্য হইতে বেদের সার স্বরূপ এই মহাগ্রন্থ জগতে প্রচার করা হইল। তৃতীয় প্রশ্নটীর মর্ম্ম ধীর ভাবে আলোচনা করিলে এই একটি জটিল রহস্য আমরা বুঝিতে পারিব।

সাধারণ ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণলীলার আলোচনা করিলে প্রাচীন সাধনরহস্য বুঝিতে পারা যাইবে না।

ঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত **চতুর্থ প্রশ্নটি** এই।

"তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রুহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ॥"

সাত্বতপতি শ্রীভগবান্, যিনি দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে

আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি লীলায় ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার কর্ম্মসমূহ অত্যন্ত উদার। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, এ সমস্তও তাঁহার কর্ম্ম; আর লীলায় আবির্ভূত হইয়া জন্ম-ধারণ আদি যাহা কিছু, তাহাও তাঁহার কর্ম্ম। এই সমস্ত কর্ম্ম অত্যন্ত উদার। প্রথমতঃ মহান্ অর্থাৎ চিন্তা করিয়া আমরা তৎ-সমুদয়ের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারি না, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। তাহার পর পরমানন্দদায়ী বা ভক্তজনের অভীষ্টপ্রদ। তাঁহার এই সমস্ত কর্ম্ম অবগত হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। নারদাদি জ্ঞানীগণ তাহা সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন। আমাদের অন্তকরণে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, অতএব হে সূত! তুমি আমা-দিগকে সেই কথা শ্রবণ করাও।

তৃতীয় প্রশ্নে ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কি নিমিত্ত আবির্ভূত হইলেন। চতুর্থ প্রশ্নে বিশেষ ভাবে তাঁহার সমগ্র লীলা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

চতুর্থ প্রশ্নের বঙ্গানুবাদ আমরা প্রাচীন আচার্য্যগণের টীকা অনুসারে প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রশ্নটী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই প্রশ্নটীরও পশ্চাতে তৃতীয় প্রশ্নের ন্যায় ভারত-বর্ষের প্রাচীন আর্য্যজাতির ইতিহাসের ও গবেষণার অনেক ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নের মর্ম্ম ব্যাখ্যাকালে যে সমস্ত চিন্তাপদ্ধতির আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত চিন্তাপদ্ধতি আরও স্পষ্টরূপে এই প্রশ্নটীর পশ্চাতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রশ্ন ছয়টীর মর্ম্ম উপলব্ধিকালে একটী কথা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখা উচিত। এই ছয়টী প্রশ্নের মধ্যে সম্বন্ধ কি? সমস্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে একটী সুন্দর যোগসূত্র (connecting link) লম্বিত রহিয়াছে। এই সম্বন্ধসূত্রটুকু উপলব্ধি করিলে কেবল যে এই ছয়টী প্রশ্নেরই গভীর মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে তাহা নহে, প্রাচীন আর্য্যজাতির সাধনার ইতিহাসে এই অমূল্য লীলাগ্রন্থ

প্রশ্ন ছয়টি পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

এই সম্বন্ধ বুঝিলে শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারা যাইবে—এবং শ্রীকৃষ্ণ লীলাও বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান কোথায় তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে, এবং সাধকগণ কর্ত্তৃক নানাপথে নানাভাবে তত্ত্বান্বেষণের জটিল ও বিশাল ইতিহাসে পূর্ণব্রহ্মরূপে যে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা, তাহারই বা স্থান কোথায়, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের আলোচনায় বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় ইহাই একমাত্র পথ। প্রাচীন আচার্য্যেরা কি ভাবে এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ প্রশ্নের সুস্পষ্ট বিবৃতি।

চতুর্থ প্রশ্নটী আমরা প্রথম তিনটি প্রশ্নের সহিত মিল করিয়া এই ভাবে বিবৃত করিতে পারি। **অখিল শাস্ত্রের যাহা সারসিদ্ধান্ত তাহার দ্বারা প্রস্তাবিত এবং আত্মপ্রসাদ বা আত্মপ্রত্যয় কর্ত্তৃক সমর্থিত বা স্বীকৃত যে সার্ব্বজনীন অব্যভিচারী শ্রেয়ঃ, তাহা সাত্বতপতি শ্রীভগবানের দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে যে আবির্ভাব, সেই আবির্ভাবের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার উদার কর্ম্ম-সমূহ কীর্ত্তন কর।**

পরে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাশ্রবণ সর্ব্বপ্রকার সাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধনা। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন, যে এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শুনিবার ইচ্ছা হইলেই ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ বা স্থিরীকৃত হয়েন। অন্যান্য শাস্ত্রের দ্বারা বা অন্যান্য সাধনার দ্বারা ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিরীকৃত হয়েন বটে কিন্তু বিলম্বে। এই স্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এই শাস্ত্র শ্রবণের যদি এতই মহিমা তাহা হইলে সকলে শ্রবণ করেন না কেন? ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় বলিতেছেন

ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছা হইলেই ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিরীকৃত হয়েন—তবে পুণ্য-ব্যতীত ইচ্ছা হয় না।

"শ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যতে।" অর্থাৎ এই যে শুনিবার ইচ্ছা পুণ্যব্যতীত তাহা উৎপাদিত হয় না। শ্রবণের ইচ্ছা পুণ্য ব্যতীত যে কেন উৎপাদিত হয় না, সে সম্বন্ধে দু একটী কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। সংসারে যাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানীলোক বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের নিকটে

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা উল্লেখ করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধার সহিত নাসিকা কুঞ্চন করিবেন। মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়, কোন্ চিন্তার কিরূপ বর্ণ, অথবা যোগের দ্বারা কিরূপে অতিপ্রাকৃত কার্য্য সাধন করা যায়, এ সমস্ত কথা আলোচনা করিতে বলিলে তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিবেন। তাঁহারা সরলচিত্ত লোক। কিন্তু এরূপ কেন হয়? ইহার কারণ এই যে লীলার যে কোন গভীর অর্থ আছে, ইহা তাঁহারা জানেন না। সাধারণ উপন্যাস বা গল্পের পুস্তকের সহিত লীলাগ্রন্থকে তাঁহারা একশ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ভাল লোক, তাঁহারা মনে করেন যে এ গল্পগুলি ভাল— সাধারণ লোকে এই সমস্ত কৌতূহলোদ্দীপক সুন্দর গল্পাদি শ্রবণ করিলে উপকৃত হইবে। কিন্তু ইহা সাধারণ অশিক্ষিত লোকের জন্য। যাঁহারা অধ্যাত্ম-রাজ্যের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের জন্য এই সমস্ত পৌরাণিক কথার প্রয়োজন কি? আবার আমাদের দেশে যাঁহারা লীলাগ্রন্থের প্রচারক তাঁহাদের ধারণাও যে উচ্চ তাহা নহে। তাঁহারাও শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায়শঃই বিশ্বাস করেন না। অথচ তাঁহারা ব্যবসায়ী লোক, নিজে বুঝুন বা না বুঝুন, বিশ্বাস করুন বা না করুন, জনসমাজে তাহা প্রচার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে, কাজেই, নিজেও বুঝেন না, শ্রোতৃমণ্ডলীও বুঝেন না এই প্রকারের কাল্পনিক ও উৎকট ব্যাখ্যা বাহির করিয়া অথবা নানারূপ সঙ্গীত, হাস্য, কৌতুক প্রভৃতির দ্বারা সরস করিয়া জনসমাজে পৌরাণিক কথা প্রচার করিয়া থাকেন। আবার যাঁহারা শোনেন তাঁহারা যে ঠিক বুঝিয়া শোনেন বা বিশ্বাস করিয়া শোনেন, তাহাও নহে। কেহ গান শোনেন, কেহ কৌতুক শোনেন, যাঁহারা ভাল লোক তাঁহারা মনে করেন, কিসে কি হয়, কে জানে? লোকে বলে শুনলে পুণ্য হয়, আচ্ছা শোনা যাউক। এই প্রকারে "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" অন্ধকর্ত্তৃক

লীলা সম্বন্ধে নানাজনের নানারূপ ভ্রান্তি।

অদ্ধগণ পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু ইহা বেশ ভাল অবস্থা নহে।

প্রকৃত প্রস্তাবে লীলাগ্রন্থ শ্রবণের ইচ্ছা কখন হইতে পারে? প্রথমতঃ আমরা ভগবান যে আছেন ইহাতেই বিশ্বাস করি না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এক অতিপ্রাকৃত রকমের বা কিম্ভূত-কিমাকার রকমের ধারণা তাঁহার সম্বন্ধে পোষণ করেন। তাঁহাদের লীলা শ্রবণে ইচ্ছা হইবে কেন? লীলা শ্রবণের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে এই কয়েকটী বিষয় উপলব্ধি করা চাই, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিনটী শ্লোকের মধ্যে সংক্ষেপে অথচ অতীব সুন্দর-ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমেশ্বর আছেন। তিনি পরমার্থ-সত্য। জগতে যাহা কিছু সত্য বলিয়া প্রতীত হয় সমস্তই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান। এই বিশ্বের সৃজন-পালন-লয় তাঁহা হইতেই হইতেছে। তিনি যে বিশ্বের বাহিরে বসিয়া রহিয়াছেন তাহা নহে, অন্তর্যামীরূপে, ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। তিনি বেদ দিয়াছেন, মানবকে তিনি আনন্দলোকে অমৃতলোকে লইয়া যাইবার জন্য নিয়ত ব্যাকুল, এই ব্যাকুলতায় তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই জন্য তিনি জগতে প্রকটিত হইতেছেন।

লীলাশ্রবণের ইচ্ছা হয় কখন?

ভগবান পরমার্থ সত্য, তিনি, অন্তর্যামী, ভূমা, বেদদাতা এবং তিনি প্রকট হয়েন, এইগুলি বুঝিলে তবে এই ইচ্ছা হয়।

এই সমস্ত প্রাথমিক বিষয় উত্তমরূপে কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়া নহে, এই ভাবে ভাবিত চিত্ত হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করিতে হইবে। এই সমস্ত প্রাথমিক বিষয় সম্বন্ধে যদ্যপি কাহারও সন্দেহ থাকে, অথবা বিশ্বঘটনায় শ্রীভগবানের মহীয়সী ও আনন্দময়ী লীলাশক্তির বিকাশ হইতেছে ইহা ধারণা করিবার মত হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলন যদ্যপি কাহারও না হইয়া থাকে, তাহা হইলে লীলাগ্রন্থ শ্রবণের যাহা প্রকৃত ফল তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন। আমরা পূর্ব্বে কয়েক স্থলে বুদ্ধির ভূমির কথা বলিয়াছি এবং এই বুদ্ধির ভূমিতে দাঁড়াইয়া গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই লীলাগ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়, সে কথাও বলা হইয়াছে।

ইহাই বুদ্ধির ভূমি।

প্রথমে বুদ্ধির ভূমিতে আরোহণ করিয়াই যে সকলে এই শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন তাহা নহে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা আবার শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে শুনিতে এই ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিবেন। সরল চিত্ত ভক্তিসাধকগণ এই পথেই অগ্রসর হইয়া মানব জীবনের যাহা পরম পুরুষার্থ তাহা লাভ করিয়াছেন। এই দুই দলের মধ্যে যাঁহারা কোন দলেরই নহেন, অর্থাৎ তত্ত্বালোচনাতেও যাঁহাদের উচ্চাধিকার নাই আবার যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত এবং শাস্ত্রবিশ্বাসীও নহেন তাঁহাদের অবস্থা চিরকালই বড় কঠিন। লীলাতত্ত্ব অত্যন্ত গভীর; প্রাচীনকালের তত্ত্বদর্শী ও সাধু ভক্তগণ অধ্যাত্মরাজ্যের রহস্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই লীলাবাদেই বিশ্বসমস্যার চরম মীমাংসা উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা যেন সাধারণ নীতি-উপদেশপূর্ণ গল্পের সহিত লীলাতত্ত্বকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া না ফেলি।

শ্রদ্ধাবান্ সাধক সৎসঙ্গে লীলা অনুশীলন করিতে করিতে এই অবস্থা লাভ করেন। যাঁহারা তত্ত্ব নিপুণ নহেন, এবং শাস্ত্রেও শ্রদ্ধাহীন, তাঁহারা নিরুপায়।

ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সাধকগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে এই লীলাতত্ত্ব বুঝিয়াছেন। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উক্তি বলিয়া বলা হইয়াছে।

লীলার অর্থ অধিকার ও রুচিভেদে নানারূপ।

"পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী॥"

তান্ত্রিক মত।

"এই বৃন্দাবন আমার দেহ স্বরূপ। ইহা পঞ্চযোজন বিস্তৃত। কালিন্দী বা যমুনা ইনি সুষুম্না, ইহাতে পরমামৃত ধারা প্রবাহিত হন।

তান্ত্রিক সাধনায় সুষুম্না বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আলোচনা করিলে আমরা শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহারই মর্ম্ম আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের জীবন ও বিশ্বের এই প্রকাশ-লীলায় একটা দ্বৈধ রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় ইহার নাম "The principle of polarity." S, Laingপ্রণীত

বিশ্বে দ্বৈধ।

Modern Zoroastrian নামক গ্রন্থে এই তত্ত্বের অতি সুন্দর আলোচনা আছে। সেই গ্রন্থে তিনি এইটুকু দেখাইয়াছেন যে "In all cases a positive implies a negative ; in all, like repels like and attracts unlike. Conversely, as polarity produces definite structure, so definite structure everywhere implies polarity. The same principle prevails not only throughout the organic or world of life, and especially throughout its highest manifestation in human life and character, and in the highest products of its evolution, in societies, religions, and philosophies."

ইহাই ইড়া ও পিঙ্গলা। বাম ও দক্ষিণ, চন্দ্র ও সূর্য্য-রূপিনী।

এই যে বিশ্বজনীন দ্বৈধ, ইহা তন্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইড়া বামে আর পিঙ্গলা দক্ষিণে। ইড়া শক্তি-রূপা, পিঙ্গলা পুংরূপা। ইড়া চন্দ্রস্বরূপিণী আর পিঙ্গলা সূর্য্য-বিগ্রহা। যেমন রুদ্রযামলে।

"বামগা যা ইড়া নাড়ী শুক্লা চন্দ্র-স্বরূপিণী।
শক্তিরূপা হি সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
দক্ষেতু পিঙ্গলানাম্নী পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা॥"

পিতৃ ও মাতৃ-শক্তি। সুষুম্না সমন্বয়-রূপা, ক্লীব ও বহ্নিরূপা।

ইড়া মাতৃশক্তি আর পিঙ্গলা পিতৃশক্তি, সুষুম্নানাড়ী এই উভয়ের মধ্যস্থল, এতদুভয়ের সমন্বয়রূপা। এই সুষুম্না নাড়ীতে স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি সমানভাবে মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং উহা না স্ত্রী, না পুরুষ এ জন্য ক্লীব নামে অভিহিত। এই নাড়ী বহ্নিরূপা।

গীতায় ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম—এই তিন তত্ত্বের দ্বারা এই কথাই বলা হইয়াছে।

ভগবদ্গীতায় ক্ষর ও অক্ষর, এই দুই ভাবের সমন্বয় পুরুষোত্তমে হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চিন্তাটুকুর সূত্র ঠিক মত অবলম্বন করিতে পারিলে অর্থাৎ সুষুম্না যে কালিন্দী ইহা বুপারিলে আমরা বৃন্দাবন-তত্ত্ব বুঝিতে পারিব।

মোটামুটি এই ভাবেও আমরা কথাটা বুঝিতে পারি। আমরা বাহিরে দেখিতেছি জড়জগৎ, আর অন্তরে মনোজগৎ, এই দুইটি যেন দুইটি সমান্তর সরলরেখা। এই দুটির মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাও অবিসম্বাদিত। কি প্রকারে এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বলীলা সম্ভব হইয়াছে, এই প্রশ্ন সাধকগণের মনে চিরকালই জাগ্রত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনলীলার রহস্যের মধ্যে এই প্রশ্নের শেষ মীমাংসা নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং ধীরভাবে ও শ্রদ্ধার সহিত এই তত্ত্বালোচনায় আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

পঞ্চম প্রশ্নে অন্যান্য অবতারলীলা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে।

শৌনকাদি ঋষিগণ তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নে যথাক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার লীলা বিশেষ-ভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শ্রীসূতকে অনুরোধ করিলেন। এইবার পঞ্চম প্রশ্নে শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারের কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রশ্ন।

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥

ঈশ্বর আত্মমায়ায় স্বেচ্ছানুসারে অবতারলীলা করিয়াছিলেন, সেই শুভ অবতারলীলা সকলও বর্ণনা কর। শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করার পর তাঁহারা অন্যান্য অবতার-সমূহের কথাও বর্ণনা করিতে বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথাই মুখ্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ কথা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্যান্য অবতারের কথা জানা চাই। অন্যান্য অবতারকথা আলোচনা না করিলে কৃষ্ণলীলা উপলব্ধি করা অসম্ভব। ভগবানের অবতার অসংখ্য। গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার এই ছয়টি বিভাগে তাঁহাদের বিভক্ত করিয়া আচার্য্যগণ

কৃষ্ণলীলা বুঝিতে হইলে অন্যান্য অবতারের লীলাও জানিতে হইবে।

তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের লীলা, সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মরূপা ও ভূভারহরণাদিরূপা, শ্রীভগবানের ইচ্ছারূপা যে শক্তি তদ্দ্বারা এই সমস্ত সাধিত হইতেছে। তৎসমুদায় সম্বন্ধে আমাদিগের একটা স্পষ্টরূপ ধারণা থাকা চাই, তদ্ব্যতীত আমরা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে অবতারলীলা আনুসঙ্গিক-ক্রমে বা গৌণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ অবতারলীলা বর্ণনা করিবার জন্য এই অনুরোধটী করার পরেই ঋষিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিতেছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে শৌণকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছেন, তবে কৃষ্ণ-কথা বুঝিতে হইলে অন্যান্য অবতার কথার প্রয়োজন বলিয়াই সে সম্বন্ধে জানিতে চাহিতেছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটীর ব্যাখ্যাকালে ক্রম-সন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী এ কথা বলিয়া দিয়াছেন। যথা—

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা মুখ্য, অন্যান্য লীলা গৌণ।

কারণ পঞ্চম প্রশ্নে অবতার কথা জিজ্ঞাসা করার পর ষষ্ঠ প্রশ্নে কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণস্য তাবন্মুখ্যত্বেন কথয়। অথ তদনন্তরম্ আনুসঙ্গিক তয়ৈবেত্যর্থঃ॥১১॥

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ইহাই সিদ্ধান্ত।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ ! কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১।৩।২৮

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

প্রধান প্রধান অবতারগণের নামোল্লেখ করার পর বলা হইল যে, ক্ষয়হীন জলাশয় হইতে যেমন সহস্র সহস্র জলধারা নির্গত হয় তেমনি স্বপ্রাদুর্ভাব শক্তির সেবধি—(আশ্রয় স্থান) স্বরূপ হরির অবতার অসংখ্য। এই সমস্ত অবতারগণের মধ্যে বিংশতিতমরূপে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই কৃষ্ণই **স্বয়ং ভগবান্** অর্থাৎ অন্যান্য যে সকল অবতারের কথা বলা হইল তাহাদের মধ্যে কেহ অংশ—হয় স্বয়ং অংশ, অথবা অংশের অংশ আবার কেহ অংশ কর্ত্তৃক আবিষ্ট বলিয়া অংশ পদবাচ্য। কেহ

কলা অর্থাৎ বিভূতি। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্থাৎ এই সমুদয় অংশ ও কলার অবতারী যে পুরুষ, সেই পুরুষেরও অবতারী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিপাদিত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনাকালে একান্তভাবে আবশ্যক একটী গূঢ়কথা এই স্থলে নিহিত আছে। কৃষ্ণই ভগবান্, ভগবান্ কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা যেন কেহ বিবেচনা না করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী এইস্থলে এইরূপ মত প্রদান করিয়াছেন।

ভগবান্ কৃষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন, তাহা নহে।

"কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণোধর্ম্মঃ সাধ্যতে নতু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণোধর্ম্মত্বে সিদ্ধে মূলত্বমিব সিদ্ধ্যতি নতু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বং এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়মেব ভগবান্ নতু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া নতুবা ভগবত্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ।" শ্রীজীব গোস্বামীর এই সিদ্ধান্তানুসারেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার নিম্নরূপ মত প্রদান করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিতে হইলে এই বিষয়টি বিশেষরূপেই অনুধাবন করিতে হইবে।

"সর্ব্ব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥
তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্ব্ব অবতংশ॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভালত ব্যাখান।
পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান॥

পূর্ব্বে অনেকের মত ছিল পরব্যোমস্থ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্

কৃষ্ণ তাঁহার অবতার। গৌড়ীয় আচার্য্যগণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা ঠিক নহে।

তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার॥
তারে কহে কেনে কর কুতার্কনুমান।
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥

তথাহি—

অনুবাদ মনুক্তৈ্ব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥*

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পাছে ত বিধেয়॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয়ে জ্ঞাত॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ ইহা বিধেয় পাণ্ডিত্য॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥
তৈছে ইহা অবতার সব হৈলা জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈলা জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সম্বাদ॥

* এই শ্লোকটি শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার টীকায় উদ্ধার করিয়াছেন।

কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত ক্রিহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥

এইবার বিচারণার পদ্ধতিটুকু আলোচনা করা যাউক। মানব জ্ঞানরাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, বিশ্বের রহস্যের সহিত মানব ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইতেছে। এই যে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ইহাতে যাহা জ্ঞাত তাহার উপর দাঁড়াইয়া যাহা এখন অজ্ঞাত তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহারই নাম আগে অনুবাদ পরে বিধেয়। From the known to the unknown.

মানবের প্রথম পরিচয় অবতারের সহিত, তাঁহারা আসিয়া মানবের দৃষ্টি প্রসারিত করেন, কার্য্য হইতে কারণের অভিমুখী করেন।

মানবজাতি তাহার ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে অবতারগণের সহিত পরিচয় লাভ করে। যাঁহারা অবতার তাহারা জগতে আসেন, মানবের মত বা জগতের জীবের মত কার্য্য করেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ মানব নহেন। স্থূলভাবে দেখিলে সাধারণ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা এখানকার হইয়াও এখানকার নহেন। তাঁহাদের যেন কিছু বিচিত্র রকমের ইতিহাস, আমাদের অগোচরে বিশ্বরহস্যের কোন নিভৃত কক্ষে লুক্কায়িত আছে। ইহাদের ইংরাজিতে Superman in Human History বলা যায়। ইহাঁরা আমাদের জ্ঞাত। আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু অতীতের মানবগণের সাক্ষ্যের দ্বারা আমরা তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁহাদের সহিত পরিচয় হওয়ার পর হইতেই মানবের চিন্তা-প্রবাহ এক নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এই দৃশ্য ও জ্ঞাত জগতই জগতের সমস্তটা নহে, আরও অনেক রহস্য আছে, There are more things in Heaven and earth এই ভাবনায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। এই চিন্তার পথে অগ্রসর হইয়া আমরা 'পুরুষ'এর সাক্ষাৎকার লাভ করি। একটি নদীর ধারা অনুসরণ করিয়া সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইলে যেমন এই নদীর ন্যায় আরও অসংখ্য নদীর উদ্ভবস্থল যে হ্রদ, তাহার সাক্ষাৎ

পাওয়া যায়, তেমনি এই সমস্ত অবতারের লীলা বেশ সাহসের সহিত ও সরল চিত্তে (With an unbiassed and unprejudiced mind) আলোচনা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইলে আদ্য পুরুষের তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। সেই আদ্য পুরুষের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১-১-৩ ॥

তৎপরে সকল অবতারের আধার-স্বরূপ পুরুষ বা আদ্য পুরুষের সহিত পরিচয়। ইনি যোগিগণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ লোকসকলের সৃষ্টির জন্য প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা ষোড়শ কলান্বিত পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত, এই ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি

"পশ্যন্ত্যদোরূপমদভ্র চক্ষুষা
সহস্র পাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধ শ্রবণাক্ষিনাসিকং
সহস্রমাল্যাম্বর কুণ্ডলোল্লসৎ ॥"

এতান্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্ নরাদয়ঃ ॥"

এই বিরাটমূর্ত্তি সহস্র সহস্র অর্থাৎ অপরিমিত চরণ, অপরিমিত উরু ও অপরিমিত বদনে অতিশয় অদ্ভুত এবং অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য শ্রবণ, অসংখ্য লোচন, অসংখ্য নাসিকা, তথা অসংখ্য শিরোভূষণ, অসংখ্য বসন ও অসংখ্য কুণ্ডলে শোভমান। ইহা যোগীগণের প্রত্যক্ষ। এই বিরাটমূর্ত্তি নানা অবতারের অব্যয় বীজস্বরূপ। সমস্ত অবতার এই স্থান হইতে উদ্ভূত হয়েন, অথচ এই বীজ অক্ষয়। আবার ইনি অবতারগণের নিধান অর্থাৎ কার্য্যাবসানে প্রবেশ স্থান। কেবল অবতারের বীজ নহেন, ইনি সৃষ্টবস্তু মাত্রেরই বীজ। তাঁহার অংশে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার অংশে মরীচি

অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, আর প্রজাপতিগণের অংশে দেব তির্য্যক্, মানব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে মানব সর্ব্ব প্রথম অবতারগণকে প্রত্যক্ষ করে। অবতারগণকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার চিন্তাপ্রবাহ নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হয়। পূর্ব্বে সে প্রত্যক্ষকে একমাত্র সত্য বলিয়া চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু এখন আর সে সেরূপ মনে করে না। এই সময়ে সে যোগপথ আশ্রয় করে, সত্য-নিরূপণের জন্য বা নিজের বিকাশের জন্য সে অন্য পথ আশ্রয় করে। যোগপথে অগ্রসর হইলে, এই মহাপুরুষ বা অবতারগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও প্রদর্শিত পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া মানব পুরুষের তত্ত্ব বুঝিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে অবতারগুলির উদ্ভব স্থানে দেখিতে পাওয়ায় বিশ্বতত্ত্ব (The Scheme of the universe) বুঝিতে সক্ষম হয়। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে বিশ্ব-রহস্যের প্রকৃত মীমাংসা করিতে পারি না, কি কি শক্তির সাহায্যে বিশ্বের ও মানবের ইতিহাস গড়িয়া উঠিতেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প, যোগী যখন এই পুরুষের তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁহার এই জ্ঞান বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন আর তিনি আমাদের ন্যায় ঘটনাস্রোতে অন্ধকারময় পথে বিতাড়িত একটী তৃণমাত্র নহেন, তখন তিনি বিশ্ব-রহস্যের সহিত পরিচিত হইয়া সচেতন ভাবে এই বিশ্ব-লীলার একজন সহায়ক (A self-conscious helper in the evolutionary Scheme of the universe.) শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—

পুরুষের সহিত পরিচয় হইলে মানুষ মুক্ত মানুষ হইয়া যায়।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ"

এই সমস্ত অবতার, পুরুষের অংশ ও কলা। এস্থলে অবতারগুলি জ্ঞাত এবং অনুবাদ (Subject) আর পুরুষ আমাদের অজ্ঞাত ছিলেন। এক্ষণে জ্ঞাত হইলেন, ইহা বিধেয় (predicate). পূর্ব্বে যে সমস্ত অবতারের নাম বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামও রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কথা সকলেই জানিতেন।

পূর্ব্বে সাধারণের এইরূপ ধারণা ছিল যে এই সমস্ত পুরুষের অবতারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে গণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার নহেন তাহাও নহে, তিনি অবতার সত্য, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক। যেমন তাঁহার লীলা ঐতিহাসিক, কিন্তু কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নহে, তদপেক্ষা কিছু অধিক, সেইরূপ। এ সম্বন্ধেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণলীলা ঐতিহাসিক, কিন্তু কেবল তাহাই নহে আরও কিছু বেশী।

কৃষ্ণ অবতারী

"অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনমতে কহে যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর নারায়ণ।
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার॥
কেহ কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥"

যে কোন বস্তুই হউক না কেন তৎসম্বন্ধে সকলের ধারণা একরূপ নহে, এবং না হওয়াই সম্ভব। মহামতি কার্লাইল্ বলেন, "There is an infinite meaning in every thing, the eye sees in it what the mind brings means of seeing." অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুরই অর্থ অসংখ্য, মন তাহার যতখানি দেখিবার শক্তি লইয়া আইসে, চক্ষু তাহার ততখানিই দেখিতে পায়। আমাদের দেশের একটী চলিত কথা আছে "কৃষ্ণ কেমন? যার মন যেমন।" ইহা সর্ব্বৈব সত্য। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ একজন অবতার, পূর্ব্বে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল, ইহার অধিক তত্ত্ব সাধারণের জানা ছিল না। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এইটুকু প্রতিপাদন করাই শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণ। এতদ্ভিন্ন আরও নয়টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থের লক্ষ্য। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্থলে লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যায়।

যেমন, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে এই গ্রন্থে যে দশটী বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতেছেন।

তাহাদের বর্ণন।

"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থান পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে নিম্নলিখিত দশটী বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, মুক্তি, আশ্রয়।

১। সর্গ বা তত্ত্ব সৃষ্টি বা উপাদান সৃষ্টি।

১। সর্গ—"ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ। ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাৎ" (ভূতানি আকাশদীনি মাত্রাণি শব্দাদীনি ইন্দ্রিয়াণি চ ধীশব্দেন মহদহঙ্কারো গুণানাম্ বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ কর্ত্তৃ,ভূ‌র্তাদীনাম্ যদ্বিরাড়্‌রূপেণ স্বরূপতশ্চ জন্ম স সর্গ। শ্রীধরঃ) উপাদান সৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি। পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) পঞ্চতন্মাত্রা (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) মন, অহঙ্কার ও মহৎ। মূল প্রকৃতির সহিত এই সমগ্র তত্ত্বের (সাংখ্যদর্শনের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের) আবির্ভাবের নাম সর্গ।

২। বিসর্গ বা বিরাট সৃষ্টি।

২। বিসর্গ—"বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ" (পুরুষোবিরাজঃ তৎকৃতঃ পৌরুষঃ চরাচর সর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ) ব্রহ্মা হইতে চরাচর জীব-সমূহের দেহ-সংগঠন।

৩। স্থান বা ক্রম বিকাশ।

৩। স্থান—"স্থিতি র্বৈকুণ্ঠ-বিজয়ঃ" (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ সৃষ্টানাম তত্তন্মর্য্যাদা পালনোৎকর্ষঃ স্থিতিঃ স্থানং। শ্রীধরঃ) সৃষ্ট জীবগণের নিজ নিজ মর্য্যাদা (ধর্ম্ম) পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ তাহার নাম স্থিতি বা স্থান। Evolution.

৪। পোষণ বা কৃপা।

৪। পোষণ—"পোষণং তদনুগ্রহঃ" নিজ নিজ মর্য্যাদায় অবস্থিত ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

৫। উতি বা স্বর্গ বাসনা।

৫। উতি—"উতয়ঃ কর্ম্ম বাসনা (উয়ন্তে কর্ম্মভিঃ সংতন্যন্তে শ্রীধরঃ) সকাম কর্ম্মের দ্বারা বাসনা জন্মে, এই বাসনার দ্বারা পুনঃ পুনঃ ত্রিলোকীতে গতাগতি ঘটে, ইহার নাম উতি।

৬। মন্বন্তর।

৬। মন্বন্তর—"মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্মঃ" (তদনুগৃহীতানাম্ সতাং মন্বন্তরাধিপতিনাম্ ধর্ম্মঃ সদ্ধর্ম্মঃ) ভগবানের অনুগৃহীত মন্বন্তরাধিপতি সাধুদিগের ধর্ম্ম।

৭। ভগবানের অবতারগণের কথা।

৭। ঈশানুকথা—

"অবতানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাং।
পুংসামীশকথা প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥"

(হরেরবতারানুচরিতং তস্যানুবর্ত্তিনাঞ্চ সৎকথা ঈশানুকথা প্রোক্তা—) ভগবান হরির অবতার চরিত্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তী মহাপুরুষগণের যে সৎকথা তাহার নাম ঈশানুকথা, ঐ কথা নানা আখ্যানে প্রচারিত হইয়াছে।

৮। নিরোধ বা লয়।

৮। নিরোধ—"নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ।" ভগবান হরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে পর জীবের আত্ম উপাধির সহিত যে লয়, তাহার নাম নিরোধ।

৯। মুক্তি—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।" (অন্যথারূপং অবিদ্যায়াধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি—শ্রীধরঃ) অন্যথারূপ অর্থাৎ অবিদ্যাকর্ত্তৃক আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি)।

৯। মুক্তি বা স্বরূপে অবস্থান।

১০। আশ্রয়—এই আশ্রয় তত্ত্বই শ্রীভগবান। তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

১০। আশ্রয়।

"দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহলক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥"

ইনিই কৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ইঁহার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এই আশ্রয় তত্ত্বের বিশুদ্ধি অর্থাৎ এই আশ্রয়-তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্যই মহাত্মাগণ কোন কোন স্থলে শ্রুতির দ্বার, কোন কোন স্থানে সাক্ষাৎ কিম্বা তাৎপর্য্য দ্বারা অপর নয়টীর লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে সমস্তই সেই দশমতত্ত্ব বা আশ্রয় তত্ত্বের সহিত মানবের যথার্থ পরিচয় সাধন করাইবার জন্য। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"

আশ্রয়-তত্ত্বকে জানাই আবশ্যক; কিন্তু যাহারা আশ্রিত তাহাদের না জানিলে আশ্রয়ের সম্যক্ জ্ঞান হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমে শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন—

"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-নামক দশম পদার্থই এই দশম স্কন্ধের লক্ষ্য। তিনি আশ্রিতবর্গের আশ্রয়বিগ্রহরূপী পরমধাম ও জগতের নিবাস স্থানস্বরূপ।

এইবার আমরা পঞ্চম প্রশ্নে যে অন্যান্য অবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে কেন, তাহার হেতু অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য অবতারের মধ্যে যে অন্যতম, তাহা নহে। পূর্ব্বে সাধারণ লোকে তাহাই মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারী। কিন্তু এই অবতারীকে বুঝিতে হইলে অবতারগণকে জানা দরকার। এই অবতারগণের মধ্যে এমন একটী ভাবধারা প্রচ্ছন্নভাবে আছে যাহার আদিতে ও অন্তে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলা। অবতার-চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে আমাদের মনে স্বতঃই এমন কতকগুলি ভাবের ও চিন্তার উদ্রেক হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা পাওয়া যাইবে না। এ কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

অবতারগণের কথা ঠিকমত আলোচনা করিলে, আমরা স্বভাবতঃই অবতারী যে শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার কথায় আসিয়া উপস্থিত হইব।

শৌণকাদি ঋষিগণ সূতকে পঞ্চম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যেন মনে করিলেন যে এই সমস্ত অবতার-লীলা অতীব বৃহৎ ব্যাপার। এই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে সূত হয় ত আমাদের যাহা প্রধান আবশ্যক, তাহা ভুলিয়া যাইতে পারেন। আমরা যেজন্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যাকুল হইয়া পড়ি সে বিষয়টী বার বার মনে পাড়াইয়া দিই। এই জন্য ঋষিগণ অবতার-লীলা বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কৃষ্ণলীলা শুনাইবার জন্য পূর্ব্বে যে অনুরোধ করিয়াছেন, সেই অনুরোধ পুনরায় করিতেছেন।

অন্যান্য অবতারের কথা বলিতে বলিতে যদি শ্রীকৃষ্ণকথা ভুলিয়া যান, এইজন্য ঋষিগণ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণকথাই তাঁহাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য। আর তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্যই বিশেষ ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে।

"বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥
কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেন কেশবঃ।
অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥
কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ং।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণাঃ হরেঃ ॥
ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরম্ নিস্তিতীর্ষতাং।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবং ॥"

শ্রীধর স্বামীর টীকানুসারে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির অর্থ এই। যদিও আমরা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের প্রয়োজন বর্ণনা করিবার জন্য পূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছি এবং সেই অনুরোধেই তাঁহার চরিত্র বর্ণনার অনুরোধও রহিয়াছে, তথাপি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উৎসুক হওয়ায় পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র শ্রবণের জন্য ইচ্ছুক হইয়া আমাদের তৃপ্তির অভাব তোমাকে জানাইতেছি। (ইহার অর্থ এই যে আমরা অন্যান্য অবতারের চরিত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রও শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাহা শুনিয়া আমাদের ঠিক তৃপ্তি হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে অন্যান্য স্থানে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-কথা ঠিক ভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। সে সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে। ইহাতে এটুকুও বুঝিতে হইবে যে অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-কথা যাহা আছে, তাহা আংশিক মাত্র। এই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের উদ্দেশ্য।) দেখ সূত! আমরা যাগযোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, অর্থাৎ তৎসমুদায় অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহা কিছু লভ্য তাহা আমরা পাইয়াছি। কিন্তু শ্রীভগবান উত্তমঃশ্লোক। **উদ্‌গচ্ছতি তমো যস্মাৎ উত্তমঃ—তথা ভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য**—অর্থাৎ শ্রীভগবানের যশঃ শ্রবণের দ্বারা তমো বা অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। তাঁহার লীলাবিক্রম আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু তৃপ্তি হয় নাই অর্থাৎ আর শুনিব না এরূপ মনে হয় নাই। অন্য লোকে যাহা শুনিয়াছে তাহাতেই হয় ত তৃপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের সেরূপ হয় নাই। যাহারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ-কথা যথেষ্ট শোনা হইয়াছে, আর কেন? তাহারা রসজ্ঞ নহে। রসজ্ঞ-দিগের হরিকথা শ্রবণ করিতে স্বাদু হইতে আরও অধিক স্বাদু বোধ হইয়া থাকে। যতই শ্রবণ করা যায় ততই অধিক মিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তিনটি কারণে তৃপ্তির উদয় হয়। উদর পূর্ণ হইলে আর ভাল লাগে না, রসবোধ না থাকিলে ভাল বস্তুকেও ভাল লাগে না, আর বস্তু স্বাদু না হইলে ভাল লাগে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-

কথার সম্বন্ধে ইহার কোনটীই প্রযোজ্য নহে। কারণ কর্ণ আকাশ, আর কৃষ্ণ-কথা অমূর্ত্ত, সুতরাং পূর্ত্তি অসম্ভব।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের যাবতীয় কথা বর্ণনা কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গূঢ় ও কপট মনুষ্য হইয়া মানব-সমূহের অসাধ্য কার্য্য সকল করিয়াছিলেন। তৎসমুদায়ও বর্ণনা কর। তুমি বলিতে পার যে আমরা যজন, অধ্যয়ন প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত, আমাদের হরি-কথা শ্রবণের অবসর কোথায়? সত্য, পূর্ব্বে আমাদের সময় হয় নাই। কিন্তু এখন আমরা কলিযুগ আসিতেছে জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ও বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল-সাধ্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি, এখন আমাদের হরি-কথা শ্রবণের যথেষ্ট অবসর আছে। দেখ সূত! কলিযুগ বড় ভয়ঙ্কর, ইহা পুরুষ-সকলের সত্বনাশক অর্থাৎ মালিন্য আনয়ন করিয়া থাকে। আমরা সমুদ্রে নিপতিত মানবের মত কলি-ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমি কর্ণধারের মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।

ষষ্ঠ প্রশ্ন, কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে ধর্ম্ম কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন?

"ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্ম কং শরণং গতঃ॥"

ব্রহ্মণ্য ও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাহার লীলাকালে কবচের মত তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন। অনেক অধর্ম্মাচারী ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গে নানারূপ অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়াছে, কিন্তু শরীর, বর্ম্মের দ্বারা আবৃত হইলে অস্ত্র-সমূহ যেরূপ তাহা বিদীর্ণ করিতে পারে না সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলার সময়ে ধর্ম্মের উপর যেসকল আক্রমণ হইয়াছিল, সমস্তই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম এক্ষণে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন?

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে শৌণকাদি ঋষিগণ সূতকে ছয়টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই ছয়টী প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই ছয়টী প্রশ্ন পরস্পরের

সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। এই সম্বন্ধটুকু বুঝিতে পারিলে আমরা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অনেক তত্ত্বই বুঝিতে পারিব।

এই প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বর্ণিত যে দশটি তত্ত্ব, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম, এ, বি, এল, বাহাদুর তাঁহার 'পৌরাণিক কথা' গ্রন্থে এই দশটি তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার একটি মন্তব্য লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে সেই মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা পাঠে আমরা উপকৃত হইব। "এই দশটি বিষয় অনুশীলন করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায়।"

১। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের, এই পরিণামী লোকসমূহের অবিকারী অপরিণামী আশ্রয় (Substratum) আছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্যাপক। ঐ আশ্রয় ব্যাপক আত্মা চৈতন্যরূপ। ঐ আশ্রয় পরম আত্মা অর্থাৎ সকল পদার্থেরই আত্মা এবং সমগ্র সমষ্টি পদার্থের আত্মা। এই জন্য সকল পদার্থেই চৈতন্য আছে।

২। ঐ আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়াই নানারূপ লীলাখেলা হয়, তাহাই কল্পের সৃষ্টি প্রলয়। সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সকলই নিয়মের অধীন। সেই সকল নিয়ম পরে দেখা যাইবে।

৩। সৃষ্টি বলিলে আদি সৃষ্টি বুঝিতে হইবে না। যেমন নানাজাতীয় তৃণপূর্ণ বসুন্ধরা সূর্য্যের খরতর কিরণে দগ্ধতৃণ হইয়া ক্ষেত্রমাত্রে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে বিনষ্ট তৃণ সকলের উদ্ভব হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে মূল প্রকৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব্বসৃষ্ট পদার্থের বীজ সকল নিহিত থাকে এবং সৃষ্টির পুনরুদ্ভব হয়। যেমন বর্ষার জলে প্রথমে ভূমির বিকার হয় এবং তৃণাদি আহারোপযোগী নানারূপ রসের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর তৃণাদির অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেইরূপ কল্পমধ্যে প্রথমে 'সর্গ' তাহার পর 'বিসর্গ' হয়।

৪। প্রলয় বলিলেও সেইরূপ অত্যন্ত নাশ বুঝিতে হইবে না। প্রলয় অপেক্ষা নিরোধ কথা সত্যের অধিকতর ব্যঞ্জক। কিন্তু নিরোধ কথার একটি নিগূঢ় ভাব আছে, যাহা সাধারণে ধারণা

করে না। চেতনজীব কিংবা চেতন ঈশ্বরের শয়নকে নিরোধ বলে। "নিরোধঃস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।" আমরা প্রতিদিন শয়ন করি। সেই সময় আমাদের দেহরূপ উপাধি নিশ্চেষ্ট থাকে। আমাদের শক্তিসকল কতক নিশ্চেষ্ট থাকে, কতক কার্য্য করে।

প্রতিদিনের শয়ন অল্পকাল-মাত্র স্থায়ী। শরীর নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু নষ্ট হয় না। মৃত্যু দীর্ঘকালব্যাপী। এই শয়নে দেহরূপ প্রকৃতির নাশ হয়। এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম প্রকৃতি (মন ইত্যাদি) জীবের সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্রকে কারণ শরীর বলে। যেমন ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র মূলপ্রকৃতি, সেইরূপ জীবদেহের ক্ষেত্র কারণ শরীর, মনুষ্য প্রতিদিন শয়ন করিলে শরীর কেবলমাত্র নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু শরীরের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছেদ হয় না, কারণ অল্পকাল পরেই আবার শরীরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মৃত্যুর সুদীর্ঘ শয়নে শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হয়। শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হইলেই শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও শরীরের নাশ হয়।

শরীরস্থ ধাতু সমূহের একত্র অবস্থান এবং শরীরের জীবনীশক্তি চেতন জীবের সংযোগ-সাপেক্ষ। শরীরের লয় কিছু স্বতন্ত্র নহে। জীবের শয়ন-জনিত শরীরের সহিত যে বিচ্ছেদ তাহাই শরীরের লয়।

শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব শব্দে অভিহিত হয়। এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানীকে ঈশ্বর বলা যায়। জীব মৃত্যুরূপ শয়নে শয়ান হইলে যেরূপ দেহের নাশ হয়, ঈশ্বর প্রলয়কালে শয়ন করিলে সেইরূপ তাঁহার ত্রিলোকী-দেহের নাশ হয়।

দেহ-পরিবর্ত্তনের সহিত আমার নাম কখনও রাম কখনও শ্যাম। সেইরূপ প্রতি ত্রিলোকীর ব্রহ্মা ভিন্ন। কল্পের নামভেদে ব্রহ্মার নাম নির্দ্দেশ করা যায়। যেমন বরাহকল্পের ব্রহ্মা পাদ্মকল্পের ব্রহ্মা। আমার কখনও রাম কখনও শ্যাম দেহ হইলেও যেমন আমি একই পুরুষ, সেইরূপ নানা ত্রিলোকীময় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একই পুরুষ।

"পুরুষ" শব্দের অর্থ যে পুরমধ্যে শয়ন করে। যে আমার দেহপুরে শয়ন করে সে আমার দেহের পুরুষ। সেই ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষ শয়ন করিলেই, ত্রিলোকীর প্রলয় হয়; বাস্তবিক সে প্রলয়, পুরুষের শক্তি-নিরোধ।' পুরুষের শক্তি ত্রিলোকী হইতে সমাহৃত হইলেই, ত্রিলোকী খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয় ও নাশ প্রাপ্ত হয়। এই পুরুষের জ্ঞানই পুরাণের মূল শিক্ষা। পুরুষের জাগরণই সৃষ্টি, পুরুষের শয়নই লয়।

৫। পশুর পশুত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, দেবের দেবত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—ইহাকেই মর্য্যাদা বলে। প্রথমত এই মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে, জীব এক অবস্থায় অবস্থিত না হইলে, জীব দৃঢ় সংস্কার লাভ করিতে পারে না। দৃঢ় সংস্কার লাভ না করিলে জীব অবস্থার উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অতএব এইরূপ ভাবে জীবের পালন করিতে হয়, যে সে আপন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে।

এই জন্য শ্রীধর স্বামী বলেন যে সৃষ্ট পদার্থের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন দ্বারা উৎকর্ষ বিধানের নাম স্থান। প্রথম অবস্থায় রজো-গুণ দ্বারা ও পরে সত্ত্বগুণ দ্বারা এই উৎকর্ষ বিধান হয়। ইহাও আমরা পরে জানিতে পারিব।

৬। যে সকল জীব সত্ব গুণ দ্বারা আপনার উৎকর্ষ সাধন করেন এবং ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারা ভক্ত। ভক্তমাত্রেই বিশ্বপালনে ভগবানের সহকারী হয়েন। ভগবান সেই ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, ইহারই নাম পোষণ।

৭। কালভেদে কল্পের তিনরূপ কর্ম্ম বিভাগ। যেমন শিশু যতদিন পূর্ণবয়স্ক না হয়, ততদিন নিত্য নূতন বোধের সংগ্রহ করে, তাহার পর পূর্ণবয়স্ক হইলে অজ্ঞানময় বোধ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানময় বোধ অবলম্বন করে, পরে জরার আক্রমণে শিথিলেন্দ্রিয় ও শিথিলচেষ্ট হইয়া কালের কবলে পতিত হয়, সেইরূপ কল্পের আরম্ভে জীব, ভাব ও বোধের নানাত্ব গ্রহণ করে, পরে উত্তম ভাবে ও উত্তম

বোধে অবস্থিত হয় এবং অবশেষে প্রলয়াগমে নিরুদ্ধশক্তি ও নিরুদ্ধচেষ্ট হয়। এই তিন ভাগকে সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় বলে। এই তিন মূলধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মন্বন্তরের ধর্ম্ম ভেদ হয়। কল্পের প্রথম ভাগে সৃষ্টি-ধর্ম্ম প্রবল, মধ্যম ভাগ স্থিতি-ধর্ম্ম প্রবল ও শেষভাগ লয়-ধর্ম্ম প্রবল।

৮। কর্ম্মবাসনা দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া জীব সংসারের স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। এই কর্ম্ম-বাসনাই সংসারের মূল।

৯। জীবগণের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য, ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন এবং ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। অবতার ও ভক্তগণের চরিত্র বর্ণনা পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। অবতারের বিচার পরে করা হইবে।

১০। জীবের আমিত্ব সংস্কারই বন্ধ। এত দেহ ধারণ করিতেছি, তথাপি প্রতি দেহেই আমি, আমি জ্ঞান নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। দেহে আমিত্ব জ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন সেই মন "আমিত্ব" অর্থাৎ অহঙ্কারের সীমা অতিক্রমণ করিয়া মহৎ তত্ত্বের অবলম্বন করে। তখন বিশ্বজ্ঞান স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হয় এবং জীব বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। পরে ত্রিগুণময়ী মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া, জীব ঈশ্বরের সমকক্ষতা লাভ করে। ইহাকে মুক্তি বলে।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। দেহ, ইন্দ্রিয় মনকে অন্যথারূপ ও আত্মাকে স্বরূপ বলা যায়। যাহার এই জ্ঞান হয়, সেই মুক্তির চেষ্টা করে। যে সে জ্ঞানে দৃঢ়-স্বরূপ হয়, সে মুক্তিলাভ করে।

পুরাণের এই সকল বিষয়। আর্য্যদিগের এই ইতিহাস। যাঁহারা এই ইতিহাস লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র রাজাদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে এবং অত্যল্পকাল হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিতে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন।

বিশ্বকল্যাণ ও পরাভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রশ্ন ছয়টী সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইবার প্রশ্নগুলির উত্তর কি ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাই আলোচ্য। প্রাচীন আচার্য্যগণের মতানুসারে প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। উগ্রশ্রবা সূত সূত ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলং।
যৎ-কৃতঃ কৃষ্ণ সংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি॥"

হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা অতীব সাধু। কারণ আপনারা লোকমঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

লোকমঙ্গলের প্রশ্নই সাধু প্রশ্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত যে যুগধর্ম্মের আদর্শ তাহার গতি কোন্‌-দিকে, এই স্থান হইতেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। লোক-মঙ্গলের প্রশ্নই সাধু প্রশ্ন; অতএব শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের মতে যে প্রশ্ন বা যে চেষ্টা কেবলমাত্র নিজের মঙ্গল চিন্তাতেই বিব্রত, তাহা সাধু নহে। পূর্ব্বে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, মোক্ষের অভিসন্ধি-লক্ষণ যে ধর্ম্ম অর্থাৎ যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মানুষ কেবল ভাবে ও চেষ্টা করে, আমার নিজের হিত কি করিয়া হইবে, সে ধর্ম্ম কৈতবধর্ম্ম এবং তাহা নিম্নস্তরের ধর্ম্ম। সুধু তাহাই নহে, যদি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের মান্য করা যায়, তাহা হইলে তাহা যুগধর্ম্ম নহে। এখন মানবকে লোকমঙ্গলের চিন্তায় বিভোর হইতে হইবে। প্রকৃত কথা

কৈতবধর্ম্ম নিম্নস্তরের ধর্ম্ম।

বিশ্বকল্যাণেই আমার প্রকৃত কল্যাণ, তদ্ব্যতীত আত্ম-কল্যাণ নাই।

আমার নিজের বলিতে একটী পৃথক্ মঙ্গল নাই। মানুষ, জগতের সহিত, নিখিলের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধনটুকু মানুষ যখন বুঝিতে না পারে, তখন সে অহঙ্কারের ভূমিতে দাঁড়াইয়া, কামনাযুক্ত হইয়া মঙ্গলের দুঃস্বপ্ন-মাত্র দর্শন করিতেছে। নিজের জন্য মানুষ যখন কিছু চায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে সে এখনও অবিদ্যাচ্ছন্ন, যে ধর্ম্ম মানুষকে এই নিজের জন্য কিছু চাহিতে শিক্ষা দেয়, সে ধর্ম্ম হয় ত মন্দের ভাল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের এই উপদেশই সার উপদেশ। এই জন্য উগ্রশ্রবা সূত মুনিগণকে বলিলেন, আপনাদিগের প্রশ্ন সাধু, কারণ ইহা লোকমঙ্গলমূলক। পুরুষ সকলের যাহা একান্ত ও অত্যন্ত শ্রেয়ঃ তাহাই মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

সকল শাস্ত্রের সার— শ্রীকৃষ্ণ-কথা।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মুনিগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় বলিতেছেন, **"সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারোদ্ধার প্রশ্নস্যাপি কৃষ্ণে পর্য্যবসতাদেবমুক্তং"** সকল শাস্ত্রের যাহা সার তাহা উদ্ধার করিলে দেখা যাইবে যে কৃষ্ণ-কথাতেই তাহা পর্য্যবসিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে হিন্দু-সাধনার সমগ্র ইতিহাস এই শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতেই তাহার শেষ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এই কৃষ্ণ-কথাতেই যথার্থ লোকমঙ্গল নিহিত আছে। ইহাই ভাগবতশাস্ত্রের অভিপ্রায়। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য যতই মানব সমাজে প্রচারিত হইবে, মানব-হৃদয় এই লীলারস আস্বাদন করিয়া যতই সরস হইয়া উঠিবে, হিন্দুশাস্ত্রের যাহা অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, প্রাচীন সাধু ও ঋষিগণ যে তত্ত্ব প্রচারের জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাহার আধিপত্য ততই বাড়িয়া যাইবে। মানুষ নূতন মানুষ হইয়া পড়িবে, নিজের হিতের জন্য ভাবিয়া আর কেহ ব্যাকুল হইবে না, সকলেই পরের চিন্তা করিবে। লোকহিতই যে আত্মহিত, ইহা জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দিতে হইলে, এই নব ভাবে বিশ্ববাসিগণকে দীক্ষিত করিতে হইলে, কৃষ্ণলীলারস পান করা ও অপরকে পান করান দরকার। এই

কৃষ্ণ-কথাতেই প্রকৃত লোকমঙ্গল নিহিত।

কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করিলে মানুষ নূতন মানুষ হইবে, এবং বিশ্বহিতই যে আত্মহিত, তাহা বুঝিতে পারিবে।

যে লোকমঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণকথা, সূত বলিতেছেন, ইহার দ্বারাই আত্মার প্রসাদ হইবে। আত্মার প্রসাদ বলিতে অহং-অভিমানী বা স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি সম্পন্ন যে জীব, তাহাকে বুঝায় না। সাধারণ ভাবে প্রকৃত আমি বা আমার যাহা স্বরূপ তাহাকে বুঝায়। বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব; দাসের একটা নিজের স্বতন্ত্র আনন্দ নাই, প্রভুর আনন্দেই তাহার আনন্দ পর্য্যবসিত। এই কারণে আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "**যেন প্রশ্নেনৈব আত্মা প্রসীদতীতি শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সদ্য আত্মপ্রসাদকত্ব মস্মদনুভবসিদ্ধমিতিভাবঃ**" অর্থাৎ আত্মপ্রসাদ প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রসাদ, জীবের প্রসাদ এই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদের অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দই জীবের পুরুষার্থ। ব্রজদেবীগণের ভাব, যাহা বৈষ্ণব সাধকগণ জগতের নিকট প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন,—

আত্মপ্রসাদের অর্থ—প্রকৃত যে আমি তাহার প্রসাদ—ব্যবহারিক যে আমি তাহার প্রসাদ নহে। প্রকৃত আমি—কৃষ্ণদাস। প্রভুর প্রসাদেই দাসের প্রসাদ।

অতএব কৃষ্ণসুখই আমার প্রকৃত সুখ।

"গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
পরম নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥
'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম ॥

ইহাই পরাভক্তি। ইহারই নাম প্রেম।

ইহা কামের বিপরীত।

ব্রজগোপীর ভাব

এই প্রেম যা কৃষ্ণসুখ অন্বেষণ।

দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে কৃষ্ণের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

❊ ❊ ❊

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহ ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥

❊ ❊ ❊

সুখ না চাহিলে সুখ পাওয়া যায়। গোপীর সুখ-বাঞ্ছা নাই।

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাঁহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥

তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ! পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসান॥

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে এই গোপীভাবকে আদর্শ করিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে হইবে। কৃষ্ণ-সুখে যাহাতে আমাদের সুখ পর্য্যবসিত হয়, বিশ্বকল্যাণ ব্যতীত আমার নিজের বলিতে যে অন্য কোনরূপ কল্যাণ থাকিতে পারে না, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়; ইহাই যুগধর্ম্ম।

এই গোপীভাবই শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ এবং ইহাই যুগধর্ম্ম।

এইবার আমাদের সাধারণ ধার্ম্মিকতার আদর্শ এই আদর্শের কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করা দরকার। আমরা ধার্ম্মিক লোক, আমরা কেবল আত্মরক্ষার জন্যই ব্যাকুল। আত্মদানই যে প্রকৃত আত্মরক্ষা, এ তত্ত্ব আমরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। ভাগবত-ধর্ম্মের সাধন গ্রহণ করিলে মানব দুঃখের মধ্যেই সুখের, শোকের মধ্যেই অশোকের, মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতের, দানের মধ্যেই লাভের, বিরহের মধ্যেই মিলনের আস্বাদ পাইবে। ইহাই সত্য, ইহাই কল্যাণ। ইহা ছাড়া আর অন্য পথ নাই। আমরা কেবল ব্যাকুল হইয়া দুর্ব্বলচিত্তে বলিয়া থাকি "ভগবান্, আমার দুঃখ দূর কর, ভগবান্ আমার রোগ সারাইয়া দাও, তোমাকে পঁচিশ টাকা ঘুষ দিব" ইহা ভাগবত-ধর্ম্ম নহে। ইহা মোহের ধর্ম্ম, ইহা কপটের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম মন্দের ভাল হইতে পারে, কিন্তু যুগধর্ম্মের আদর্শ যাহা শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার শিক্ষা ও উপদেশ অন্যরূপ। রোগ হইলে কখনও ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিতে নাই "হরি আমার রোগ সারাইয়া দাও।" একথা যখন বলি তখন প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি বলিয়া থাকি, "হে ভগবান্, তোমার বুঝিবার ভুল হইয়াছে,

আমাদের সাধারণ ধার্ম্মিকতা, মোহের ধর্ম্ম ও কপটের ধর্ম্ম।

ভগবদিচ্ছার অনুবর্ত্তন করাই ভাগবত-ধর্ম্মের আদর্শ।

তোমার ব্যবস্থা ঠিক হয় নাই, তুমি আমার পরামর্শ লইয়া তোমার এই ভুল ব্যবস্থা সংশোধন করিয়া লও।" এ কত বড় অজ্ঞানের ও অহঙ্কারের কথা! রোগ হইলে ভগবান্‌কে বলিতে হয় "প্রভো! তুমি যাহা করিয়াছ, ঠিকই করিয়াছ, ব্যাধি দূর করিবার যে সমস্ত লৌকিক উপায় তুমি দিয়াছ, আমি সে সমুদায় অবলম্বন করিব। তবে তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যেন এই রোগে কাতর হইয়া তোমার চরণ ভুলিয়া না যাই, অবিশ্বাস আসিয়া যেন আমায় আশ্রয় না করে।

রন্তিদেব প্রকৃত ভাগবত ধর্ম্মের সাধক।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন "আমার সর্ব্বদা বিপদই হউক।" শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে রন্তিদেবের উপাখ্যান আছে; ভাগবতধর্ম্মের যাহা আদর্শ তাহা এই রন্তিদেবের চরিত্রে অতি সুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হয়। রন্তিদেব স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর হইয়াও অপরকে খাওয়াইতেন। তিনি সমুদয় দান করিয়া সপরিবারে ক্ষুধায় অবসন্ন হইতেন, জলমাত্রও পান না করিয়া তাঁহার আটচল্লিশ দিবস অতীত হইত। পরিবার-সকল অনাহারে কষ্ট পাইতেছেন, নিজে ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাঁপিতেছেন, এমন সময়ে খাদ্যদ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত। রন্তিদেব সর্ব্বত্র হরিকে দর্শন করিতেন, অতিথিকে সেই অন্ন ভোজন করাইলেন। তাহার পর নিজেরা আহার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন শূদ্র অতিথি আসিয়া উপস্থিত, অবশিষ্ট অন্ন তাহাকে প্রদান করিলেন। খাদ্যদ্রব্য সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে, এমন সময় এক চণ্ডাল আসিয়া উপস্থিত, রন্তিদেব স্বয়ং পিপাসায় কাতর হইয়াও চণ্ডালকে সেই জলটুকু পান করিতে দিলেন। এই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন

নিজের সুখ চাহেন নাই, বরং দুঃখ চাহিয়াছেন।

'ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥

আমি পরমেশ্বরের নিকট অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিসমন্বিত গতি অথবা মুক্তি কামনা করি না, আমি যেন ভোক্তারূপে অন্তঃস্থিত হইয়া সমস্ত দেহীর দুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে আমা হইতে সকল দেহীর দুঃখ দূরীভূত হয়।

বিশ্ব-কল্যাণই প্রার্থনীয়।

ধর্ম্ম-জীবনের এই আদর্শ শ্রবণ করিয়া অনেক লোকের চিত্ত নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠাই সম্ভব, কারণ আমরা সহজে লাভবান হইবার জন্যই প্রায়শঃ ধর্ম্মাচরণ করি। ধর্ম্মাচরণ করিয়া যে মানুষ লাভবান হয় না, তাহা নহে, ধর্ম্মাচরণের দ্বারা মানবের সকল দিকেই শক্তিবৃদ্ধি হয় সত্য। কিন্তু এইপ্রকারের অস্থায়ী স্বার্থসাধনের সুগম উপায়রূপে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিলে শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তির বা জাতির মঙ্গল হয় না। আমরা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী আলোচনা করিয়া ভাগবতধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে যাহা পাইলাম, পরবর্ত্তী শ্লোক ও তাহার পরের শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে সেই ভাবটীই দৃঢ়ীকৃত হইবে। ক্রমশঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আলোচনা করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলার সহিত পরিচয় হইলে হৃদয় আপনা হইতেই নৃত্য করিয়া উঠিবে এবং সেই নিত্যলীলার সেবক হইয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

স্বার্থপর মনুষ্যের প্রীতির জন্য ধর্ম্মের আদর্শ খর্ব্ব করিতে নাই।

তাহাতে জাতির অকল্যাণ হয়।

ঋষিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সকল শাস্ত্রের সার যে ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ, তাহা বর্ণনা কর; সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন।

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তিই ভাগবত-ধর্ম্মের আদর্শ।

শ্রীধর স্বামী শ্লোকটীর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ধর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। ইহার মধ্যে যে ধর্ম্ম স্বর্গাদির জন্য অনুষ্ঠিত, তাহা প্রবৃত্তিলক্ষণ তাহা অপর। আর যে ধর্ম্মে শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণাদিতে আদরলক্ষণা যে ভক্তি তাহাই জন্মে, তাহা পরধর্ম্ম। তাহাই ঐকান্তিক মঙ্গল। এই ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ

ইহা প্রবৃত্তিমার্গও নহে

কোনরূপ ফলের অভিসন্ধান নাই, আর অপ্রতিহতা অর্থাৎ কোন-রূপ বিঘ্নের দ্বারা অনভিভূতা।

ভগবান্ অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত। তাঁহাতে ভক্তি অর্থাৎ পরানুরক্তি হওয়া চাই। শ্রীজীবগোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে যাহা প্রবৃত্তিলক্ষণ অর্থাৎ যে ধর্ম্ম আমাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে ভোগাদির প্রলোভন দেখায়, সে ধর্ম্মের তো কথাই নাই, কেবলমাত্র নিবৃত্তিমাত্র লক্ষণ যে ধর্ম্ম তাহাতেও ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ হয় না, সে তো কেবল বৈমুখ মাত্র (a negative virtue)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ, এই উভয়মার্গের ঊর্দ্ধে, শ্রীমদ্ভাগবতের সাধনার যে আদর্শ, তাহার স্থান।

নিবৃত্তিমার্গও নহে।

এতদুভয়ের ঊর্দ্ধে।

ইহাই নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা।

বাস্তবিক ইহা নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা। "অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি" এই উপদেশ শ্রবণ করিলে আমরা বলিয়া উঠিব, অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব। যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে হইবে। এই যে ভালবাসা ইহা "স্বত এব সুখরূপ-ত্বাদহৈতুকী ফলানুসন্ধানরহিতা অপ্রতি-হতা তদুপরি সুখদুঃখদ পদার্থান্তরা-ভাবাৎ কেনাপ্যববোধয়িতুমশক্যা চ" (ক্রমসন্দর্ভঃ) অর্থাৎ ইহা নিজেই সুখরূপী অর্থাৎ ইহাতে আর অন্য কিছুর আকাঙ্খা নাই, আর এই প্রেমে বা যে অবস্থায় এই প্রেম প্রকাশিত হয়েন, সেই অবস্থায় সুখকর বা দুঃখকর অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব না থাকায় ইহার অবরোধ হয় না। ইহাই ভক্তির স্বরূপ গুণ। এই যে পরাভক্তি বা প্রেমভক্তির কথা বলা হইল, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ, শ্রীবৃন্দাবনলীলায় ইহার ফলিত অবস্থা বা প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজবাসীগণের রাগাত্মিকা নিষ্ঠার কথা সাধুমুখে শ্রদ্ধান্বিতভাবে শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের সেই ভাব পাইবার জন্য অন্তরে লোভের উদয় হয়। লোভের উদয় হইলেই মানব তাহা পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

ইহাই প্রেম।

ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান।

প্রকৃত সত্য অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত।

ভাগবত-ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই এইটুকু বুঝিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা জগতের ও আমাদের জীবনের যতটুকু জানিতেছি, সেইটুকুই সমগ্র বিশ্ব নহে। যাহা প্রকৃত সত্য তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা **অধোক্ষজ**। এই অধোক্ষজ পরমার্থতত্ত্বকেই সত্য বলিয়া জানিতে হইবে এবং হৃদয়ের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা, তাহা সেই অধোক্ষজ তত্ত্বে অর্পণ করিতে হইবে। এই কার্য্য অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। আমাদের সত্বার মূলে **অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি** নিহিত আছে, ইহাই আমাদের স্বভাব, ইহাই আমাদের স্বরূপ।

অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ।

শান্তির আদর্শ আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, আমরা তদ্দ্বারা চঞ্চল হইয়া কার্য্য করিতেছি।

আমাদের জীবনের সম্বন্ধে এটুকু আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে আমরা অভাবগ্রস্ত ও অশান্ত। আরও বুঝিতে পারি যে আমরা একা একা বা দল বাঁধিয়া যাহা কিছু করিতেছি সকলেরই লক্ষ্য এই অভাব দূর করিয়া একটা শান্ত অবস্থায় উপস্থিত হওয়া। এই যে স্বরূপ, ইহা আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; এই যে স্বরূপ, ইহাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া জীবনের পথে ঘুরাইতেছে। এখন কি প্রকারে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারি, ইহাই প্রশ্ন। সংসারী মানব বলিলেন ভোগের বস্তু উপার্জ্জন কর, ভোগ কর, ইন্দ্রিয়ের কামনা সমূহের তৃপ্তি সাধনা কর। তত্ত্বদর্শী বলিলেন "দেখ ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিও না" তিনি নিজের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে ও অতীতকালের অন্যান্য মনীষিগণের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস হইতে বলিলেন, "স্থির হও, ইন্দ্রিয়গণের গতি রুদ্ধ কর, ইন্দ্রিয়গণ যাহা বলিতেছে তাহা প্রতিভাসিক

কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য

জ্ঞানের দ্বারা এই শান্তি মিলে না।

সত্য, তাহার অনুসরণ করিলে ভ্রমের রাজ্যে অবিদ্যার মধ্যে ভ্রমণ করিবে, অভাব দূর হইবে না। তাহার পর ইন্দ্রিয়গণের গতি কিয়ৎপরিমাণে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের রাজা যে মন তাহার সাহায্যে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা যে একেবারে সত্য নহে, তাহা নয়, তবে ইহাও ব্যবহারিক সত্য। কিন্তু হে মানব, তোমার ইহাতেও চলিবে না, তোমাকে আরও স্থির হইতে হইবে, তবে পারমার্থিক সত্য লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।"

পারমার্থিক সত্য চাই।

এই পারমার্থিক সত্যের কথা যিনি জীবকে বলেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র যে শ্রীধর স্বামীর মতে ব্রহ্মবিদ্যা, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহা হইলেই দেখা গেল যে এই ভাগবতধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই এইটুকু বুঝিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও মনের দ্বারা (মনের দ্বারা বলিলে বুঝিতে হইবে, ইন্দ্রিয়জ্ঞান সমূহকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, বা তুলনা করিয়া যে সমুদয় সিদ্ধান্ত অবধারিত হয়, তৎসমুদয়) আমরা জগতের ও আমাদের জীবনের যতটুকু জানিতেছি, এই টুকুই সমস্তটা নহে।

ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় এই পারমার্থিক সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কথাটা খুব সহজে এই ভাবে ভাবিতে পারা যায়। 'সত্য করিয়া হওয়া' আর 'মনে হওয়া' এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, আর চন্দ্র ও সূর্য্য, দুইটি বড় বড় আলোকের মত, আর নক্ষত্রগুলি যেন প্রদীপ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলেন, ইহার একটা কথাও সত্য নহে। 'মনে হওয়া' ও 'সত্য করিয়া হওয়া' এই দুইটির মধ্যে প্রভেদ আছে, এই কথাটা মানুষ যখন সত্য সত্য হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারে, এবং বুঝিতে পারিয়া নিজের দর্প ও যথেচ্ছাচার এই দুটিকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করে, সেই সময়েই আমরা যাহাকে ধর্ম্মজীবন বলি, তাহা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে মানব ইন্দ্রিয়গণকেই একমাত্র সত্য বলিয়া জানিত, এখন সমাজ কর্ত্তৃক ও গুরুগণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট সংযমাদি ধর্ম্ম পালন করিয়াই হউক, আর জড়বিজ্ঞানের আলোচিত

পরমার্থ ও ব্যবহার।

সত্য করিয়া হওয়া ও মনে হওয়া।

ব্যবহারিক সত্য লইয়া আলোচনা করিতে করিতে, ইহা ছাড়া আরও কিছু আছে কোনও কারণে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াই হউক, মানুষের চিন্তার ও কর্ম্মের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অতীন্দ্রিয় যে পরমার্থ সত্য, তৎপ্রতি তাহার অনুরাগ জাগিয়া উঠিল।

রুচিলক্ষণা ভক্তি ও শ্রবণে অনুরাগ

ইহার নাম শ্রীজীব গোস্বামীর মতে **রুচিলক্ষণা ভক্তি**। ইহাই সর্ব্বপ্রথমে মানবচিত্তে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রবণাদিলক্ষণ যে সাধন-ভক্তিযোগ তাহা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই শ্রীজীব গোস্বামীর উপদেশ। ক্রমসন্দর্ভ টীকায় তিনি বলিতেছেন, **"জাতায়াঞ্চ তস্যাং রুচিলক্ষণায়াং ভক্ত্যাং তয়ৈব শ্রবণাদিলক্ষণসাধন ভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিতঃ স্যাৎ।"**

পূর্ব্বোক্ত অংশের সরল তাৎপর্য্য এই। রুচিলক্ষণা ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইলে বা বিকশিত হইলে ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহার পূর্ব্বে হয় না। যেমন আত্মতত্ত্বের অনুশীলন, ইহাও যে কোন অবস্থায় যে কোন লোকের হয় না, সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের একটা অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া মানবের চিত্ত যে সময়ে নিত্য ও অনন্তের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, অর্থাৎ বলে **"ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি"** সেই সময়েই মানব ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হয়, তাহার পূর্ব্বে, ব্রহ্মবিদ্যার কথা সে শুনিয়া ঠিক বুঝিতে পারে না, স্মৃতিশক্তির দ্বারা আয়ত্ত করিলেও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের যে সাধনা, তাহার পথে অগ্রসর হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই রুচিলক্ষণা ভক্তির প্রয়োজন। এই রুচি কি কি উপায়ে লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদরূপে আলোচনা করিব। এখানে এইটুকুমাত্র বলিয়া রাখা দরকার যে সকল মানুষের ঠিক একই উপায়ের মধ্য দিয়া এই রুচির উদ্ভব হয় না। তবে মোটামুটি

অনন্তের জন্য ব্যাকুলতা।

শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ।

কতকগুলি বিষয়ে মিল আছে, আচার্য্যগণ সেইগুলিই বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ।

এই রুচি-লক্ষণা ভক্তি উৎপাদিত হওয়ার পর শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিতে ও ভগবানের নাম, গুণ ও লীলাদি কীর্ত্তন করিতে প্রকৃত অনুরাগ জন্মে ও মানব শনৈঃ শনৈঃ শ্রীবৃন্দাবনাভি-মুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে প্রকৃত জীবন আরম্ভ হইল।

পূর্ব্বে যে শ্লোকটির আলোচনা করা গিয়াছে তাহার পরের শ্লোকটি এই।

"বাসুদেব ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

প্রাচীন সাধারণ মতে, প্রথম যজ্ঞ, দান ও তপস্যা।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিলেন যে আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে এই বেদবাক্য প্রচলিত আছে যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারায় জ্ঞান হয়, ইহাই ধর্ম্ম-সাধনার পথ। ভাগবতে বলা হইল যে যাহা হইতে অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি উৎপাদিত হয় তাহাই পরধর্ম্ম। তাহা হইলে ভাগবত শাস্ত্র কি প্রাচীন মত উড়াইয়া দিয়া একটী অভিনব মতের প্রতিষ্ঠা করিলেন? শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, না ভাগবত তাহা করেন নাই। ভাগবত বলিতেছেন যে "ভগবান বাসুদেবে ভক্তি-যোগ প্রযোজিত হইলে আশু বৈরাগ্য জন্মায় ও সেই বৈরাগ্যের ফলে জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয়। অবশ্য এই যে জ্ঞান, ইহার একটু বিশিষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠতা আছে। এই জ্ঞান অহৈতুক অর্থাৎ শুষ্কতর্কাদির অগোচর। এই জ্ঞানকে ঔপনিষদ জ্ঞান কহে।"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ভাগবত-ধর্ম্মে অগ্রে ভক্তি, তাহার পর বৈরাগ্য। বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহ পরিত্যাগ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই উপদেশ পাইয়া থাকি এবং তদনুযায়ী চেষ্টাও করিয়া থাকি, কিন্তু প্রায়শঃই কৃতকার্য্য হই না। আসল কথা

একটা বড় অনুরাগ চিত্ত মধ্যে জাগাইতে পারিলে, সেই নিত্য ও পরমার্থ বস্তুকে একবার আভাসে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার জন্য একটু ব্যাকুল হইতে পারিলে, আর বৈরাগ্য সাধনার জন্য বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না, আপনিই তাহা হইয়া যাইবে। বৈরাগ্য হইলে জ্ঞানও সুলভ।

প্রথমে ভক্তি তাহার পর বৈরাগ্য ও জ্ঞান, ইহাই ভাগবতের মত।

শ্রীজীবগোস্বামী এই শ্লোকের মর্ম্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার অভাস দিয়াছি। তিনি এই উপদেশ দিলেন যে রুচিলক্ষণা ভক্তির উদয় হইলেই মানবের জীবন শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা অত্যন্ত দ্রুতবেগে উন্নত ও পবিত্র হইয়া উঠিবে। এতদিন হিসাব নিকাশ করিয়া, বাহির হইতে নানারূপ চেষ্টা করিয়াও যে পবিত্রতা অর্জ্জনের জন্য অগ্রসর হইয়া পদে পদে পদস্খলিত হইতেছিলাম, এখন তাহা আপনিই অনায়াসে সাধিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত নিম্নের শ্লোকে এই ভাবেরই দ্যোতনা করিয়াছেন—

"যস্যাস্তি ভক্তি-র্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"

ভক্তি হইলে সমুদয় সদ্‌গুণ চরিত্রে উদয় হইয়া স্থায়িত্ব-লাভ করে।

শ্রীভগবানে যাহার আকিঞ্চনা ভক্তি আছে অর্থাৎ যিনি হৃদয়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড শূন্যতা অনুভব করিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন আমার আর কিছুই নাই; ধন, জন, মান সম্ভ্রম, এ সমস্ত আমার নহে, এই জ্ঞানের উদয়ে যিনি শূন্য-হৃদয়ের পূর্ণতাবিধানের প্রয়াসী হইয়া শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের জন্য লোলুপ হইয়াছেন; সমস্ত দেবগণ যাবতীয় সদ্‌গুণ লইয়া সেই ব্যক্তির চরিত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার নৈতিক জীবন তৎক্ষণাৎ উচ্চতম পবিত্রতার ক্ষেত্রে আরোহণ করে। যাঁহার এই ভক্তি নাই, তাঁহার মহদ্‌গুণ কোথায়? অর্থাৎ তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের ও অন্যান্য সদ্‌গুণেরও একটা স্থায়ী ও দৃঢ়ভিত্তি নাই, সে ব্যক্তি মনোরথে আরোহণ করিয়া

কেবল বাহিরে অর্থাৎ সুখশান্তির অন্বেষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

ভক্তিহীন মানবের নৈতিক-জীবনের নিশ্চয়তা নাই।

বর্ত্তমান সময়ে দেশে ভক্তিশাস্ত্র যথার্থভাবে প্রচার করার ও আস্তিক্যবুদ্ধি জাগরিত করিয়া মানবকে শ্রীভগবানে অনুরাগ-যুক্ত করিবার চেষ্টার আবশ্যকতা কি, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। মানুষকে বলা যায় দেশের জন্য পরিশ্রম কর, দরিদ্রের অন্নব্যবস্থা কর, অশিক্ষিতকে জ্ঞানালোক প্রদান কর। সে তাহা করিতে যায়। ক্রমে ক্রমে তাহার খ্যাতি হয়, সম্ভ্রম হয়, ধনী-সন্তানেরা পৃষ্ঠপোষক হইয়া দরিদ্র ও শক্তিশালী ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার হৃদয় মধ্যে যে বিষয়বাসনা এতদিন নিদ্রাগত ছিল, তাহাকে জাগাইয়া তুলেন, তখন সে বেচারা বিষয়পঙ্কে পড়িয়া নিজের ও দেশের সর্ব্বনাশ করে। এইরূপ ঘটনা দেশে সতত ঘটিতেছে, ইহা হইতে দেশ পরিত্রাণ পাইতে পারে না, যদি সর্ব্বাগ্রে সাধকের চিত্তে, কর্ম্মীর চিত্তে এই আকিঞ্চনা ভক্তি উৎপাদন করিয়া তাহাতে নিয়মিতভাবে শ্রবণকীর্ত্তনময় বারিসিঞ্চন করা না যায়। শ্রীমদ্ভাগতগ্রন্থের প্রতিপাদ্য যুগধর্ম্মের এই বিশিষ্টতাটুকু চিন্তাশীল ও দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। একদিকে সুবিধা-বাদ আর একদিকে ভাগবতধর্ম্ম, ইহা কখনই হইতে পারে না।

ভক্তিহীনের পতন হইয়া থাকে।

এই পথ আশ্রয় করিলে (শ্রীজীবগোস্বামীর মতে) যে জ্ঞান হয়, তাহা শ্রীভগবানের স্বরূপাদিসম্বন্ধীয় জ্ঞান। শ্রীভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞানের উদ্রেক হইলে অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য আপনা হইতে সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। আলোক জ্বালিলে অন্ধকার যেমন দূরগত হয়, সেইরূপ। মূলে আছে আশু জ্ঞান উৎপাদিত হয়। আশু শব্দের অর্থ শ্রবণমাত্রেই। আমরা শাস্ত্র শ্রবণ করি, কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় হওয়ার পর যে বৈরাগ্য হয়, সেই বৈরাগ্য উৎপাদিত হইলে ভগবৎকথা শ্রবণমাত্রেই তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়।

ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান হইলেই বৈরাগ্য জন্মে।

বৈরাগ্য হইলে ভগবৎকথা বুঝিতে পারা যায়।

আজকাল অনেকেই ভক্তিশাস্ত্র ও লীলাগ্রন্থের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা এইটুকু সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে হৃদয় ও মন একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত না হইলে ভক্তিশাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া অসম্ভব। প্রথমে কিছু সাধনা চাই, নতুবা যেরূপ ভাবে স্কুল কলেজের গ্রন্থ পড়িয়া আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সে ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের আলোচনা করিলে কোনই ফল হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে আমরা যাহা পাইলাম তাহা সংক্ষেপে এই। শ্রীভগবানের রূপ ও গুণের মাধুর্য্য অপরিসীম। এই রূপগুণ-মাধুর্য্য যদি একবার শ্রীভগবানের কৃপায় মানব অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে যাবতীয় দুর্ব্বিষয়ে স্বভাবতঃ বৈমুখ্য জন্মিয়া থাকে। এই যে ভক্তিযোগ, ইহা ভগবানে প্রযোজিত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যোজিত হওয়া চাই। প্রকৃষ্টরূপে যোজিত বলিলে সম্বন্ধানুগা ভক্তি বুঝিতে হইবে, আমি ভগবানের দাস বা সখা এই প্রকারের একটা অভিমান আসিয়া মানবকে আশ্রয় করে। এই অবস্থা আসিলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনা হইতেই উৎপাদিত হয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন, "জ্ঞানবৈরাগ্যার্থং পৃথক্ যত্নো ভক্তৈর্নকর্ত্তব্যঃ" যেমন আহারের দ্বারা তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানাশ হয়, সেইরূপ ভক্তি, পরেশানুভব ও অন্যত্র বিরক্তি এই তিনটি এককালে সাধিত হয়।

ভক্তি দুর্ব্বলের নহে।

এইবার আমরা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যে ভক্তি, তাহার স্বরূপ কি। ভক্তি দুর্ব্বলের নহে, ভক্তি আরামপ্রিয় ব্যক্তির নহে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক জন-সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের জন্য যে সমস্ত ভাবুকতা করে তাহাও ভক্তি নহে; ভক্তি বড় উচ্চ জিনিস। আজ দেশে ভক্তির এই স্বরূপ বিশেষভাবে প্রচার করা একান্তভাবে প্রয়োজন। নতুবা এই পুনরুত্থানের দিনে যে অসুবিধা আছে, সেই সুবিধা দ্বারা অনর্থ হইতে পারে।

ভক্তির মৌলিকতা।

ভক্তির অজন্যতা ও মৌলিকতার উপর ভাগবত-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি হয়, কর্ম্মের দ্বারা বা যোগের দ্বারা ভক্তি বা অন্য কোন কিছুর দ্বারা ভক্তি হয়, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। ভক্তি প্রথম হইতেই থাকে। একটা উদাহরণ দিলে আচার্য্যগণের বিচারণা-পদ্ধতি কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ জ্ঞানের সাধন-পদ্ধতি লইয়া আলোচনা করা যাউক। **সাধন-চতুষ্টয়** এই জ্ঞানসাধনার পথ। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব ইহাই সাধন-চতুষ্টয়। ষট্‌সম্পত্তির মধ্যে ছয়টি কথা রহিয়াছে, তাহাদের নাম শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান।

সাধনচতুষ্টয়।

বিবেক ও বৈরাগ্য লইয়া একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। ভক্তি প্রথম হইতেই ইহাদের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, আমরা সাহস করিয়া স্বীকার করি বা না করি, সাধনক্ষেত্রে ভক্তিদেবীই রাজরাজেশ্বরী, মানবের প্রকৃত কল্যাণ এই ভক্তিদেবীই সাধন করিতেছেন।

বিবেক

প্রথমতঃ দেখা যাউক বিবেক কি? শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন,—

"ব্রহ্মৈব নিত্যমন্যৎ তু অনিত্যমিতি বেদনম্।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইতি কথ্যতে॥"

ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, আর যাহা কিছু সকলই অনিত্য, এই প্রকারের যে জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বৈরাগ্য

তাহার পর বৈরাগ্য।

"ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ।
নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধি যৎ তদ্‌বৈরাগ্য ইতীর্য্যতে॥"

ঐহিক ও পারলৌকিক সকল ভোগ্য বস্তুই অনিত্যরূপে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তৎসমুদয়ে যে তুচ্ছবুদ্ধি জন্মে, তাহার নাম বৈরাগ্য।

'ব্রহ্ম নিত্য' এই জ্ঞান পূর্ব্বে, আর এই জ্ঞানের সাহায্যেই অন্য সকলের অনিত্যতা ও তুচ্ছতা উপলব্ধি হইতেছে। ভিতরে নিত্য না থাকিলে, অনিত্য বলিয়া কোন কিছুকে বুঝিতে পারা যায় না। ভিতরে ভাব না থাকিলে অভাবের বোধ হয় না। এখন 'ব্রহ্ম নিত্য' এইটুকু যদ্যপি বিচার করিয়া বা তার্কিকের যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে কি হইবে? উত্তরে সকলেই বলিবেন, কিছুই না। আমরা শাস্ত্র পড়িয়াছি, হিসাব করিয়া বুঝিয়া দেখিয়াছি, ইহলোকে ও পরলোকে যাহা কিছু আমরা সত্য বলিয়া জানি ও যাহা কিছু পাইবার জন্য দিনরাত্রি ব্যাকুল হইয়া পরিশ্রম করি, তৎসমুদয় অনিত্য। কিন্তু শুধু জানিয়া কি হইবে? আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের মত—

'শুধু জানা কিছুই নহে।

বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

"দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।"

চণ্ডীর প্রমাণ

যে সমস্ত বিষয় দোষযুক্ত বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাতেও 'আমার' এই প্রকারের স্ব স্বামিত্ববুদ্ধি জাগিতেছে।

এই প্রকারের 'শুধু জানা' (mere knowing) পশু পক্ষীর মধ্যেও আছে।

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥" মার্কণ্ডেয়চণ্ডী

"যদিও মানবগণ পশু পক্ষীর ন্যায় সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন * তথাপি মহামায়াপ্রভাবে বাসনারূপ আবর্ত্ত-বিশিষ্ট মোহরূপ গর্ত্তে নিপাতিত হইয়া সংসার-স্থিতির হেতু হইয়া থাকে। জগৎপালক পরমেশ্বরের যোগনিদ্রা স্বরূপ যে মহামায়া, তিনিই এই জগৎকে সম্যক্‌রূপে মোহিত করিতেছেন। অতএব এই মোহবিষয়ে বিস্ময় করিও না। দেবী অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রকাশিকা ভগবতীর অচিন্ত্য মহিমা; সেই মহামায়া জ্ঞানীগণেরও চিত্তকে স্বীয় শক্তিবশে বিবেক হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। তিনিই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।"

নিত্যে অনুরাগ না হইলে অনিত্যে তুচ্ছবুদ্ধি হয় না।

সুতরাং ইহলোক ও পরলোক অনিত্য বলিয়া যগুপি তাহাতে তুচ্ছ-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে নিত্য যে ব্রহ্মবস্তু তাহাতে অনুরাগ থাকা চাই। বিচারটুকু এই। একজন বলিতেছেন, আগে বুঝিব এ সব অনিত্য, তাহার পর নিত্য বস্তুতে অনুরাগ হইবে; এই দুইটির মধ্যে যেন একটা কালগত ব্যবধান আছে, এবং এদুটির মধ্যে যেন প্রথমটি জনক আর দ্বিতীয়টি জন্য। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে আমাদের এই ধারণা ভুল। নিত্যে অনুরাগ বা ভক্তি প্রথম হইতেই আছে, তবে তাহা বীজরূপী বা অস্পষ্ট হইতে পারে। ইহা হইতে ভক্তির অজন্যতা ও মৌলিকতা প্রতিপাদিত হইল। Originality and primacy of the feeling aspect in man ক্রমশঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও স্বীকৃত হইতেছে।

'নিত্যে অনুরাগ'ই ভক্তি।

* মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর এই স্থানের ব্যাখ্যায় প্রাচীন আচার্য্যেরা দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে যে বিশেষ রকমের একটা প্রভেদ আছে, তৎপ্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহার একটিকে সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় সামান্য জ্ঞান ও অপরটিকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যাইতে পারে; ইহাদের নাম প্রাচীনমতে যথাক্রমে জ্ঞান ও বিজ্ঞান। প্রথমটি মনের সাহায্যে ও দ্বিতীয়টি বুদ্ধির সাহায্যে লব্ধ হইয়া থাকে।

জ্ঞানযোগ সাধনার প্রত্যেক অঙ্গটি লইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ভক্তিদেবী রাজরাজেশ্বরীর মত কেমন করিয়া আমাদের অলক্ষ্যে থাকিয়া বিশ্বপোষণ করিতেছেন। এই ভক্তিদেবী ভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সাররূপা।

সুতরাং প্রথমে ভক্তি তাহার পর বিবেক ও বৈরাগ্য।

অষ্টাঙ্গযোগ।

অষ্টাঙ্গযোগের আলোচনাতেও এই একই সত্য আবিষ্কৃত হইবে। মহাভারতে আছে "বেদেষু চাষ্টগুণিতং যোগমাহুর্মনীষিণঃ" বেদে যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া মনীষিগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গ যোগের নাম, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি লওয়া যাউক। অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, ইহাদের নাম যম। এসম্বন্ধে ব্যাসভাষ্যে এইরূপ উপদেশ আছে।

যম।

তত্রাহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ, উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মূলাস্তৎসিদ্ধিপরতয়া তৎপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে তদবাতরূপ করণায়ৈবোপাদীয়ন্তে তথাচোক্তং "স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা তথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎস্যতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতি।"

অহিংসা।

অর্থাৎ এই সকলের মধ্যে অহিংসা সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে), সর্ব্বভূতের অনভিদ্রোহ। সত্যাদি অন্য গুণগুলি ও যমনিয়মাদি অহিংসামূলক, তাহারা অহিংসা সিদ্ধির হেতু বলিয়া অহিংসা প্রতিপাদনের নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর অহিংসাকে নির্ম্মল করিবার জন্যই সত্যাদি প্রয়োজন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মবিৎ যে ভাবেই ব্রত অনুষ্ঠান করুন না কেন, ঐ ঐ ব্রত দ্বারা তিনি প্রমাদকৃত হিংসা হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া অহিংসাকেই নির্ম্মল করেন।

প্রেমই অহিংসা।

একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে কেবল প্রাণীপীড়ন বর্জ্জন করাই অহিংসা নহে, সকলের প্রতি মৈত্রী প্রভৃতি সদ্ভাব পোষণ করিতে হইবে। সকলের প্রতি যথার্থরূপে সদ্ভাবপোষণ কিরূপে হইতে পারে? সর্ব্বভূতে আশ্রয়তত্বরূপে, চৈতন্যরূপে, এবং আনন্দ বা মধুরূপে যে পরমার্থ সত্য রহিয়াছেন, সেই পরমার্থসত্যের প্রতি অনুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত যম, নিয়মাদি অনুষ্ঠান একটা প্রাণশূন্য ব্যাপার ও সার্থকতাহীন। এখানেও ভক্তির মৌলিকতা ও অজন্যতা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সুতরাং ভক্তিই মূল।

আসল কথা এই যে ভক্তির সংজ্ঞা লইয়া ও বিশ্বব্যাপারের প্রকৃত অর্থ লইয়া আমাদের চিত্তে দারুণ ভ্রান্তি থাকিয়া যায়, সেই জন্য আমরা ঠিক ভাগবতধর্ম্ম ও লীলাতত্ব বুঝিতে পারি না।

রাধাকৃষ্ণতত্ব।

লীলাবাদীগণ আমাদিগকে শ্রীরাধকৃষ্ণতত্ব বা "যুগল-পিরীতি" কি তাহাই অনুধ্যান করিতে বলিয়াছেন।

ভগবান গম্য ও গময়িতা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ব চিন্তা করিলে প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে ভগবান্ কেবল গম্য নহেন, তিনি গম্য ও গম্যয়িতা। তিনি নিজেকে নিজের হইতে পৃথক করিলেন। তার্কিক বলিলেন, "তিনি পূর্ণ ছিলেন, তাঁহাতে অপূর্ণতা আসিল।" কিন্তু শ্রুতি ইহার উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" অর্থাৎ পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে।

ভগবান্ নিজেকে নিজে খোঁজেন।

তিনি নিজেকে নিজের হইতে পৃথক্ করিলেন কেন? ইহার উত্তর—নিজেকে নিজে খুঁজিবার জন্য, নিজেকে নিজে ভালবাসিবার জন্য। নিজেকে নিজে খোঁজেন কেন? নতুবা লীলা হয় না। নতুবা জগৎ তাঁহাকে খুজিবার প্রবৃত্তিই বা কোথা হইতে পাইবে আর খুঁজিবার পথই বা কোথা হইতে পাইবে? লীলা শেষ হইলে নিজেকে নিজে খুঁজিয়া পাইবেন। কিন্তু লীলার শেষ নাই। লীলা অনাদি ও নিত্য।

শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও

শ্রীমতীকে খুঁজিতেছেন। এই যে মিলনচেষ্টা, ব্রজদেবীগণ তাহাতেই নিমগ্না, তাঁহাদের অন্য চেষ্টা, অন্য আকাঙ্ক্ষা, অন্য কল্পনা ও আশা নাই। কিসে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইবে, এই তাঁহাদের ধ্যান, এই তাঁহাদের জ্ঞান। বৈষ্ণবসাধক এই গোপীগণের অনুগতা হইতে চাহেন, তাঁহাদের আর অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। যেমন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—

ভক্তের প্রার্থনা – এই যুগলপ্রেমের সেবা।

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষ-ভানুপুরে, আহীরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব।
যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায়॥
তেঁহ কৃপাবান হইয়া, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুঁহার যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানাযন্ত্র লঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে।
দুঁহু চাঁদ মুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার॥

শ্রীরাধা-মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তম দাস ভণে, প্রিয়নর্ম্ম সখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায় ॥'

সর্ব্বসাধারণের সুবোধ্য করিয়া এই তত্ত্বটি বুঝাইতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়। এই বিশ্বলীলায় আমরা জীবকুল, যে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া একেবারে অসহায় ভাবে, আঁধার হইতে গভীরতর আঁধারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, এ কথা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। এই বিশ্বের যিনি কর্ত্তা, যিনি একমাত্র সত্য, তিনি আনন্দময়। তাঁহার একটী ইচ্ছা আছে। তিনি রসময় ও আত্মারাম হইয়াও যোগমায়া আশ্রয় করিয়া বিলাসের জন্য ব্যাকুল।

ভগবানের ইচ্ছা—আত্মারাম বিলাসের জন্য আকুল।

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আলিঙ্গিতে মনে উঠে কাম।

ইহাই ভগবানের স্বরূপের নিগূঢ় পরিচয়। মানুষ যদি একবার সজ্ঞানভাবে শ্রীভগবানের এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে এই মহৎ ও মধুর এবং একমাত্র কার্য্যের সহায়তায় আত্ম-বিসর্জ্জন না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। তখন এই লীলারস আস্বাদনের জন্য শ্রীভগবানের যে নিত্যব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতার সহিত তাহাকে তাহার জীবনের সুর মিলাইয়া ফেলিতে হইবেই হইবে। এই ব্যক্তি তখন ভগবানের স্বগণ, বিশ্বকল্যাণের সেবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত, অকল্যাণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাঁহার আর আত্মসুখদুঃখ বা লাভা-লাভের বিচার থাকে না, তাঁহার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত হয়। ইহাই জীবের স্বভাব, ইহাই আধ্যাত্ম, ইহাই স্বরূপে অবস্থান। ইহারই উপরে শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্যলীলাবাদ প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্ম বা

এই ইচ্ছা বুঝিয়া এই ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

ইহাই প্রেমসেবা।

ব্রহ্মার জগৎ ইহার নীচে। এখানে বিধি আসিয়া রাগে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এই রাজ্যের যিনি অধিশ্বরী তিনি যোগমায়া। তাঁহার সম্বন্ধে চণ্ডী বলিয়াছেন

যোগমায়ার রাজ্য।

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

সেই দেবীই আবার প্রসন্না হইয়া মুক্তির হেতু হয়েন। মুক্তি বলিতে যেন আমরা মোক্ষাভিসন্ধি বা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা না বুঝি।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে স্বরূপে অবস্থান তাহারই নাম মুক্তি।

ইহাই জীবের স্বরূপে অবস্থান।

এই যোগমায়া, তিনি কার্য্য করিতেছেন। মা যেমন স্তন্যপান করাইয়া সন্তানকে পোষণ করেন, তেমনি দেবী কাত্যায়নী আমাদিগকে পোষণ করিতেছেন। মায়ের ছেলে হইতে না পারিয়াই এত দুঃখ, মায়ের করুণামৃতধারা সর্ব্বদা আসিতেছে, অথচ তাহা উপেক্ষা করিয়া বিষ খাইতে'ছি, ইহাই দুঃখ।

ভক্তের প্রার্থনা।

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রাচীন মত সমূহ গ্রহণ করিয়া যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের যাহা যুগধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তাহাই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্র-সমূহে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ কথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে তাহার ধ্বংস করা হয় নাই, সেই সমস্ত উপদেশের মধ্যে তাহাদের সার্থকতা ও চরম লক্ষ্যরূপে যে তত্ত্ব লুক্কায়িত ছিল, শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে সেই তত্ত্বকে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই পরম তত্ত্বের নাম প্রেম, একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই ইহার বিষয়। এই প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলে।

প্রেম এই যুগ-ধর্ম্মের আদর্শ—অন্যান্য আদর্শ সকলের কাহারও বিরোধী নহে।

যতক্ষণ সূর্য্যদেব উদিত না হয়েন, ততক্ষণ নক্ষত্রগণ আলোক দান করিয়া মানবের যে আলোকের প্রয়োজন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকেন; কিন্তু সূর্য্য উদিত হইলে নক্ষত্রগণ যে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় বা পলায়ন করে, তাহা নহে, তবে সূর্য্যের উজ্জ্বল আভায় মলিন হইয়া পড়ে ও সূর্য্যের আলোক যাহার চক্ষুতে লাগিয়াছে সে আর নক্ষত্রগণকে দেখিতে পায় না, বরং নক্ষত্রগণের দ্বারা এতক্ষণ কোনপ্রকারে যে কার্য্য সাধিত হইতেছিল, সূর্য্যালোকে তাহা সুশৃঙ্খলায় ও সুন্দররূপে সাধিত হয়। এখন জগতে যদ্যপি কেহ থাকেন, যিনি সূর্য্য উদিত হইলেও তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা হইলে নক্ষত্র-কিরণেই তাঁহাকে নিজের কার্য্য চালাইতে হইবে। সেইরূপ প্রেমের কথা জগতে প্রচারিত হওয়ার পর, একমাত্র যিনি প্রেমদাতা তিনি মানবের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিয়া যাচিয়া যাচিয়া নির্ব্বিচারে সকলকে এই প্রেমধন বিতরণ করার পরেও যদি কেহ এই প্রেমধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুভব করিতে না পারেন, তাহা হইলে অহঙ্কারের ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিলে যাহা হয়, তাঁহারও তাহাই হইবে অর্থাৎ তিনি ধর্ম্ম, অর্থ. কাম, মোক্ষ,

প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ।

এই চতুর্ব্বর্গের উপাসনা করিবেন। যাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল ও সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত, তাঁহাদের নিকট এই প্রেমধর্ম্মের কথা বর্ণনা করা একেবারে নিরর্থক। যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপায় এই প্রেমের আভাসমাত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের, তাঁহারা একশ্রেণীর নূতন জীব। তাঁহারা নিজের জন্য কিছুই চাহেন না, স্বর্গ, মোক্ষ, ঐশ্বর্য্য কিছুই চাহেন না, নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। একমাত্র প্রেমাস্পদ ও প্রেমদাতা শ্রীভগবান্ তাঁহার এই বিশ্বলীলায় নিজের অচিন্ত্য ও অননুমেয় মাধুর্য্যরাশি বিতরণ করিয়া নিখিল চরাচরের ক্ষুদ্র পরমাণুটি পর্য্যন্ত অমৃতায়মান করিবার জন্য নিত্য ব্যাকুল; এই ব্যাকুলতায় তাঁহার অধরে যেন আর সুধারাশি ধরিতেছে না, সর্ব্বদা উথলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে, আর তিনি সেই উচ্ছ্বলিত অধর-সুধা বংশীরবের সাহায্যে অর্থাৎ আদিভূত যে আকাশ, তাহার ধর্ম্ম যে শব্দ, সেই শব্দকে আশ্রয় করিয়া, নিখিল ভূতগ্রামকে প্রেমময় করিতেছেন, এই জন্যই সেই বংশীবাদনকারী হরি ভূতভাবন।

প্রেমিক মানুষ নূতন ধরণের মানুষ।

কিন্তু এই ভাবটুকু, এক শ্রীভগবান্ বা তাঁহার ভক্ত ছাড়া আর কেহ কাহারও মধ্যে জাগাইতে পারেন না। আত্মবিসর্জ্জনেই সুখ, আত্মরক্ষায় নহে, সুখবাঞ্ছা না থাকাই, কোটিগুণ বা অমিত সুখলাভের একমাত্র উপায়, এ কথা কেহ কাহাকেও তর্ক দ্বারা বা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারেন না।

আত্মবিসর্জ্জনে সুখ, আত্মরক্ষায় নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম হইতে মুখ্যরূপে এই প্রেমের কথাই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শৌণকাদি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে সূত কর্ত্তৃক কথিত নিম্নের শ্লোকে পূর্ব্বের কথাই দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে—

ইহাই ভাগবতের সারকথা।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিত: পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

লীলা-কথায় রুচি না জন্মাইলে যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান বিফল।

ধর্ম্ম বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানের লীলা-কথায় যদ্যপি রুচি না হয়, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মবিষয়ক শ্রম, বিফল শ্রমমাত্র। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন যে, যে ধর্ম্মের লক্ষ্য মোক্ষ, তাহাও বিফল শ্রম। 'কেবল' পদের দ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। স্বর্গাদি যে ফল তাহা ক্ষয়শীল 'এব' পদের দ্বারা তাহার নিরাকরণ হইয়াছে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের এই সুকৃত অক্ষয় হইয়া থাকে। (অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি) বস্তুতঃ তাহা হয় না, ইহাই প্রতিপাদন করার জন্য "হি" এই শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। আসল কথা এই যে ইহলোকে যেমন কর্ম্মের দ্বারা অধিকৃত লোকের (সম্পদের) ক্ষয় হইয়া থাকে, পরলোকে পুণ্যের দ্বারা উপার্জ্জিত লোকেরও সেইরূপ ক্ষয় হইয়া থাকে।

মোক্ষ বিফল, স্বর্গ বিফল।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভক্তির অজন্যতা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বশ্লোকে ও বর্ত্তমান শ্লোকে তাহাই প্রতিপাদিত হইল। বর্ত্তমান শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় উপসংহারে বলিলেন, "শ্লোকদ্বয়েন ভক্তিনিরপেক্ষা জ্ঞানবৈরাগ্যে তু তৎসাপেক্ষে ইতি লভ্যতে!" অর্থাৎ জীবের যাহা একমাত্র কল্যাণ, তাহা ভক্তিদেবীই অপর কাহারও সাহায্য না লইয়া সাধন করিয়া থাকেন, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যে আমাদের কল্যাণ করেন তাহাতে তাঁহারা ভক্তিদেবীর অপেক্ষা রাখেন অর্থাৎ রাজরাজেশ্বরী শ্রীভক্তিদেবী তাঁহাদের পশ্চাতে ও সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্য সম্ভব করেন।

শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে শাস্ত্রকার "এব" শব্দের দ্বারায় প্রবৃত্তি লক্ষণ যে কর্ম্ম, তাহার ফলে যে স্বর্গাদি লোক তাহার ক্ষয়িষ্ণুত্ব প্রতিপাদন করিলেন। "হি" শব্দের দ্বারায় যেমন ইহলোকে কর্ম্মজিত লোকসমূহ ক্ষয় হইয়া

ইহলোকে কর্ম্মজিত লোকসমূহ ক্ষয়শীল।

থাকে, সেইরূপ, এই কথা বলিলেন। আর "**কেবল**" এই অব্যয় শব্দটির দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে কেবলমাত্র নিবৃত্তিমাত্র লক্ষণ যে ধর্ম্ম, তাহার ফলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যে জ্ঞান হয় তাহা নশ্বর। "হি" শব্দের দ্বারা বেদের একটি প্রমাণের কথা সূচিত হইয়াছে, তাহা এই—

বেদের ইহাই উপদেশ।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা।

এইবার আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা অনুসারে এই শ্লোকটির মর্ম্ম আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত যে যুগধর্ম্ম তাহার তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিব।

রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূত পরধর্ম্ম কি, তাহাই বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন, যাহা হইতে শ্রীভগবানে অহেতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি জন্মায় তাহাই পর ধর্ম্ম। এ প্রকারের উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইত না। পূর্ব্বে বলা হইত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই পর ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে কিছুই নহে এমন কথা বলেন নাই, তবে অবশ্য এ কথা বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উদ্দেশ্য নহে, উপায়। উদ্দেশ্য এই প্রেম। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধিনিষেধ অনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে "**নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম**" যাহা মানবের প্রকৃতির গূঢ়তম স্থলে নিহিত আছে, তাহার যদ্যপি উপলব্ধি হয় এবং যদি এই উপলব্ধি হরি-কথায় যে আত্যন্তিক অনুরাগ, সেই অনুরাগের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সার্থক; নতুবা কতকগুলি নিয়ম কেবলমাত্র অন্ধভাবে পালন করিয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ নহে। কথাটা আরও স্পষ্টরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে। আমি ব্রাহ্মণ, পাঁজি পুঁথিতে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই আমি পালন করিতেছি, কিন্তু আমার বড় অভিমান আমি ব্রাহ্মণ, আমি পা

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম; পরধর্ম্ম নহে।

তবে তাহার পালনের দ্বারা প্রেম আত্মপ্রকাশ করিলে, তাহা সার্থক।

কেবল নিয়ম পালন করিলেই হইবে না।

দুখানি সর্ব্বদা বাড়াইয়াই আছি, অন্য সকলে আমাকে প্রণাম না করিলে ক্রোধ হয়। যত দিন যাইতেছে, বিষয়াসক্তি ততই বাড়িয়া যাইতেছে, সংসারকে একেবারে কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়া আছি, যেমন অহঙ্কার, তেমনি ভোগলালসা, অন্য বর্ণের লোক যদ্যপি কোন ভাল কথা বলে বা ভাল কাজ করে, তাহা সহ্য করিতে পারি না; মনে করি ও লোককে বলি, বড় কথা ও ভাল কথা বলার অধিকার আমাদের একচেটিয়া, স্বর্গ বা মোক্ষ আমাদের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিয়া যে অধিকার, পুরাতন পুঁথির বচন আবৃত্তি করিয়া তাহা আদায় করিয়া আত্মপুষ্টি করিব, সমাজের নিকট বড় হইব, কিন্তু ব্রাহ্মণের যেটুকু দায়িত্ব অর্থাৎ ত্যাগপরায়ণ ও তপস্বী হইয়া পরার্থে জীবন যাপন করা, তাহা করিব না। যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপালনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের অবস্থা হয়, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঐ যে স্বধর্ম্মপরায়ণতা, উহা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র, বিফল পরিশ্রম। অন্ধভাবে উহা পালন করিলে লোক ঠকাইয়া দুপয়সা রোজগার হইতে পারে, কিন্তু উহাতে অহঙ্কার বাড়িয়া অমঙ্গলই হইতেছে।

তাহাতে যদি অহঙ্কার হয়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ।

আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার আলোচনা করিতে গিয়া এতগুলি কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে এই স্থানে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকায় এমন একটি কথা আছে, যাহা প্রথমটা পড়িয়া স্থূলদর্শীর মনে হয় যে তিনি বুঝি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিন্দা করিলেন। ধীরভাবে সমস্তটুকু আলোচনা করিলে বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিন্দা করেন নাই, তবে পূর্ব্বে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের যে অপব্যবহারের কথা বলা হইল, যাহা নামে ধর্ম্ম হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মের বিপর্য্যয়, তিনি বিশেষভাবে তাহারই নিন্দা করিয়াছেন। এমন কি সেরূপ অবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার উপদেশও তিনি প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিন্দা করেন নাই।

আসল কথা এই যে ভক্তের ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া, নিরভিমান ও পরার্থপর হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

তবে প্রকৃত কথা না বুঝিয়া ইহার অপব্যবহার করিলে বা ইহার অনুষ্ঠানের দ্বারা

পালন করিতে হইবে। তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধ হইবে। শুদ্ধচিত্তে বিষ্ণুর পরমপদ প্রকাশিত হইবে। তখন কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া মানব স্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকগণের অনুষ্ঠেয় যে ভাগবত-ধর্ম্ম তাহাতে প্রবেশ করিবেন।

অহঙ্কার জন্মিলে পরিত্যাগ করা যায়।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিতেছেন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্ম (শাস্ত্রে উপদিষ্ট কর্ত্তব্য) তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি হরি-কথায় রতি না জন্মায়, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র। এই স্থলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণঃ পূর্ব্বোক্তঃ পরোধর্ম্মঃ এবানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ" তাহা হইলে তিনি বলিতেছেন 'যদি রতি না জন্মায়'—তাহা হইলে।

যাঁহারা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশ গ্রাহ্য করেন, তাঁহারা যদ্যপি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দেশে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুখ্যরূপে প্রেমভক্তিতে লোকের চিত্তকে আর্দ্র করিতে চেষ্টা করুন। ভগবান মধুময়, প্রেমময়, করুণাময়, তাঁহার নামগুণলীলা প্রভৃতি কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে মানবচিত্তে প্রেমের উন্মাদনা আনিতে চেষ্টা করুন। যদি প্রেমের উন্মাদনা আসে এবং সেই প্রেমের অবিরোধী ভাবে এবং সেই প্রেমকে মুখ্য করিয়া তাহার অধীন বা পরিপোষক করিয়া এই বর্ণাশ্রম রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে, নতুবা তাঁহারা বিফল চেষ্টা করিয়া নিজের ও অপরের ক্ষতি করিবেন।

ভক্তির ভাব জাগিলে প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষিত হইবে—নতুবা সমুদয় চেষ্টা বিফল ও অহিতকর।

প্রেম হৃদয়ে না জাগিলে অহঙ্কার কিছুতেই চূর্ণ হইবে না। অহঙ্কার চূর্ণ না হইলে উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোককে ঘৃণা করিবে ফলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা উঠিলেই গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে। উচ্চ বর্ণের সহিত নিম্নবর্ণের সম্বন্ধ কি? উচ্চ বর্ণের লোকেরা পরার্থপর হইয়া নিম্নবর্ণের লোকের যাহাতে কল্যাণ

প্রেমহীন বর্ণাশ্রম-বিভাগ ঘৃণার ভাব জাগাইয়া গৃহবিচ্ছেদ জন্মায়।

হয় সে জন্য চেষ্টা করিবেন, পিতা যেমন নিজে পরিশ্রম করিয়া পুত্রের পালন ও পোষণ করেন, সেইরূপ উচ্চবর্ণের লোকেরা, আমরা উচ্চবর্ণ বলিয়া অহঙ্কার করিয়া তথা কথিত নিম্নবর্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন, আর জীবনে 'পয়সা পয়সা' করিয়া স্বার্থান্বেষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন, কাজের মধ্যে একবার কোশাকুশি লইয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া লোক ঠকাইয়া ছানা মাখন যোগাড় করিবেন, তাহা হইলেও তাঁহাদেরও সর্ব্বনাশ, সমাজেরও সর্ব্বনাশ, এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হইতে হইবে, ভক্তি ছাড়া মানুষ পরার্থপর হয় না, হইতে পারে না, প্রেম ছাড়া পরের জন্য খাটিতে পারে না। সুতরাং ভক্তির আদর্শ দেশে সর্ব্বাগ্রে ও মুখ্যরূপে প্রচার হওয়া দরকার।

চক্রবর্ত্তীর উদ্ধৃত একটী শ্লোক ও তাহার প্রকৃত অর্থ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকায় তিনি বলিতেছেন যে মূলেই ভক্তি থাকা চাই, নতুবা সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম বিফল। এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলেন যে কেন, এই প্রকারের শাস্ত্রবাক্য আছে যে

নিস্কামকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান হয়, কিন্তু জ্ঞান হইলেই যে ভক্তি হয় তাহা নহে।

"অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া॥"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, নিস্পাপ ও পবিত্রচিত্ত হইয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভক্তির হেতু রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে অহেতুকী বলা যায় কিরূপে?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন, এই শ্লোকে বলা হইল নিষ্কাম কর্ম্মযোগ জ্ঞানের জনক বা উৎপাদক। ইহাই বলা হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে ভক্তিরও যে জনক তাহা বলা হয় নাই।" কারণ "যদৃচ্ছয়া" এই পদটী রহিয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি-দেবী দৈবে আসিতে পারেন, এই কথা বলা হইল। যদি ভগবৎ-কৃপায় শুদ্ধাভক্তির প্রবেশ হয়, তাহা হইলেই নিষ্কাম কর্ম্মী তাহা

পাইবেন, নতুবা নহে। এইবার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সকল কথার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন "পরম ধর্ম্মাদন্যো যো বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণঃ স্বনুষ্ঠিতো নিষ্কামোঽপি ধর্ম্মো বিশ্বক্সেনকথাসু রতিং প্রীতিং নোৎপাদয়েৎ স কেবলং শ্রম এব যদি ইতি" অর্থাৎ 'যদি' এই পদটির অর্থ বিচার করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি বলিলেন যে শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণ যে পরধর্ম্ম, তাহার কথা তো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহা কখনই বিফল হইবে না। এই যে শ্লোক, ইহার তাৎপর্য্য শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানসম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। মনে করুন আমি হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ যথারীতি করিতেছি অথচ রতি জন্মিতেছে না, সে স্থানে এই শ্লোকের দোহাই দিয়া আমি বলিতে পারি যে তাহা হইলে আমার বিফল পরিশ্রম হইতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন, না, ইহা বিফল পরিশ্রম নহে, বোধ হয় যথারীতি শ্রবণ কীর্ত্তন হয় নাই, বোধ হয় অপরাধ হইতেছে, হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অপরাধ দূর কর, শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি পরিত্যাগ করিও না, ইহাকে পণ্ডশ্রম মনে করিও না, ইহা হইতে সমস্ত সিদ্ধ হইবে। এই যে পণ্ডশ্রমের কথা বলা হইল, ইহা ঐ পরধর্ম্মের ব্যতিরিক্ত যে বর্ণাশ্রমাচার, তাহারই সম্বন্ধে জানিতে হইবে, সে ধর্ম্ম যদি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ও নিষ্কাম হয়, তাহা হইলেও হরিকথায় রতি না হইলে বিফল জানিতে হইবে।'

শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধর্ম্ম কখনই বিফল নহে।

পূর্ব্বের কথাগুলি একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। যাঁহারা কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমের আচারগুলিকেই মুখ্য বলিয়া ধরিয়া আছেন, তাঁহারা হয় ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথায় কিছু অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাঁহার কথাগুলি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অন্যান্য কথার সহিত মিল করিয়া দেখা দরকার। নিম্নের লিখিত কথাগুলি সকলে বেশ ধীরভাবে আলোচনা করিলে বড়ই ভাল হয়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মত, যাবতীয় গৌড়ীয় আচার্য্যগণের মতের অনুগত।

সাধারণ লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠান বাহাড়ম্বর মাত্র। ভিতরের জিনিষ নহে। তাই অন্যবিষয়ে খুব বিচার করে, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচারহীন।

আমরা ধর্ম্ম করিতেছি। কি করিতেছি? না, মালা লইয়াছি, তিলক করি, তিনবার স্নান করি, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব বিচার, খুব আঁটাআঁটি, মন্ত্র জপ করি, স্তব পাঠ করি, পূজা করি। কিন্তু কার্য্যগুলি সমস্তই শারীরিক অর্থাৎ কেবলমাত্র শরীরের দ্বারা এই অনুষ্ঠানগুলি পালন করিয়া যাইতেছি, মনের বা হৃদয়ের কোনরূপ অনুশীলন হয় না। দোকান করিয়াছি, কি করিয়া দোকান চলিবে, এ জন্য তন্ময় হইয়া ভাবি, ছেলেটির অসুখ হই য়াছে, হৃদয় উদ্বেগে কাতর হইয়াছে, এ সকল ব্যাপারে মানসবৃত্তির বা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন আছে, কিন্তু ধর্ম্ম ব্যাপারটা একটা শারীরিক ব্যাপার মাত্র। আমাদের দেশে অনেকেরই এইরূপ অবস্থা। একটা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার দুই পক্ষের প্রমাণাদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কত চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা সত্যাসত্য বা হিতাহিত বা ন্যায় অন্যায় নিরূপণ করি, কিন্তু অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে সাহস করিয়া সত্যান্বেষণ করিতে পারি না। তখন মনে করি এ সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি, তাহাই ঠিক, এ বিষয়ে কোনরূপ বিচার করার দরকার নাই। এ জায়গায় মানসবৃত্তির অনুশীলন করিতে ভয় পাই। একজন ব্যবসায়ীকে তাহার ব্যবসায়-সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করা যাউক, সে ধীরভাবে তাহা শুনিবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবে ও চিন্তা করিয়া সত্য নির্ণয় করিবে, সে জায়গায় সে অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটা মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য করিতে পারে না, বিনা বিচারে পরের কথা মানিয়া লইতে পারে না। তাহার মানসিক বৃত্তির যতটুকু বিকাশ হইয়াছে, তাহার ষোল আনা খরচ করিয়া সে প্রত্যেক কথার ও প্রত্যেক কার্য্যের সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লয়। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এই ব্যক্তিরই অবস্থা অন্যরূপ, এখানে তাহার কোন উদ্বেগ নাই। একজন লোক তাহাকে একটা কথা শিখাইয়া দিয়াছে, গোটাকতক কার্য্য বলিয়া দিয়াছে সে তাহা করিয়া যায়, কেন করে, ইহা করিয়া কি হইবে তাহা সে ভাবেও না, ভাবিতে

চায়ও না। কেন এরূপ হয়? সাংসারিক ব্যাপারে বিনা বিচারে যে এক পদও চলিতে পারে না, পরমার্থ বিষয়ে সে বিচার করে না কেন? ইহার একমাত্র প্রকৃত উত্তর এই, যে সে ব্যক্তি প্রকৃত-প্রস্তাবে পরমার্থে বিশ্বাস করে না, পরমার্থের সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই, তবে যে ধর্ম্ম করে, ইহা কতকটা সংস্কারের বশে, কতকটা জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য, আর কতকটা 'কি জানি কিসে কি হয়' এই প্রকারের সন্দেহ-নিবন্ধন। ইহলোককে সে সত্য বলিয়া জানে, ইহলোকে তাহার স্বার্থ আছে, পরমার্থকে সে জানে না, মানেনা, কাজেই তাহাতে তাহার স্বার্থ নাই, এই জন্যই ধর্ম্ম একটা শারীর ব্যাপার।

জ্ঞানহীন কর্ম্মের ইহাই দুর্দ্দশা—জ্ঞানী ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, ভক্তও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কর্ম্মের এইরূপ দুর্দ্দশা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক স্থানেই তাহা দেখান হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ বর্ণনায়, ও বিপ্রপত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষায় এই তত্ত্ব অতীব বিশদভাবে বলা হইয়াছে। জ্ঞানমার্গ ইহার প্রথম প্রতিবাদ, জ্ঞানমার্গে বলা হয়, "গঙ্গাসাগরেই গমন কর, আর ব্রত-পরিপালন বা দানই কর, জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই কিছু হইবে না।" অর্থাৎ মানুষ তো কেবল শরীর নয়, যে কেবলমাত্র কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা ধর্ম্মমার্গে উন্নতি লাভ করিবে।

ভক্তি ইহার শেষ ও চরম প্রতিবাদ। কেবলমাত্র জানিয়া কর্ম্ম করিলেও হইবে না। মানবের সত্তা ভাবময়, ভাবুক হইতে হইবে, যিনি পরমার্থ সত্য তিনি রসময়, ভাব না থাকিলে রসের আস্বাদন হয় না।

শ্রীজীব গোস্বামীর মতে শ্রবণ ও কীর্ত্তন মনন বা স্মরণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে আমরা নবধা ভক্তি-সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীর যাহা অভিমত তাহা বর্ণনা করিয়াছি। সেখানে দেখান হইয়াছে যে তিনি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন, এই নবধা ভক্তির মধ্যে স্মরণকেই মুখ্যস্থান দিয়াছেন ও শ্রবণ কীর্ত্তনের মধ্যেও স্মরণ আছে তাহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ পূজার সময় যেমন মন্ত্র পড়ি, আর মন বাজারে মাছ কিনিয়া বেড়ায়,

ভক্তি-সাধনায় তাহা হয় না। শ্রবণ কীর্ত্তনাদির যে শ্রেষ্ঠতা বলা হইল, তাহা কেবল কাণে একটা আওয়াজ বাজানো, বা জিহ্বায় একটা শব্দ করা মাত্র নহে, তাহার মূলে স্মরণের দ্বারা একাগ্র হইয়া ভক্ত তাঁহার সমগ্র মানসবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা প্রভৃতিতে এই প্রকারে তন্ময় হওয়া ও মত্ত হওয়া সহজেই হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি ভক্ত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে সাধনার এমন সুগম ও সুন্দর পথ আর নাই। তাহার পর এই সাধনায় আগে ভগবান্‌কে জানিয়া লইয়া শ্রবণাদি সাধনভক্তির কার্য্য আরম্ভ হইল। ভগবান্‌কে মানিয়া লইলে, অহঙ্কার তৎক্ষণাৎ অপগত হইল, বিশ্ব-কল্যাণের মধ্যেই আপনার প্রকৃত কল্যাণ দেখিতে পাওয়া গেল, সিদ্ধি, ভুক্তি বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিল না, একমাত্র বাসুদেব-পরিতোষণই লক্ষ্য হইয়া পড়িল। তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনা হইতেই উপস্থিত। ভক্ত সাধুগণ আমাদের দুর্ব্বল ও সমাজ-বিপ্লবে জর্জ্জরীভূত, অথচ তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য জীববৃন্দের জন্য এই যে অহেতুকী ভক্তির সাধন পথ, এই যে প্রেমের ধর্ম্ম দিয়াছেন, ইহাই আমাদের একমাত্র কল্যাণের উপায়। এই ভক্তিপথ অগ্রে স্বীকার করিয়া বর্ণাশ্রমাচার পালন করাই ভাল, তবে যদি দুই তাল রাখিতে কেহ না পারে, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া আজকালকার-দিনে এই অহেতুকী ভক্তির সাধনা করাই নিরাপদ, ইহাই যেন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

সাধু সঙ্গে এই পথ গ্রহণ করিতে পারিলে, ইহাই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ পথ। ভক্তিপথ স্বীকার করিয়া বর্ণাশ্রম পালন করিতে হয়—যদি দুইটি না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া ভক্তিপথ গ্রহণ করুন, ভক্তি ছাড়িয়া বর্ণাশ্রম গ্রহণ করিলে কিছুই হইবে না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোক অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষক যদ্যপি রাজভক্ত হয়, তাহা হইলে ভূমিকর্ষণ করিয়া লাভবান হইতে পারে, নতুবা সে পরিশ্রম করিয়া ভূমিকর্ষণ করিল, বীজ বপন করিল, জল সিঞ্চন করিল, শস্যও হয়ত হইল, কিন্তু রাজা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া ক্ষেত্র অপরকে প্রদান করিলেন; সুতরাং কৃষিতে প্রীতি রাজপ্রীতি উৎপাদন করে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন,—"তথৈব হরৌ ভক্তিং বিনা

প্রবৃত্তনিবৃত্তধর্ম্মফলয়োঃ স্বর্গাদিজ্ঞানয়োরলাভাৎ শ্রমঃ।” “যথা চ কৃষৌ প্রীত্যানুরোধাদেব নৃপে প্রীতিঃ নতু বস্তুত স্তথৈব ধর্ম্মে প্রীত্যনুরোধাদেব তৎকথাসু প্রীতির্নতু বস্তুত ইতি বিবেচনীয়ং।” এই উক্তির দ্বারা বর্ণাশ্রমাচারের সহিত পরাভক্তির যে সাধন তাহার সমন্বয় করা হইয়াছে। ধর্ম্মে আমাদের প্রীতি আছে, কারণ ধর্ম্মের দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় হয়। কৃষিতে কৃষকের প্রীতি আছে, কারণ কৃষির দ্বারাই তাহার জীবিকার্জ্জন হয়। হরিকথায় যে রতি তাহা প্রথমাবস্থায় এই ধর্ম্মে প্রীতির অনুরোধেই হয়। এই প্রকারে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে রতির কথা বলিলেন, তাহা ঔপাধিকী, তাত্ত্বিকী নহে। যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা জানেন যে হরি-কথায় রতি ব্যতিরেকে ধর্ম্ম বিফল, এই জন্য হরি-কথায় রতি করেন। যাঁহারা অবিবেকী, তাঁহারা ইহা না জানায়, তাঁহাদের স্বধর্ম্মাচরণ ভস্মে ঘৃতাহুতিমাত্র হয়।

বর্ণাশ্রমাচার ও পরাভক্তির সাধন এই উভয়কে একত্রে গ্রহণই ঠিক পথ।

পূর্ব্বের তত্ত্বটুকু আর এক ভাবে বুঝিতে পারা যায়। “স্বধর্ম্ম” বলিতে কি বুঝায়? জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ স্বীকার না করিলে স্বধর্ম্ম বলিয়া একটা কথাই থাকে না। জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কর্ম্মের বিধান ক্রমে জীবমাত্রেই ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে অস্ফুট সচ্চিদানন্দ জীব প্রোথিত হইয়া ক্রমে প্রস্ফুট হইতেছে। আমাদের অতীত ইতিহাস বা পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসমষ্টি আমাদিগকে ক্রমবিকাশের একটা নির্দ্দিষ্ট সোপানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। যে কার্য্য সাধন করিলে, আমি এক্ষণে যে সোপানে আছি, ঠিক তাহার পরের সোপানে যাইতে পারিব, তাহাই আমার স্বধর্ম্ম। সুতরাং ‘স্বধর্ম্ম’-পালন, মানবের ক্রমবিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও নিরাপদ পথ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কে আমায় বলিয়া দিতে পারে, ইহাই আমার স্বধর্ম্ম।

“স্বধর্ম্ম” কথার অর্থ।

জন্মান্তরের নিয়মে কর্ম্মের বিধানে স্বধর্ম্ম নির্ণীত হয়।

“স্বধর্ম্ম” পালন সুগম ও নিরাপদ পথ।

এখন সমাজ বিপর্য্যস্ত, কাজেই স্বধর্ম্ম নিরূপণ বড়ই কঠিন ব্যাপার।

বর্ত্তমান সময়ে যে বর্ণবিভাগ রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে সকলেই একরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। সমাজ যাহাকে ব্রাহ্মণ বলে তাহার মধ্যেও অনেক শূদ্র আছে, আবার সমাজ যাহাকে শূদ্র বলে, তাহার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ আছে। ইহা ছাড়া বর্ণসঙ্করের তো কথা নাই। সুতরাং পূর্ব্বে যে বিভাগ শিশু মানবাত্মার পক্ষে অশেষরূপে হিতকর ছিল, এখন অনেক স্থলেই তাহা সার্থকতাহীন ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই পদ্ধতি একেবারে চূর্ণই বা করা যায় কিরূপে? ইহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই ভাল হইবে, এ প্রকারের কোন পদ্ধতি না পাইলে এ পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া ফেলাও যায় না। ভাঙ্গিতে গিয়া অনেক সময়ে দেখা যাইতেছে, ভাল তো হইল না বরং আরও খারাপ হইয়া গেল। বর্ণবিভাগ ভাঙ্গিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখা গেল জন্মগত আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে ধনগত আভিজাত্য আসিয়া সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। যাহা ছিল তাহাই যেন ভাল ছিল। ইহাই তো অবস্থা।

পরধর্ম্ম—যাবতীয় স্বধর্ম্মের সফলতা।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের মত সকলে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম, ধর্ম্ম এই দুইভাগে বিভক্ত। আমি ক্রমবিকাশের যে সোপানে দাঁড়াইয়াছি, সেই সোপান হইতে ঠিক পরের সোপানে যাইতে হইলে আমাকে যে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, তাহাই আমার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্ম অহংনিষ্ঠ। এই স্বধর্ম্ম বর্ণে বর্ণে পৃথক। যেমন বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক, যিনি যে শ্রেণীতে পড়েন, তিনি সেই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক আয়ত্ত করিলে পর, পরের শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন; ইহাই স্বধর্ম্ম। শ্রেণী-বিভাগ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এই ব্যবস্থা বেশ ভাল। পরধর্ম্ম শব্দের অর্থ ভাগবত-ধর্ম্ম। শ্রীভগবানকে একমাত্র সত্য জানিয়া কেবল মাত্র তাঁহারই চরণ-পদ্ম পাইবার জন্য যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার নাম পরধর্ম্ম। পরধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম যেন যাবতীয় স্বধর্ম্মের লঘিষ্ঠ সাধারণ

কাহারও বিরোধী নহে।

ভাগবতের পরধর্ম্ম গীতার পরধর্ম্ম নহে।

গুণিতক, (Lowest Common multiple) পরধর্ম্মই ধর্ম্ম-সাধনার চরম অবস্থা, সকল অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণতি ; স্বধর্ম্মের গম্য স্থান পরধর্ম্ম। সমুদ্রমধ্যে রাত্রিকালে নাবিক যদ্যপি পথ হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে ধ্রুবতারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং নিরাপদে গম্যস্থানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ আমরা যখন স্বধর্ম্ম-সঙ্কটে পড়িয়াছি, তখন এই পরধর্ম্মকে আদর্শরূপে পুরোদেশে রক্ষা না করিলে আমাদের আর মঙ্গল নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কলি-যুগ আরম্ভ হইলে পর এই স্বধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হয়। অবশ্য তাহার পূর্ব্ব হইতে এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময়ে তাহা যেন অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে। এই সময়ে ভাগবতশাস্ত্র অন্ধকারময়ী রাত্রির অবসানে সূর্য্যদেবের মত সমুদিত হইলেন। এই ভাগবত-ধর্ম্ম ঠিক সূর্য্যের মত। কিন্তু আমাদের যেন চক্ষু ছিল না, তাই এই সূর্য্যকিরণেও নিজের কর্ত্তব্য পথ অবধারণ করিতে পারি নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আসিয়া আমাদিগকে চক্ষু দিলেন, ভাগবতধর্ম্ম কি তাহা জীবকে শিখাইলেন। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন।

ভাগবতের পরধর্ম্ম ভাগবত ধর্ম্ম।

কুরুক্ষেত্রের পর যে ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইল, তাহাতে রক্ষা করিবার জন্য এই পরধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে।

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত এই ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥"

শ্রীচৈতন্যদেব এই ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুগে আমরা এই ভাগবত ধর্ম্মের ফলিত অবস্থা দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেরও প্রকৃত মর্ম্ম আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আবার এই ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে, এই পুনরুত্থানের মধ্যেই হিন্দু-সমাজের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে। মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সহিত **বর্ণাশ্রম** ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিলেই ভাগবত ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে।

এখন আবার এই ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে।

এই ধর্ম্মেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমরা যে ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বুঝি, তাঁহারা যে ঠিক সে ভাবে বুঝিতেন না, ইহা নিশ্চয়। আবার ইহাও নিশ্চয় যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ কর্ত্তৃকই যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বুঝিলেই আমরা শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিব, শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিলেই আমরা যুগধর্ম্মের পরিচয় পাইব। এই যুগ-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

ভাগবতধর্ম্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সার্থকতা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাগবত ধর্ম্মের ভিত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে এই যে পরধর্ম্ম, ইহা অত্যন্ত দুরূহ, ইহাতে আমাদের অধিকার নাই। এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা অন্ধ। আমাদের যোগ্যতার দ্বারা অবশ্য আমরা এ অধিকার পাই নাই, তবে স্বয়ং ভগবান অশেষ করুণা করিয়া নিজগুণে আমাদিগকে এ অধিকার দান করিয়া গিয়াছেন। বর্ণা-শ্রমের অবজ্ঞা করিবেন না, এই বর্ণাশ্রমাচার আমাদের পিতা ও মাতা, কিন্তু এই বর্ণাশ্রমের যাহা সার্থকতা, সেই ভাগবত-ধর্ম্মের, সেই প্রেম-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করুন, অচিরেই আমাদের কল্যাণ হইবে।

জীবন-ধারণের লাভ।

আমরা যে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করি না কেন, যত্তপি হরিকথায় রতি না জন্মায় তাহা হইলে সকলই বিফল। এই কথাটির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই দেখা দরকার, হরিকথায় রতি, বলিতে কি বুঝায়? মানব-চিত্ত কি ভাবে ভাবিত হইলে হরিকথায় রতি জন্মায়? সর্ব্বাগ্রে এই দুটি প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। কথার দ্বারাই বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, কথা চিন্তার বা অন্তরের মূর্ত্তি। জগতে অসংখ্য বস্তু, স্থূল ও সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে অসংখ্য প্রকারের সম্বন্ধ বিদ্যমান, কথার দ্বারাই আমরা এই বস্তু ও সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকি। এই যে বস্তু ও সম্বন্ধময় বিশ্ব, ইহা শূন্য হইতে উদ্ভূত নহে, ইহার মূলে ও ইহার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে শ্রীভগবান্ রহিয়াছেন। বিশ্ব একটি লীলা বা খেলা; বিশ্বনাথ লুকাইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি। তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা জড়বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া স্থূল বস্তু সমূহের ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ লইয়াই আলোচনা করি, আর মনস্তত্ব লইয়া চিন্তার সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম রহস্যেরই আলোচনা করি, আর সমাজতত্ত্ববিৎ, বা ঐতিহাসিক হই, আমাদের আলোচনা যতক্ষণ সেই এক আনন্দময় পরম পুরুষের স্বরূপের পরিচয়ে আমাদিগকে লইয়া যাইতে না পারিবে, ততক্ষণ জানিতে হইবে আমরা আমাদের আলোচনার যাহা প্রকৃত উপসংহার, তাহা জানিতে পারি নাই।

'হরিকথায় রতি' এই কথার অর্থ কি? কি প্রকারে তাহা জন্মায়?

বিশ্বলীলায় বিশ্বনাথ লুকাইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে খুঁজিতেছি।

শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা, শ্রবণে ও কীর্ত্তনে মানবের কেবল সেই অবস্থায় রতি হয়, যে অবস্থায় তিনি, সকল বস্তুর, সকল কার্য্যের ও সকল সম্বন্ধের মূলে শ্রীভগবান রহিয়াছেন, এইটুকু বুঝিতে

'সর্ব্বত্র ভগবান্ এই কথা বুঝিলে তাঁহাতে রতি হয়।

পারেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে অবস্থায় মানব বুঝিতে পারেন যে 'প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন, অন্য কোনরূপ চরম লক্ষ্য আছে বলিয়া যে আমরা মনে করি এবং কোন কোন শাস্ত্রকার আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ দেন, তাহা ভুল। শ্রীভগবান্ এই প্রেমের বিষয়, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহেন, এই দুইটি তত্ত্বের সহিত পরিচয় না হইলে "হরি কথায় রতি" যে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

গতবারে যে শ্লোকটি আলোচনা করা গিয়াছে, তাহার পরের তিনটি শ্লোকে এই দুইটি তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা সেই শ্লোক তিনটির আলোচনা করিতেছি—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হিস্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ত্রিবর্গের উপাসনা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

শ্লোক কয়েকটির অর্থ এই। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়-প্রীতি। এই জন্যই লোকে ধর্ম্ম করিয়া থাকে। ধর্ম্ম করিলে ধনী হইব, মানী হইব, অনেক ভোগের বস্তু পাওয়া যাইবে, ভোগের শক্তিও বাড়িয়া যাইবে, বেশ নিরাপদে ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন করা যাইবে।

একটি উপাখ্যান।

ধর্ম্ম-সাধনের এইরূপ আদর্শ বোধ হয় অধিকাংশ লোকের মধ্যে এখনও রহিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস কৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে একটী উপাখ্যান আছে যে একবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ললিতপুর নামক স্থানে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবকে (এই ঘটনা তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে, সুতরাং

নিমাই পণ্ডিতকে বলাই ঠিক।) আশীর্ব্বাদ করিলেন "ধন হোক্ পুত্র হোক্, সংসারে সুখ হোক্।' গৌরাঙ্গদেব বলিলেন, "ঠাকুর একি আশীর্ব্বাদ করিলে, এ ত আশীর্ব্বাদ নয়, এ যে অভিশাপ!" সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া বলিলেন 'বেশ লোকতো তুমি, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, তুমি বলিতেছ এ আশীর্ব্বাদ নয়।'

গৌরাঙ্গদেব বলিলেন, 'আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবানে ভক্তি হউক, আর কিছু প্রয়োজন নাই।'

হরিভক্তি হইলে খাইবে কি, ইহাই সাধারণ মানুষের চিন্তা।

সন্ন্যাসী এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন, 'ভগবানে না হয় ভক্তি হইল, কিন্তু খাইবে কি?'

এই সন্ন্যাসী যাহা বলিয়াছিলেন, সাধারণতঃ আমাদের মনে এই কথাই জাগিয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন, মার্কিণ মুলুকের লোকেরা জীবনে কেবল ভোগ করিতে চায়, ঐশ্বর্য্য ও বিলাস চায়, তাহাদিগকে যদি সেই সব ধর্ম্ম-সাধনার কথা বলা যায়, যাহা দ্বারা ভোগের বস্তু ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বস্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহারা আগ্রহ করিয়া শুনিবে। এই যে অবস্থা অর্থাৎ কেবল কিছু পাইতে চাওয়া'র অবস্থা, ইহা ভাগবত-ধর্ম্মের নিম্নের অবস্থা। অবশ্য ইহার অর্থ এ নয় যে যিনি ভাগবত-ধর্ম্মের উপাসক, ইহজীবনে যাহাকে সুখ ও ভোগ বলে, তাহার কিছুই তাঁহার থাকিবে না, ইহার অর্থ এই যে তিনি এ সকল কিছু চাহেন না; আসিয়া উপস্থিত হইলে ভগবানের কৃপার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু পার্থিব ভোগ-সুখের বাঞ্ছা তাঁহার নাই।

নিম্নস্তরে ধর্ম্ম, কাম সেবার উপায়।

সম্প্রতি দেখিলাম একজন ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি ভাগ্যদোষে চাকুরী বাকুরী জোগাড় করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তিনি বই লিখিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন যে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় ভোগ করিবে অথচ স্বাস্থ্যহানি হইবে না, ইহার সহজ উপায় ও

সাধন আমার নিকট আছে, তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা যায় না, যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহারা আমার নিকট আসিয়া এই সাধন লইতে পারেন। এই কথা প্রচার হওয়ার পর সন্ন্যাসীর অসংখ্য শিষ্য জুটিয়া গিয়াছে এবং তিনিও শিষ্যদের অর্থে নিজের ভোগ-বাসনা, যাহা অন্য উপায়ে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই, তাহা চরিতার্থ করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মের এই পুনরুত্থানের নামে এই সর্ব্বনাশকর ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, শুদ্ধাভক্তির আদর্শ প্রচারব্যতিরেকে, এই ভাগবতধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্যে মানবকে দীক্ষিত করিতে না পারিলে, এই যে ধ্বংসের পথ, যাহা আশ্রয় করিয়া দেশ সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।

প্রেম ছাড়া ধর্ম্ম হয় না। নিজকে বিলাইয়া দেওয়াতেই আনন্দ। এই তত্ত্বটুকু যিনি না বুঝিয়াছেন, তিনি ভাগবত-ধর্ম্মের অধিকারী নহেন, তিনি যুগধর্ম্মের তত্ত্বও অবগত নহেন, অর্থাৎ অপধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বিনাশের দিকে চলিয়াছেন। মস্তকে দীর্ঘ জটা, কৌপীন পরিধান, কাঁটার উপর শুইয়া অথবা ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে তপস্যা করিতেছে, তাহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করা হইল 'বাপু সরল চিত্তে বল দেখি, তোমার এই সাধনা করার লক্ষ্য কি' প্রথমটা বলিতে চাহিল না, শেষে তাহার কেমন সুমতি হইল, সে সত্য কথা বলিল। 'মহাশয়, আমি অতিশয় দরিদ্র, সংসারে খাইতে পরিতে পাইলাম না। অন্যান্য সকলে কেমন পরম সুখে আছে। গুরুদেব বলিলেন 'এই তপস্যা কর, ইহার ফলে হয় এই জন্মে নতুবা পর জন্মে তুমি রাজা হইবে।' আর একজন এইরূপ অবস্থায় বলিয়াছিল 'একজন লোককে সে জব্দ করিতে চায় এই জন্যই তাহার এই তপস্যা।' এই গেল সাধু সন্ন্যাসীর কথা।

এইবার গৃহস্থ লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ঐ একজন দেশ-বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভারি নাম, হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দেশের কত কল্যাণ করিয়াছেন। তিনি হোম করিবেন

চণ্ডীপাঠ করিবেন, দক্ষিণা একশত টাকা লইবেন। এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য কি? আমি আমার প্রতিবাসীর নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছি, এই মোকদ্দমায় যদি জয়লাভ করিতে পারি তাহা হইলে প্রতিবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইবে, আর আমার যে এত কালের জাতক্রোধ তাহারও তৃপ্তি হইবে। ইহাই ধর্ম্ম!!! দেশের অধোগতির জন্য, আমাদের এই সর্ব্বনাশের জন্য কেহই দায়ী নহে, এই অপধর্ম্মই ইহার কারণ।

শত্রু-দমনের উপায় ইহা ধর্ম্ম নহে, ইন্দ্রজাল Magic.

মাথায় জটা বাঁধিয়া বনে বসিয়া কাঁটায় শুইয়া তপস্যা করিয়া রাজা হইতে চেষ্টা না করিয়া, মুটেগিরি করিয়া স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণ করিয়া, সন্ধ্যায় হরিনাম কর, হরিকথা শ্রবণ কর, কাতর প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বল, প্রেমদাতা প্রেম দাও, এই ভোগলালসা, এই দুষ্পূরণীয় কাম ও তাহার জননী অবিদ্যা পিশাচীর হস্ত হইতে রক্ষা কর; সাধ্যমত পরের হিত চেষ্টা কর, প্রকৃত কল্যাণ হইবে, ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম, ইহাই যুগধর্ম্ম। আমাদের প্রকৃত হিত এই সাধনাতেই সিদ্ধ হইবে, অন্য উপায় নাই। এইবার মূল শ্লোক কয়টির অর্থ বিচার করা যাউক।

মোক্ষ পর্য্যন্ত বলিলে ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা যায়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি কথা একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়। আদিতে ধর্ম্ম ও শেষে মোক্ষ, এই মোক্ষের আর একটী নাম অপবর্গ, সুতরাং ধর্ম্মের সহিত অপবর্গের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। অর্থ ও কাম ইহারা লক্ষ্য নহে, একটা বিশেষ কিছু করিবার উপায় মাত্র।

অতএব যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মের ফল অর্থ আর অর্থের ফল কাম, আর কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি অতএব ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাউক, তাঁহারা ভুল কথা বলেন। ইন্দ্রিয়প্রীতিই কি কামের ফল? আমাদের মধ্যে নিজের ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য একটা ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছার নাম কাম। আমাদের মধ্যে কাম আছে, এবং ইন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাও আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-প্রীতিতে কি কামের নিবৃত্তি হইবে? যাঁহারা বিজ্ঞ, সত্যের সহিত

ইন্দ্রিয় প্রীতিই প্রয়োজন নহে।

যাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে তাঁহারা বলিবেন, না ইন্দ্রিয়প্রীতি মাত্রই কামের প্রয়োজন নহে। এই যে কাম, যাহা আমাদের মধ্যে নিত্য-কাল বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে অভাব পূরণের জন্য চেষ্টান্বিত করিতেছে, এই কাম ইন্দ্রিয়-প্রীতির দ্বারা তৃপ্তও হয় না, বরং কেবল ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য চেষ্টান্বিত থাকিলে অভাব আরও বাড়িয়া যায়। অভাব মিটাইবার জন্য চেষ্টা করি, ইন্দ্রিয়ের যাহাতে প্রীতি হয় তাহার প্রচুর আয়োজন করি, কিন্তু অভাব মেটেনা, মনু বলিয়াছেন—

ভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি হয় না, তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥'

কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি হয় না, জ্বলন্ত আগুন নিভাইবার জন্য তাহাতে ঘৃত ঢালিলে যেমন নিভিবার পরিবর্ত্তে ঐ আগুন উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-প্রীতির দ্বারা কাম আরও বাড়িয়া যায়। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই এককথা।

যেমন ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

'বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অথবা আহারাদির অভাবে নিরাহার হয়, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হইয়া বিলীনপ্রায় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়ানুরাগের বা কামপীড়ার অণুমাত্রও ক্ষয় হয় না।

জীবন ধারণে কামের প্রয়োজন আছে।

তাহা হইলে কামের তাৎপর্য্য কি? ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে। ভাগ-বত বলিতেছেন 'লাভো জীবেত যাবতা' শ্রীধর স্বামী টীকায় বলিলেন 'জীবন-পর্য্যাপ্ত-পর্য্যন্ত কাম সেব্য ইত্যর্থঃ' সংক্ষেপে ইহার অর্থ বিচার করা যাইতেছে। আমরা সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চাই, মনের দুঃখে সময়ে সময়ে

বলি বটে, "যম হে আমাকে লইয়া যাও" 'আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই ফণী ধ'রে খাই হলাহল'। কিন্তু যম যদি ডাক শুনিয়া হঠাৎ একদিন মহিষের উপর চড়িয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে আমরা কথামালা'র কাঠুরিয়ার মত যমকে কাঠের বোঝা মাথায় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিব। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই' কেহই মরিতে চায় না। তবে যে কেহ কেহ আত্ম-হত্যা করে সে একটা উন্মাদের অবস্থা। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহার কারণ এই, জীবনে যতই দুঃখ পাইনা কেন, জীবনের মূলে আনন্দ সর্ব্বদাই আছে, গভীর দুঃখের সময়েও সেই আনন্দ উপস্থিত। 'আনন্দেন জাতানি জীবন্তি'। আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই। এখন বাঁচি কি করিয়া? তত্ত্বদর্শী বলিবেন 'কেন, আমি তো আত্মা, আমার তো মরণ নাই।' তত্ত্বদর্শীর কথা সত্য। কিন্তু আমি যখন বলি যে আমি আত্মা তখন কথাটা সত্য হইলেও আমার মিথ্যা কথা বলা হয়। কারণ আমার তো প্রতীতি নাই যে আমি আত্মা। তাহা হইলে আমাকে এখন বাঁচিতে হইলে, এই দেহখানি রাখিতে হইলে কাম চাই। কামনা (Desire) না থাকিলে আমাদের সঙ্গে জড়বস্তুর কোনই প্রভেদ থাকিত না, কামের দ্বারা চালিত হইয়াই আমরা চেষ্টান্বিত, 'আমি আমার, আমাকে বাঁচিতে হইবে' এই চিন্তাই এখন আমাদের চেষ্টান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, এই চেষ্টার দ্বারাতেই আমরা নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বিকাশের পথে যাইতেছি। সুতরাং কাম একটা নিরর্থক ব্যাপার নহে, এই বিশ্ব-লীলায় কামদেবের কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। মদনকে দহন করিলে চলিবে না। তবে ক্রমে ক্রমে মদনকে মোহন করা যায় কিরূপে তাহারই চেষ্টা করা যাইবে। সাধনার সনাতন আদর্শ মদন-দহন নহে, মদন মোহন, এ কথা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব।

জীবনের মূলে আনন্দ আছে, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই।

মদন-দহন নহে, মদনমোহন প্রয়োজন।

তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল জীবন ধারণের জন্য যতটুকু

দরকার, ততটুকু কামের সার্থকতা এবং যথার্থ ভাবে জীবন ধারণ হইতেছে কি না, তাহা আলোচনা করিয়া কামদেবের পূজা করিতে হয়। সহজ কথা এই যে যেটুকু শরীর রক্ষার জন্য দরকার সেই-টুকু খাইবে, কেবল কামের বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অমিত ভোজন করিবে না, কারণ তাহা হইলে জীবনী-শক্তির বিকাশ না হইয়া ফল তাহার বিপরীত হইবে। এই প্রকারে সকল জায়গাতেই কামের সেবা করিতে হইবে।

কামের লাভ জীবন ধারণ, জীবন ধারণের লাভ স্বর্গ নহে।

এইবার প্রশ্ন হইতেছে যে কামের ফল জীবন ধারণ, এখন জীবন ধারণের ফল কি? একদল লোক সেই আগের কথা বলি-লেন। ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গাদিলোক পাওয়া যায়, সেই লোক পাওয়া কামের ফল। ভাগবত বলিতেছেন, না, তাহা নহে। জীবন ধারণের ফল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।

তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা কি, তাহা আমরা পরে দেখিব। শ্রীমদ্ভাগবত অন্যস্থানে এই জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলে পরবর্ত্তী শ্লোকের যাহা প্রতিপাদ্য তাহার বেশ সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে।

জীবনের লাভ বা উদ্দেশ্য বিষয়ক শ্লোক।

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রা: কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কি গ্রামে পশবোঽপরে॥
শ্ববিড়্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপাথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
বিলেবতোরুক্রমবিক্রোমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটেনরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্ট কিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্ল্লসৎকাঞ্চন কঙ্কণৌবা
বর্হায়িতেতে নয়নেনারাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ণ নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদগন্ধং॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রেজলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কঃ, ৩য়, অ।

এই শ্লোকগুলির অর্থ এই। আমরা যে এই জগতে আছি, ইহার উদ্দেশ্য কি? কেহ বলিবেন খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য। শাস্ত্র বলিতেছেন শুধু বাঁচিয়া থাকা, সে তো গাছেরাও থাকে। কিন্তু আমরা যে নিশ্বাস ফেলি? শাস্ত্র বলিতে-ছেন ভস্ত্রার মধ্যেও তো নিশ্বাসের মত বায়ু যাতায়াত করে। কেহ বলিবেন, আমরা আহার করি সন্তান উৎপাদনাদি করি। শাস্ত্র বলিতেছেন পশুগণও তাহা করে। তাহা হইলে আমরা যে মানুষ হইয়াছি, আমাদের বিশিষ্টতা কি? অচেতন পদার্থ, উদ্ভিদ ও পশু হইতে আমরা পৃথক কিসে?

এক মানুষে চারিটি পশুর ধর্ম্ম।

শাস্ত্র বলিতেছেন—কৃষ্ণনাম যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, সে মানব একাই চারিটি গর্হণীয় পশুর কার্য্য সাধন করে। এই চারিটী পশু কি কি? কুকুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ। একা মানুষ চারিটি পশুর ধর্ম্মপালন করে বলিয়া পশুগণ সেই মানুষপশুর স্তব করে। পশুগণ এই কথা বলে যে আমরা পশু, কিন্তু একজন অপরের ধর্ম্ম লইতে পারি না। আর আমরা স্বধর্ম্মে অবস্থিত। কিন্তু এই যে মানুষ, এ ব্যক্তি ইহার স্বধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া নরক হইবে তাহা জানিয়াও আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে আর অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই সে পরমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, বিধির শাসনে নহে।

পরন্তু অনুরাগের দ্বারা আমাদের চারিজনের ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে। কুকুরের ধর্ম্ম অকারণ রুষ্ট হওয়া, শূকরের ধর্ম্ম অমেধ্য ভোজন, উষ্ট্রের ধর্ম্ম কণ্টকের ন্যায় দুঃখপূর্ণ বিষয়াসক্তি, আর গর্দ্দভের ধর্ম্ম ভারবহন। তাহা হইলে শাস্ত্রকার বলিতেছেন,

শ্রীভগবানের কথা শ্রবণে যদ্যপি রতি না হয়, তাহা হইলে মানুষ পশু অপেক্ষাও হীন। ভগবৎ-কথায় রতিই মানব জীবনের লক্ষ্য। নিখিল বিশ্বব্যাপারে, এই পরিবর্ত্তনপ্রবাহের মূলে আনন্দময় পরমপুরুষ তাঁহার স্বরূপের মধুর লীলায় মত্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই লীলাময়কে একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া আশ্রয় করিতে হইবে, ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে এই কথাই বলা হইল।

ভগবান্‌কে আপনার বলিয়া আশ্রয় করিতে হইবে, স্বভাবের প্রেরণায়, ঐকান্তিক অনুরাগে।

এই যে ভগবানকে পাওয়া বা একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া, কেবল শাস্ত্রের উপদেশে নহে বা কোনরূপ স্বার্থ-বুদ্ধির প্রেরণায় নহে, স্বভাবের প্রেরণায়, ঐকান্তিক অনুরাগে যে আশ্রয় করা, তাহা যে কেবল মাত্র একটা চিন্তা বা কল্পনা তাহা নহে, ভগবানকে আমাদের সমগ্র সত্ত্বা দিয়া আপনার করিতে হইবে। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সমস্তই তাঁহার; আলোচ্য শ্লোকে তাঁহার নাম শ্রবণই কর্ণের সার্থকতা, এইটুকু উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন।

যে মানব শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে, তাহার দুইটি কর্ণরন্ধ্র বৃথা ছিদ্রমাত্র, আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্ট জিহ্বা ভেকজিহ্বার তুল্য। কর্ণরন্ধ্র দুইটীকে গর্ত্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে গ্রাম্যবার্ত্তারূপ যে সর্প তাহা তথায় বসতি করে।

যে মস্তক মুকুন্দ চরণারবিন্দে প্রণত না হয়, তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র; আর যে দুই হস্ত হরির সপর্য্যা না করে তাহা কাঞ্চন ও কঙ্কনে দেদীপ্যমান হইলেও সেই দুই হস্ত মৃত ব্যক্তির হস্ত তুল্য। কিরীট ও উষ্ণীষ শোভিত মস্তককে ভার বলার তাৎপর্য্য এই, যে জলে ডুবিয়া যাইবার সময় যদ্যপি মস্তকে কোনও গুরুভার দ্রব্য থাকে, তাহা হইলে আর নিস্তারের উপায় থাকে না, সেইরূপ উষ্ণীষ ও কিরীটে মস্তক শোভিত থাকিলে অর্থাৎ জগতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও যদি

বিশেষভাবে ভগবদুপাসনা না করা যায়, তাহা হইলে সংসার সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা খুব অধিক। হস্ত দুইটীকে মৃতব্যক্তির হস্ত বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে হস্ত দুইটী অপবিত্র, দৈব ও পৈত্র কার্য্য তাহার দ্বারা হয় না।

'যাহাদের চক্ষু দুইটি ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন না করে, তাহা ময়ুর-পুচ্ছের সদৃশ, বস্তুতঃ তাহার কোন কার্য্যকারিতা নাই, আর যে দুই পদ হরিক্ষেত্রে গমন না করে, সেই দুই পদ বৃক্ষের মত।' চক্ষুকে ময়ুর-পুচ্ছের তুল্য বলার প্রয়োজন এই যে ইহা আত্মার উদ্ধার সাধন করেনা, কেবলমাত্র সংসার কণ্টকক্ষেত্রে পতিত হয়। চরণ দুইটী বৃক্ষের মত অর্থাৎ যমদূতগণ কুঠারের দ্বারা তাহা চ্ছেদন করিবে।

'হে সূত যে মনুষ্য কখন ভগদ্ভক্তের চরণরেণু ধারণ না করে, সে ব্যক্তি জীবঞ্ছব অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মৃত, আর যে শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্না তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয়, সে নিশ্বাস সত্ত্বেও মৃত-শরীর সদৃশ।'

মানব এই প্রকারে ভগবানকে অনুভব ও আস্বাদন করিয়া বাহ্য অঙ্গ সমূহের সার্থকতা সাধন করিবে। কিন্তু কেবল তাহা হইলেই হইবে না, অন্তর অঙ্গ সমূহেরও ভগবদুপাসনদ্বারা সার্থকতা সাধন করিতে হইবে। হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে লোমাঞ্চ না হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে এই এক অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেকোন স্থানের উপদেশ আলোচনা করিলেই ভাগবত-ধর্ম্মের যাহা আদর্শ তাহা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। জীবনে ধর্ম্ম যখন প্রতিষ্ঠা ও বিকাশলাভ করে, সেই সময়ে জীবন কিরূপ হয়, তাহা পূর্ব্বের শ্লোকগুলি হইতে একরূপ বুঝা যাইতেছে। ধর্ম্মজীবনের একটা আদর্শ আছে তাহা এইরূপ শিক্ষা দেয় যে আমাদের এই দেহ ও ইন্দ্রিয় পরমার্থের বিরোধী অর্থাৎ ইহারা

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বত্রই এই আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে।

আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিঘ্ন-স্বরূপ। ভাগবত-ধর্ম্ম তাহা বলেন না। ভাগবত-ধর্ম্মে অবশ্য দেহসুখ বা ইন্দ্রিয়সুখ উদ্দেশ্য-রূপে উপবিষ্ট হয় নাই, ভাগবত-ধর্ম্মে এই কথা বলা হয় যে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন আমরা আমাদের ছোট আমিটিকে আশ্রয় করি, তখনই দুঃখ পাই, কিন্তু এই দেহ ও ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম করিতে হইবে না, তাহাদের দ্বারা ভগবানের উপাসনা বা সেবা করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত কথা।

তত্ত্বের ত্রিবিধ পরিচয়।

আমরা সচরাচর লোককে বলিতে শুনি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, তাহা হইলে স্বর্গে যাইবে, মৃত্যুর পর সুরলোকে পরম সুখে কাল কাটাইবে, আর যদি তাহা না কর তাহা হইলে নরককুণ্ডের মধ্যে ভীষণ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ইহা সত্য কথা। কিন্তু ধর্ম্ম-জীবনের ইহাই শেষ কথা নহে। যে শাস্ত্র বা যে ধর্ম্ম, মানবকে এই প্রকারে স্বর্গসুখের লালসায় প্রলুব্ধ করিয়া, অথবা তাহার বিপরীত নরকের ভয়ে আতঙ্কিত করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করায়, সে ধর্ম্ম উন্নত শ্রেণীর মানবের ধর্ম্ম নহে, সে ধর্ম্মের হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহা নিম্নাধিকারীর জন্য।

ভয়ের ধর্ম্ম বা লোভের ধর্ম্ম, উন্নত নহে।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য দার্শনিকের মনীষা যখন হইতে সূক্ষ্ম বিচার আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়েই পূর্ব্বের সত্যটুকু জ্ঞানবান্ লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমরা সাংখ্য-দর্শনেই ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। স্বর্গসুখ যে জ্ঞানবান্ মানবের ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহা সাংখ্যদর্শনে এবং ভগবদ্-গীতায় বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সাংখ্যকার ও গীতাকারের এই সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণ করিয়াছেন। গতবারে আমরা যে তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি তাহার দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিলেন "**জীবস্য জীবনস্য চ পুনঃ কর্ম্ম-ভির্ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ সোঽর্থো ন ভবতি কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞা-সৈব।**"

তত্ত্বজ্ঞানই প্রয়োজন।

অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ব।

অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদ্দেশ্য বা ফল, স্বর্গাদি নহে। ইহাই বেদান্ত-শাস্ত্রের কথা। বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই জীবনের ফল। শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইতেছেন, এই যে ব্রহ্ম ইনি তত্ত্বেরই একটি নাম মাত্র। তত্ত্ববিদেরা এই তত্ত্বকে

এই তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ

১। ব্রহ্ম।
২। পরমাত্মা।
৩। ভগবান্।

অদ্বয় জ্ঞান বলেন, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন ভাবে তিন শ্রেণীর সাধক বা উপাসক এই অদ্বয় জ্ঞানকে উপলব্ধি করেন। ঔপনিষদ সম্প্রদায় ইহাকে বলেন ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভেরা বলেন পরমাত্মা, আর সাত্বতগণ বলেন ভগবান্। তত্ত্ব কিন্তু এক, অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে এই যে শ্লোকটি ইহা বড়ই প্রয়োজনীয়। এই শ্লোকটি বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারিলে, আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কিরূপে বেদান্তসিদ্ধান্তের পূর্ণ সমন্বয় করা হইয়াছে। তত্ত্ব যে 'অদ্বয় জ্ঞান' ইহা আমরা দৃঢ়রূপে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব। এইটুকু যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে লীলাতত্ত্ব, বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা মোটেই বুঝিতে পারিব না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও এই কথাটুকু আমাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যথা—

কৃষ্ণ, অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব; ইহা ভুলিয়া গেলে লীলা বোঝা যাইবে না।

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

তাহাতে অনর্থ হইবে।

কৃষ্ণ যে "অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব" ইহা হৃদয় মধ্যে দৃঢ়রূপে ধারণা না করিয়া লীলরস আস্বাদনে চেষ্টান্বিত হইলে যে কিরূপ অনর্থ হয়, তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞেয় জগতের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় জগত আমার জ্ঞানে বিদ্যমান। আমি অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া আমাকেই এই জগতের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, ভোক্তা বলিয়া অনুভব করিতেছি। এই যে দ্বৈত, ইহাই মানব-জ্ঞানের সাধারণ অবস্থা। আমরা জড় চেতনের,

দেবাসুরের, অন্তর বাহিরের, দ্বন্দ্ব বা প্রভেদ সর্ব্বদাই দেখিতেছি ও জানিতেছি, কিন্তু এই উপলব্ধি মানব জ্ঞানের চরম সীমা নহে। চরমে গিয়া মানব এই উভয়কে এক একত্বের ও সামঞ্জস্যের মধ্যে অনুভব ও উপলব্ধি করে। এই যে দুই, দৃষ্ট ও দ্রষ্টা, জড় ও চেতন, প্রকৃতি ও পুরুষ, রয়ি ও প্রাণ এই দুইকে যখন এক সমন্বয়ে লইয়া গিয়া ইহাদের সেই নিত্য-সম্বন্ধের বা মিলনের বা একত্বের মধ্য দিয়া অনুভব করা যায়, সেই সময়েই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব হৃদয় মধ্যে উপলব্ধ হইয়া থাকেন।

দ্বন্দ্বাতীত তত্ত্বই এই অদ্বয়তত্ত্ব।

মনে করুন, বৃন্দাবনে লীলা হইতেছে, এই লীলার যে মধুর বর্ণনা তাহা শ্রবণ করিতেছি। এখন প্রশ্ন এই, আমাদের দৃষ্ট এই প্রাকৃত জগত ও শ্রীভগবানের প্রেমলীলাস্থান আনন্দের বৃন্দাবন, এই দুইটি কি এক প্রকারের জিনিস? তাহা যদি মনে করি, তাহা হইলে তো সর্ব্বনাশ। তাহা হইলে তো আর বৃন্দাবনের চিন্ময়ত্ব থাকে না। বৃন্দাবন "প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ।" বৃন্দাবনের দ্রষ্টা কে? ভক্ত। ভক্ত কে? যিনি শ্রীভগবানের হইয়াছেন। ভক্ত আছেন, তিনি দেখেন, তিনি শোনেন, তিনি গান করেন, তিনি নৃত্য করেন, তিনি শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, নাম, লীলা প্রভৃতি স্মরণে ও কীর্ত্তনে সর্ব্বদা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নয়নসলিলে ভাসিয়া যান, কিন্তু এই যে তাহার ক্রিয়া, এই ক্রিয়ার মূলে "অহং কর্ত্তা, অহং দ্রষ্টা" এই প্রকারের অভিমান নাই। ভক্তি তো অহং-অভিমান সম্পন্ন কোন জীবের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, ভক্তি ভগবানেরই স্বরূপশক্তি। অতএব ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপ। ভক্ত ও ভগবান ভিন্ন হইয়া অভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দেখা গেল ভগবানের লীলার দ্রষ্টা (অভেদের দিক হইতে দেখিলে) ভগবানই নিজে। আমি যখন তাঁহার, আমার নহি, সেই অবস্থাতেই আমি লীলা-রস আস্বাদন করিতে পারি। আমি যখন আমার, তখন আমার

বৃন্দাবন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে—তাহা স্বপ্রকাশ।

ভক্তি ভগবানের স্বরূপ শক্তি, সুতরাং ভক্তের অহং-অভিমান নাই।

ভক্ত ও ভগবান, ভিন্ন ও অভিন্ন।

লীলারস আস্বাদনের অধিকার নাই। ব্রজদেবীগণেরও যখন মনে সৌভাগ্যগর্ব্ব জাগিল যে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। ইহাই লীলার রহস্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদী গৌড়ীয় আচার্য্যগণই এই লীলাতত্ত্বের শেষ রহস্য জগতে প্রচার করিয়াছেন।

ক্ষণিক জ্ঞানবাদ নাস্তিকতা।

শ্রীধরস্বামী পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় "অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব" বুঝাইবার জন্য বলিলেন "ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যবর্ত্তি" অর্থাৎ ক্ষণিক জ্ঞানবাদ নিরস্ত করিলেন। সাংখ্যকার ইহা করিয়াছেন। "ক্ষণিক জ্ঞানবাদ" নাস্তিক মত। বর্ত্তমান ইউরোপে জনষ্টুয়ার্ট মিল, এই মতের প্রচারক। ইংরাজীতে ইহাকে sensationism বলে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে এই মত বিশেষ ভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহারা কি বলেন?

তাঁহারা বলেন যে আত্মা নামে স্থির বা নিত্য কোন সত্বা নাই। তাঁহাদের মতে "স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্।" সকল কার্য্যই অস্থির বা অনিত্য—আত্মাও এক প্রকার কার্য্য। আত্মা দীপশিখার মত। তৈল ও বর্ত্তিকার সহিত অন্য দীপশিখা যোগ করিলে আর একটি দীপশিখার আবির্ভাব হয়। সাধারণ লোকে মনে করে যে দীপশিখা স্থির ও একটি অখণ্ড পদার্থ। কিন্তু তাহা নহে। প্রত্যেক ক্ষণে উহা নূতন হইতেছে। যেমন একটা গোল চাকায় (আলাত-চক্র) একটা আলো এক জায়গায় রাখিয়া যদি তাহা অত্যন্ত বেগে ঘুরান যায় তাহা হইলে মনে হয় সমস্ত চক্রই আলোক, সেই প্রকার দীপশিখার অতিদ্রুত ধারাবাহিকতা বশতঃ আমাদের মনে হয় যে উহা একটি অখণ্ড বস্তু।

আত্মাও এই প্রকার। শুক্রশোণিতে এক আত্মার যোগে অন্য আত্মার উদ্ভব হয়, জ্ঞান-প্রবাহের অতিদ্রূত ধারাবাহিকতা নিবন্ধন মনে হয় উহা এক অখণ্ড বস্তু।

নাস্তিকদিগের এই মতের নামই ক্ষণিক জ্ঞানবাদ, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী তাহার উল্লেখ করিলেন।

সাংখ্য-মত এই মতকে কি ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহারও একটু আলোচনা করা দরকার, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতেও কয়েক স্থানে সাংখ্যগণের এইসকল যুক্তি অনুসৃত হইয়াছে।

সাংখ্য এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

সাংখ্যগণের প্রথম আপত্তি প্রত্যভিজ্ঞা। "ন প্রত্যভিজ্ঞা বাধাৎ।" সকল কার্য্যই যে ক্ষণিক ও অস্থির তাহা নহে। কারণ তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, এখন আবার তাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি এরূপ মনে হয় কেন? ইংরাজীতে ইহাকে বলে Identification by Memory,

সাংখ্য দর্শনের তিনটি আপত্তি।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে নাস্তিকেরা যে উদাহরণ দিলেন সে উদাহরণই ঠিক নহে "দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ" দীপশিখা অন্য দীপশিখা হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা কার্য্য (caused) কিন্তু আত্মাও যে কার্য্য তাহা তোমার কেবল কথায় স্বীকার করিব কেন? ইংরাজীতে বলা যায় যে আত্মা তো causa sui হইতে পারে।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, সকল বস্তুর ক্ষণিকত্ব মানিলে কার্য্য-কারণ ভাবই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। "যুগপজ্জায়মানয়োঃ ন কার্য্যকারণ ভাবঃ" দুটি জিনিস যদি এক সঙ্গে জন্মায় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব থাকিতে পারে না। কারণকে কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী হওয়া চাই। যদি বস্তুমাত্রেই ক্ষণধ্বংসী হয়, তাহা হইলে প্রাকৃক্ষণবর্ত্তী যে কারণ, তাহা যেমন ধ্বংস হইল অমনি পরক্ষণবর্ত্তী যে কার্য্য কাহারও ধ্বংশ হইল। "পূর্ব্বাপায়ে উত্তরযোগাৎ।" সুতরাং বস্তুর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে কারণেরও অস্তিত্ব থাকে না, কারণের অস্তিত্ব না থাকিলে কার্য্যেরও তাহাই হইবে, অর্থাৎ তাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না। "তদভাবে তদযোগাৎ উভয়-ব্যভিচারাদপি।" সুতরাং কারণের একটা সম্ভাব আছে অর্থাৎ উহা ক্ষণিক নহে। তবে যদি কেহ বলেন "নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তীতা"ই কারণ (দার্শনিক Hume একালে এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন, মার্টিনো তাহা খণ্ডন করিয়াছেন) কিন্তু ইহা স্বীকার

করিলে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণের মধ্যে প্রভেদের কোন নিয়ম থাকে না। "পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ" আর তাহা হইলে অভাবই যে সকল কার্য্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ প্রত্যেক কার্য্যেরই পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা তাহার অভাব। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে শূন্যবাদ, অভাব-বাদ, প্রারম্ভ-বাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদ প্রভৃতি মত প্রায়ই অনুরূপ।

নাস্তিকেরা বলিলেন আমরা বিজ্ঞান-বাহ্য অর্থাৎ বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কিছুর সত্তা স্বীকার করি না, ইহার উত্তরে সাংখ্য আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে "ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ।" বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্তুর "প্রতীতি" যে সকলের হইতেছে। যদি বল 'প্রতীতি' মানিনা। তাহা হইলে বিজ্ঞানও মানিতে পার না। অথবা বিজ্ঞান মানিতে গিয়াই যে প্রতীতি মানিতেছ। "প্রতীতির্হি বিষয়সাধিকা।" প্রতীতিই যে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-বাহ্য সকল বিষয়েরই সাধিকা। অতএব সাংখ্য বলিলেন যে যাহারা বলে "শূন্যং তত্ত্বং" তাঁহারা অজ্ঞান। "অপবাদ মাত্রমবুদ্ধানাং" মূঢ় লোকের ইহা অসার কথা মাত্র। ইহার কোন সার্থকতা নাই।

"উভয়পক্ষ সমানক্ষেমত্বাদয়মপি"

বস্তুমাত্রেই ক্ষণিক, বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই এই দুইটি মতই প্রত্যভিজ্ঞান ও প্রতীতির দ্বারা যেমন খণ্ডন হয়, শূন্যবাদও তেমনি খণ্ডন হয়। "অপুরুষার্থমুভয়থা" সংসারশূন্য বলিলে দুঃখ নিবৃত্তিও হইবে না, দুঃখনিবৃত্তির কোন উপায়ও হইবে না।

সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের সমন্বয়ের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে হইলে এই উভয় দর্শনের সিদ্ধান্তগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ তিনটি পৃথক্ বস্তু নহেন—একই পরমতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ বা উপলব্ধি মাত্র। সকল সম্প্রদায়ের সাধক বা দার্শনিকগণ এই তিনটি প্রকাশ যে একরূপে ব্যাখ্যা করেন, তাহা নহে। ভাগবত-সম্প্রদায়ের যাহা মত, আমরা এস্থলে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

প্রথম চিন্তা, যাহা মানবের মনে উদয় হয় তাহা এই যে, তিনটি তত্ত্ব আছে। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ।

জগৎ-তত্ত্ব,—ব্রহ্ম,—জ্ঞান।

ভাগবত-শাস্ত্রের অভিপ্রায় ধীরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে যাঁহারা জগৎ-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া একত্বের দিকে অগ্রসর হয়েন, তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হয়েন; যাঁহারা জীবতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব আশ্রয় কবিয়া অগ্রসর হয়েন তাঁহারা পরমাত্মতত্ত্বে, আর যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্ব বা বিষয় ও আত্মতত্ত্ব এই উভয়ের যাহা সম্বন্ধ বা মিলন, তাহা আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়েন, তাঁহারা ভগবত্তত্ত্বে উপস্থিত হয়েন। প্রথমটি জ্ঞানের পথ, দ্বিতীয়টি যোগের পথ, আর তৃতীয়টি ভক্তির পথ। লক্ষ্য সকলেরই এক,—অদ্বয়জ্ঞান। কেবলমাত্র আলোচনার আরম্ভে যেটিকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করা যায়, সেইটির জন্য চরমতত্ত্ব পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়েন। জগতে তিন রকম মানুষ আছে, কাহারও নিকট আপনা হইতেই জগৎতত্ত্ব মুখ্যরূপে প্রতীত হয়, তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বে নিবিষ্ট করা মানবের আয়ত্তাধীন নহে। আবার কেহ আত্মতত্ত্বকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম-আলোচনায় অগ্রসর হন। ভাগবত-ধর্ম্মে অধিকার শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে হয় না, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে জগতে এমন একদল লোক আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ের ও মনের স্বাভাবিক গঠনই এইরূপ, যে তাঁহারা প্রথম হইতেই আত্মা ও জগৎ বা অন্তর ও বাহির এতদুভয়ের সমন্বয়-রূপে যে তত্ত্ব রহিয়াছেন, সেই তত্ত্বেই তাঁহাদের চিত্ত নিবিষ্ট হয়। সেই তত্ত্বের ভূমিতে যতক্ষণ আরোহণ করা না যায়, ততক্ষণ তাঁহাদের হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। ভগবদ্গীতায় যে, ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম,

আত্মতত্ত্ব,—পরমাত্মা, যোগ।

ঈশ্বরতত্ত্ব,—ভগবান্, ভক্তি।

এই ভেদ স্বাভাবিক।

এই তিন পুরুষের প্রসঙ্গ দেখা যায়, তাহাও মূলতঃ ইহাই। পুরুষ এক, কিন্তু উপলব্ধি তিনরূপ। তত্ত্বগত প্রভেদ কি তাহা আচার্য্য শঙ্কর ও আচার্য্য রামানুজের মধ্যে যে মতভেদ, তাহার দু একটি কথার আলোচনার দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ প্রতিষিদ্ধ করিয়া নির্ব্বিশেষ শুদ্ধাদ্বৈত ভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ ভেদ এইরূপ। গাছের পাতা, ফুল আর ফল, ইহাদের যে ভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। এক গাছ হইতে অন্য গাছের যে ভেদ তাহার নাম সজাতীয় ভেদ, আর ভিন্ন জাতীয় বস্তু, যেমন প্রস্তরাদি হইতে যে ভেদ তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ।

শঙ্কর ও রামানুজ।

সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ।

"বৃক্ষস্য স্বগতোভেদঃ পত্রপুষ্প ফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥"

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মে এই ত্রিবিধ ভেদই নাই; আচার্য্য রামানুজ বলেন ব্রহ্মের সজাতীয় অপর ব্রহ্ম নাই, অত্যন্ত বিজাতীয়ও কোন পদার্থ নাই, কিন্তু তিনি স্বগতভেদ-বিনিৰ্ম্মুক্ত নহেন। গাছের ডাল, পালা, ফুল, ফল ইহারা পৃথক্, কিন্তু অবয়বী যে বৃক্ষ তাহা এক, ডাল পালা প্রভৃতি বৃক্ষের শরীর, শরীরের দ্বারা শরীরির ভেদ হয় না, তাহার অদ্বৈতত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে এই অদ্বৈতত্ব বিশুদ্ধ নহে, বিশিষ্ট। "তদানীং সূক্ষ্ম চিদাচিদ-বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বেন বিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধং।" অর্থাৎ শরীর দ্বারা শরীরির যেমন ভেদ সিদ্ধ হয় না, তেমনই শরীরস্থানীয় চেতনাচেতনাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ দ্বারাও তাঁহার অদ্বৈতত্বের হানি হয় না।

পরতত্ত্বের উপাসনাভেদে এই যে ত্রিবিধ প্রকাশ, ইহার বিশেষ-রূপ আলোচনা আবশ্যক। এই আলোচনায় আমরা একটি সুগম পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারি। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় এই সুগম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা

ভগবদ্ধামাদি জ্ঞানীর মতে মায়িক।

তাঁহারই মন্তব্য অত্যন্ত সরলভাবে বিবৃত করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতাদিশাস্ত্রে শ্রীভগবানের ধাম, আকৃতি, গুণ, বিভূতি প্রভৃতির কথা আছে, এখন প্রশ্ন এই যে শ্রীভগবানের কি সত্যই এ সমস্ত আছে? জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক বলিবেন, এ সমস্ত মায়িকগুণের খেলা, অথবা কল্পনা। "তন্মতে জ্ঞানং নিরাকারং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিবিভাগশূন্যং চিৎসামান্যং চিদ্বিশেষাণাং ভগবদ্ধামাদীনাং তদনন্যত্বমননাৎ। জীবমায়য়োস্ত শক্তিত্বেন তদৈক্যাদিদংকারাস্পদস্য কার্য্যস্য বিশ্বস্য কারণমাত্রাত্মকত্বাদদ্বৈতং।" জ্ঞান নিরাকার, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বিভাগ শূন্য, চিৎসামান্য, ভগবদ্ধাম প্রভৃতি যাহা কিছু চিদ্বিশেষ অর্থাৎ সেই চৈতন্য হইতে পৃথক হইয়াও অপৃথক্ তাহাদের পার্থক্য বা সত্তা স্বীকার করেন না। জীব ও মায়া তাঁহার শক্তি, সুতরাং শক্তিমানের সহিত অভিন্ন, তাহারা ইদং পদবাচ্য এবং কার্য্য, ইহাই বিশ্ব, ইহা কারণমাত্রাত্মক, অর্থাৎ কারণেই তাহাদের সত্তা, তাহা ছাড়া আর পৃথক সত্তা নাই।

যাঁহারা পরমাত্মা রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করেন তাঁহাদের মত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপে বলিতেছেন "এতন্মতে পরমাত্মনশ্চিদেকরূপত্বাজ্ জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি সাক্ষিত্বাদেস্তন্নির্বিশেষস্যাশ্রয়ত্বমপি। দ্যুমণিদীপাদের্জ্যোতীরূপত্বেঽপি জ্যোতিষ্মত্ত্বমিব নানুপপন্নং কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যাদেঃ সাকারত্বঞ্চ মায়ায়াঃ শক্তিত্বান্মায়িকানাঞ্চ তদন্যতা জীবস্য তদ্বিভিন্নাংশত্বাৎ ততো দ্বিতীয়ত্বাভাবাদদ্বয়ত্বম্।" এই মতে পরমাত্মা চিদেকরূপ বা নির্বিশেষ ও জ্ঞানমাত্র। কিন্তু তথাপি তিনি সাক্ষী এবং

যোগমতে পরমাত্মা জ্ঞানের আশ্রয়।

সেই জন্য যাঁহাকে বিশেষজ্ঞান বলে, যেমন পটজ্ঞান, ঘটজ্ঞান প্রভৃতি এ সমুদয় হইতে তিনি স্বতন্ত্র হইলেও একেবারে স্বতন্ত্র নহেন অর্থাৎ এ সকলের তিনি আশ্রয়। যেমন সূর্য্য ও প্রদীপে জ্যোতি আছে, এই যে জ্ঞান, ইহা আমাদের সূর্য্যজ্ঞানের আশ্রয়ে বিহিত হইতেছে, কারণ, জ্যোতি বলিয়া একটি নিত্য পদার্থের জ্ঞান, যাহা মানবমনে বিদ্যমান তাহা সূর্য্যকে দেখিয়াই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সূর্য্যে যেটুকু নিত্যতা আছে, দীপে সে নিত্যতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে কেহ কেহ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাশ আছে, তাহাতে বাসকারী প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন। সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাঁহার ভুজ-চতুষ্টয়ে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিরাজমান, ইত্যাদি যে অন্তর্যামী-ধারণার কথা বলা হইয়াছে, এই অন্তর্যামীর যে সাকারত্ব তাহা মায়ার শক্তি; যাহা মায়ার কার্য্য বা মায়িক, তাহা পরমার্থ নহে অর্থাৎ তাহা আছে বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ তাহা নাই। জীবও তাহারই অর্থাৎ ঐ মায়ারই বিভিন্নাংশ, সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই নাই, অতএব পরমাত্মা অদ্বয় জ্ঞান।

এইবার তৃতীয় তত্ত্ব। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন "তথা ভগবানিতি ভক্তৈর্যদুচ্যতে তজ্‌-জ্ঞানম্। এতন্মতে পূর্ব্ববজ্‌জ্ঞানমাত্রত্বে-ঽপি ভগশব্দবাচ্যষড়ৈশ্বর্য্যস্যাপি। অপ্রাকৃতত্বেন চিন্মাত্রত্বাৎ তদ্রূপত্বং যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
জ্ঞানশক্তি বলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥"

তথৈব দ্বিভুজত্ব চতুর্ভুজত্বাদি-বিবিধ চিদ্ঘনাকারৈর্বহিরন্তর্বর্ত্তিত্বেঽপি। ন চ্যবন্তে চ মদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদীতি স্কান্দাদিবাক্যৈঃ সদৈব সেব্যসেবক-সেবাদিবিভাগেঽপি অদ্বয়ত্বং পূর্ব্বমুক্ত-চ্ছক্তীনাং চিদাদীনাং তদ্বিলাসানাং চ বৈকুণ্ঠাদীনাং তদভিন্নত্ব মননাৎ ততো ভিন্নত্বভাবনৈবাদ্বয়পদেন ব্যস্তা।”

ভক্তেরা যাঁহাকে ভগবান্ বলেন, তিনিও জ্ঞান। তিনি জ্ঞানমাত্র হইলেও তাঁহাতে ষড়ৈশ্বর্য্য আছে। এই ষড়ৈশ্বর্য্য অপ্রাকৃত ও চিন্ময়, সুতরাং জ্ঞানরূপ এবং নিত্য, অর্থাৎ সেই পরতত্ত্বের স্বরূপ হইতে কখনই পৃথক্ নহে। বিষ্ণুপুরাণে এই ছয় ঐশ্বর্য্যের নাম—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। নিত্য অপ্রাকৃত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ অসীমভাবে যাঁহাতে বিরাজমান, তিনিই ভগবৎ-শব্দ বাচ্য দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ আদি বিবিধ চিদ্ঘনাকারে তিনি বাহিরে ও অন্তরে নিত্য বিদ্যমান। স্কন্দপুরাণে আছে, ভগবান্ বলিতেছেন আমার ভক্ত সুমহান্ প্রলয়াপদেও স্থানভ্রষ্ট হন না। সেব্য, সেবক ও সেবার বিভাগ সর্ব্বদাই বিদ্যমান। কেহ বলিতে পারেন তাহা হইলে অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে চিদাদি যে সকল শক্তির কথা বলা হইল, ও বৈকুণ্ঠাদি যে সমস্ত বিলাসের কথা বলা হইল, তাহা তাঁহার স্বরূপ হইতে বিভিন্ন নহে। অদ্বয় এই পদের দ্বারা বুঝাইতেছে যে এ সকলকে কেহ যেন ভগবান্ হইতে পৃথক করিয়া না দেখেন।

ভগবান জ্ঞানস্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্য অপ্রাকৃত ও চিন্ময়।

সেব্য, সেবা ও সেবকের বিভাগ নিত্য।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের টীকার শেষ অংশে বলিতেছেন যে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা ভগবানের যে সামান্য স্বরূপমাত্র, যাহার নাম ব্রহ্ম তাহাতেই অধিকারী, যোগীগণ ব্রহ্ম ও অন্তর্যামী এই দ্বিবিধ ভাবের অধিকারী, আর ভক্তগণ অচিন্ত্য অনন্ত চিদানন্দময় তাঁহার স্বরূপ, গুণলীলা আদি অনেক ভাবের গ্রহণ করেন।

যাঁহারা ভগবানের উপাসক, তাঁহারা মোক্ষ-প্রাপ্তির অধিকারী এমন প্রমাণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসকগণ প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অতএব ভগবত্তত্ত্বই মূল। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, এই কথা গীতাতেও বলা হইয়াছে। গীতায় আছে

ভগবত্তত্ত্বই মূল ইহাতে অন্য দুই তত্ত্ব সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥"

যোগিনামিতি পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণৈর্ব্বাখ্যাতেতি।

ভাগবত-ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে হইলে এই যে তিনটি তত্ত্ব, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—অদ্বয় জ্ঞানের এই ত্রিবিধ প্রকাশ, বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। এই আলোচনার শেষ নাই। এই ত্রিবিধ প্রকাশ কতদিক হইতেই যে আলোচনা করা যায়, তাহা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার তাৎপর্য্য অনুবাদ মাত্র করিয়া দিলাম, এক্ষণে এই তত্ত্বটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

দৃষ্টান্ত

বায়স্কোপের ছবি দেখান হইতেছে। আমরা, শত শত দর্শক মুগ্ধভাবে বসিয়া কতরকমের ছবি দেখিতেছি। হাতি আসিতেছে, ঘোড়া আসিতেছে, রাজা আসিতেছে, যুদ্ধ হইতেছে, কত বিচিত্র ঘটনা ও বস্তুর স্রোত আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা বালক, ছবিগুলিকে সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, অনেকক্ষণ ধরিয়া মুগ্ধ-নেত্রে ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে মনে হইল, এই সব সুন্দর সুন্দর ছবি, ইহাদিগকে কি আয়ত্ত করা যায় না?—এইরূপ মনে করিয়া আমরা উঠিলাম ও ছবিগুলিকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু

ছবি দর্শন।

কামনা ও গ্রহণের চেষ্টা।

ধরিব কি, তাহারা যে ছবি! সত্য বস্তু হইলে ধরিতে পারিতাম। উৎসাহের সীমা নাই, ধরিতে পারি নাই, কিন্তু এইবারে নিশ্চয় পারিব, এইরূপ আশায় মাতোয়ারা হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ছবি ধরিবার জন্য দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এখন ভাবিতেছি কি করি? দলের মধ্যে দু চারিজন লোক যাহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান, তাহারা বলিল দেখ এই যে জিনিসগুলি দেখা যাইতেছে, ইহারা এখানকার জিনিস নহে, আমাদের মনে হইতেছে, ইহারা এখানকার জিনিস, কিন্তু সত্য সত্য তাহা নহে। এই কথা শুনিয়া দুএকজন বুদ্ধিমান ছবি ধরিবার জন্য এই যে ভীষণ পরিশ্রম, এই পরিশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিল এবং তাহার কথা শুনিয়া ভাবিল এ ব্যক্তি সত্য কথাই বলিতেছে। এতক্ষণ উৎসাহের সহিত ছবি ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, একবার ভাবিতেছিলাম ধরিয়াছি, পরমুহূর্ত্তে দেখিতেছিলাম কিছুই ধরিতে পারি নাই! এইরূপে নব নব বিফলতা ও নব নব আশার উন্মাদনায় একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলাম, কোনরূপ সন্দেহ বা চিন্তার ভাব মনে আসে নাই। এখন পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, সত্যইত পিছন দিক হইতে একটা যেন আলোকের ছটা আসিতেছে, সেই ছটা আসিয়া যবনিকার উপর পড়িতেছে; তখন চিন্তার স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইল, চেষ্টাও অন্যমুখী হইল। এখন আমরা ফিরিলাম, এতক্ষণ সম্মুখে কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া ছবি ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, এখন পশ্চাতে ফিরিলাম। ধীরে ধীরে পশ্চাতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্র সিঁড়ি আছে, ভাবিলাম এই সিঁড়ি ধরিয়া উঠিয়া গেলে বোধ হয় সেই আলোকের ছটা যে স্থান হইতে আসিতেছে, সেই স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। অল্প যে কয়জন লোক ছবি হইতে মুখ ফিরাইয়া সিঁড়ির নিকট আসিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলিল এই দুর্গম সিঁড়ি অতি সঙ্কীর্ণ, আবার অন্ধকার, এ সিঁড়ি কোথায় লইয়া যাইবে তাহারও কোন

বিফলতা, বৈরাগ্য ও বহির্ম্মুখী চেষ্টা ছাড়িয়া অন্তর্ম্মুখী চেষ্টা।

কার্য্য হইতে কারণের অভিমুখীনতা।

দুর্গমপথে যাত্রা।

স্থিরতা নাই। এই স্থানেই দু একজন নিরাশ-হৃদয়ে বসিয়া পড়িল, আর অগ্রসর হইল না। যাহারা সাহসী, তাহারা এই সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া সতর্কভাবে উঠিতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল সিঁড়িতে পদচিহ্ন রহিয়াছে, আরও অনেক লোক যেন পূর্ব্বে এই পথে গিয়াছে, পথে আলোকও আছে। ক্রমে ক্রমে দু একজন লোক সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল একটি বালক,—তাহার সমস্ত দেহ আনন্দপূর্ণ, খল খল করিয়া হাসিতেছে আর কল ঘুরাইতেছে। যাহারা উপরে উঠিয়াছে তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়া উঠিল "ওঃ, তুমি এমনি করিয়া আপন আনন্দে বিভোর হইয়া, খেলা করিতেছ, আর আমরা নীচে বসিয়া ছবি দেখিয়া বঞ্চিত হইতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা যাইয়া সেই বালক-খেলোয়ারের পা চাপিয়া ধরিল। খেলোয়ার তাহাদের দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বাঃ! তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ, আমায় ধরিয়া ফেলিয়াছ দেখিতেছি, বেশ করিয়াছ—আমিও তাই চাই; আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, সেই অসীম আনন্দের আবেগে আমি নিত্যকাল এইরূপ খেলিতেছি, এ খেলা, আমার নিজের অন্তরের আনন্দ মূর্ত্তিসম্পন্ন করিয়া অনুভব করা মাত্র। তোমরা এমনি করিয়া আমার নিকট আসিবে, ইহাই আমার আনন্দ। তোমরা আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। এখন হইতে তোমরা আমার স্বজন হইলে, আর তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এখন হইতে তোমরা আমার নিকটেই থাক।

ভগবানের পরিচয়।

এই পর্য্যন্ত সাধারণ, অর্থাৎ অধ্যাত্ম-সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে এই উদাহরণের দ্বারা প্রতিপাদ্য যে আধ্যাত্মিক

কারণের তিন অবস্থা।

১। কার্য্যের অতীত।
২। কার্য্যের সম্ভাবনাযুক্ত।
৩। কার্য্যযুক্ত।

অভিজ্ঞতা, তাহা সকলকেই পাইতে হইবে। প্রথমে মানুষ বহির্মুখ, বিশ্ববৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া সুখের অন্বেষণে ধাবিত, কিছুদিন এই ভাবে জীবনের পথে চলিয়া দেখিল যে 'সুখে সুখ নাই,' তখন মানব স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী হইল, এই সময়ে প্রাচীন আচার্য্যগণের কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করায় মানব সংযমের পথে চলিতে লাগিল। তাহার পর সাধন-পথ এবং আনন্দময়রূপে বিশ্বকারণের উপলব্ধি। লোকগুলি আনন্দপূর্ণ ও ক্রীড়ারত সেই কিশোর-মূর্ত্তির সমীপে আসিয়াছে! এইবার চিন্তা করুন, সেই খেলোয়ার কি করিবেন? তিনি এখন তিনরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। প্রথমতঃ তিনি ভাবিতে পারেন, যে খেলা হইয়া গিয়াছে; এই বলিয়া তিনি খেলা বন্ধ করিয়া ও কলটি ফেলিয়া দিয়া তাঁহার স্বজনবর্গকে লইয়া বসিতে পারেন। আর যখন খেলা নাই, তখন আমরা আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বলিতে পারি না। কারণ আমাদের পরিচয় তো খেলার মধ্য দিয়া। তিনি আছেন, এই মাত্র বলি বটে, কিন্তু তাহাও ঠিক বলা যায় না। অর্থাৎ ইহা নির্বিশেষ সত্তামাত্র, অনির্ব্বাচ্য, অননুমেয়, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়। এই গেল প্রথম কথা। তাহার পর, এই খেলোয়ার আর এক কাজ করিতে পারেন, তিনি খেলা বন্ধ করিয়া দিলেন, তবে কলটি থাকিল, ভবিষ্যতে যদি কখন খেলা করেন তাহা হইলে তাহা আশ্রয় করিয়া খেলা করিবেন, সেই কলটি বা খেলার সম্ভাবনাটি থাকিল। ইহার নাম পরমাত্মা ভাব।

আর এক হইতে পারে যে ঐ খেলোয়ার-ঠাকুরের কলও থাকিল, খেলাও চলিতে লাগিল, স্বগণ-গণও তাঁহার নিকটে থাকিলেন। এইটির নাম ভগবদ্ভাব। এখন আর বিশ্ব নাই, লীলা আছে। এখন আর জড় নাই, সব চিন্ময়। এখন আর স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি-সম্পন্ন স্বপ্নের যে একটা কল্পিত আমি, তাহা নাই, নিত্যজীবের, আমি ভগবানের এই যে স্বরূপের অভিমান, এই অভিমানে জীব জাগিয়া উঠিয়াছে।

এই গেল ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে মোটামুটি কথা। এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র তত্ত্ব-ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নহে। এই ত্রিবিধ প্রকাশে পরমার্থতত্ত্বের উপলব্ধির ফলে মানবের জীবনের আদর্শ বা বাস্তব জীবন কি ভাবে নিয়মিত হয়, তাহাও আলোচ্য।

সমুচ্চয়বাদ।

তত্ত্বের উপলব্ধি ও বাস্তব জীবন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্, এই তিন প্রকারে মানব পরমার্থতত্ত্ব উপলব্ধি করে। তত্ত্বের উপলব্ধির সহিত বাস্তব জীবনের আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিশ্বাস যখন সত্য, তখন তাহা কার্য্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং এই ত্রিবিধ প্রকাশের তত্ত্বের দিক্ রাখিয়া দিয়া আমরা যদ্যপি বাস্তব-জীবনের আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে ভগবদুপাসনা কিরূপ, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিব।

নৈষ্কর্ম্ম্য সকলেরই আদর্শ, কিন্তু তাহার স্বরূপ লইয়া মতভেদ

ব্রহ্মের যে সংজ্ঞা শ্রীজীবগোস্বামীর মতানুসারে পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুযায়ী যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রবাহ, এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনের স্রোত, আমাদের এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, এ সকলের দ্বারা পরমার্থ-সত্য যে ব্রহ্ম বস্তু, তিনি লক্ষণান্বিত হইলেও তিনি এ সকলের অতীত, অর্থাৎ যখন তিনি আছেন, তখন এ সকল আদৌ নাই। এ সকল আছে বলিয়া যে আমাদের মনে হইতেছে, তাহা ভ্রান্তি-বিজড়িত। অতএব হে মানব! যদি তত্ত্ব চাও, যদি জ্ঞান চাও, যদি প্রকৃত মঙ্গল চাও, তাহা হইলে প্রাণপণ যত্নে এসকল পরিত্যাগ কর। অবশ্য একেবারে পরিত্যগ করা সম্ভব নহে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে তাহা অসম্ভব, এই জন্য কর্ম্ম করিতে থাক, কিন্তু কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে, এই লক্ষ্য যেন ধ্রুবতারার ন্যায় সর্ব্বদা জীবনতরণীর পুরোদেশে বিদ্যমান থাকে। কর্ম্মের নাশ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যে যাইতে হইবে, ইহাই জীবনের আদর্শ।

ইহাই জ্ঞানীর কথা, ইহাই ব্রহ্ম-উপাসকের কথা। এ কথা সত্য, ইহার প্রতিবাদ কেহই করেন নাই। মতভেদ কেবল

কর্ম্ম ছাড়িলেই নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না।

নৈষ্কর্ম্ম্যের স্বরূপ লইয়া। কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না, কৌশলপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারিলে কর্ম্মই যোগ হয়, এই কর্ম্মযোগই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য, কর্ম্মত্যাগ করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না। ইহাই সমুচ্চয়বাদ। এই সমুচ্চয়বাদ বেশ ভাল করিয়া না বুঝিলে ভাগবত-ধর্ম্মের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সুতরাং আর একটু ভাল করিয়া এই সমুচ্চয়বাদ আলোচনা করা যাউক।

কর্ম্ম-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক।

এই জগতের প্রতি চাহিয়া দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ইহাই সহজ কর্ম্ম বা প্রাকৃত কর্ম্ম। ক্ষুধার তাড়নায় শিশু খাদ্য অন্বেষণ করে, রাঙ্গা জিনিস দেখিলেই ধরিতে যায়। তখন তাহার জ্ঞান নাই। তখন সে বিষের বাটি হাতে পাইলে যদি মিষ্ট বোধ হয় তাহাই খাইয়া ফেলিবে, সুন্দর বিষধর সর্প দেখিলে তাহাই ধরিতে যাইবে। এই যে স্বাভাবিক কর্ম্মাসক্তি, ইহা হইতে জ্ঞান আরম্ভ হয়। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়, ইহার মধ্যে প্রভেদ আছে, প্রেয়কে পরিহার করিয়া শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই চিন্তা মানব-শিশুর অন্তরে জাগ্রত হয়! এই ভাব জাগাইবার জন্য মানবের নিজের অভিজ্ঞতাই মুখ্যতঃ কার্য্য করে, সামাজিক অভিজ্ঞতা, পিতা মাতা শাস্ত্র গুরু প্রভৃতির উপদেশ সাহায্য করে। এই প্রকারে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান, তাহার পর জ্ঞান হইতে ভক্তি। জ্ঞানের দ্বারা পরমার্থ বস্তুর স্বরূপ নিরূপিত হইতে থাকে এবং হৃদয়ও ক্রমশঃ সেই পরমার্থ বস্তুর প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়। ইহাই হইল প্রথম স্তর। তাহার পর ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে কর্ম্ম। এই যে শেষের কর্ম্ম, ইহার নাম নিবৃত্ত কর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধন-ভক্তি। মতান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায়, কর্ম্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে ভক্তি। এই যে দ্বিতীয় স্তরের কর্ম্ম, ইহাই সাধন-ভক্তি। শব্দগুলির অর্থ উপলব্ধি না করিয়া যাঁহারা কেবল শব্দ লইয়াই বিরোধ করেন, অর্থাৎ সূক্ষ্মচিন্তায় একেবারে যাঁহারা

স্বাভাবিক কর্ম্মাসক্তি হইতেই জ্ঞান হয়।

প্রথম স্তরে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি। দ্বিতীয় স্তরে জ্ঞান হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে ভক্তি।

কর্ম্মের সাধারণ ও অসাধারণ অর্থ বুঝিলেই মীমাংসা হইয়া যাইবে।

অপ্রবিষ্ট হইয়াও তত্ত্ববিৎ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বলিবেন কর্ম্ম হইতে ভক্তি কিরূপ? ভক্তির অজন্যতা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে, সাধন-ভক্তির তত্ত্বালোচনাতেও ইহা সহজে প্রতীত হইবে। শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ প্রভৃতি কর্ম্ম নহে, সাধনভক্তি। কিন্তু একদল লোক তাহাকে কর্ম্ম বলিবেন। ইহা কর্ম্ম, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে, আত্মতৃপ্তির জন্য বা আত্ম-পুষ্টির জন্য যে কর্ম্ম করা যায় বা শাস্ত্রের শাসনে, লাভের প্রত্যাশায় বা কোনরূপ ভয়ের তাড়নায় যে কর্ম্ম করা যায়, ইহা সে পর্য্যায়ের কর্ম্ম নহে, কিন্তু একটা উচ্চতর অর্থে কর্ম্ম। এই রহস্যটুকুই যে গীতার প্রাণ, তাহা আমরা ক্রমশঃ বিশদ করিতে চেষ্টা করিতেছি। জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ কেবল আমাদের দেশে নহে, সকল দেশেরই চিন্তাশীল সাধু ও সুধীগণের মধ্যে চিরদিন উত্থিত হইয়াছে। এই বিরোধের সমাধান বা সমন্বয়ের যে চেষ্টা, উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মৈত্রী প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা, তাহার নাম সমুচ্চয়বাদ। এক হিসাবে ভগবদ্গীতা এই সমুচ্চয়বাদের পরাকাষ্ঠা। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার গীতার টীকায় ইহা অস্বীকার করিয়াও একরূপ স্পষ্টভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা তাঁহার টীকা উদ্ধার করিয়া ক্রমশঃ দেখাইতেছি। গীতা, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়া পরা-ভক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত এই সমুচ্চয়-বাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ গীতার বীজই শ্রীমদ্ভাগবতে মহামহীরূহে পরিণত। শ্রীকৃষ্ণলীলায় তাহা সফল, শ্রীচৈতন্য-লীলায় সেই অমৃতফল অযাচিত হইয়াও উত্তম অধম নির্ব্বিশেষে বিতরিত। এই তত্ত্বটুকু যেন আমরা কখনই বিস্মৃত না হই।

জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ।

জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ সংক্ষেপে এই। দুইরকম প্রকৃতির লোক জগতে বিদ্যমান। একদল লোক সংসারে খুব খাটিতে চায়, বড় বড় কার্য্য করিতে চায়। গৃহে গৃহস্থ, গৃহস্থের যাবতীয় ধর্ম্ম যথাযথ পালন করিয়া বৃহৎ পরিবার প্রতিষ্ঠা করে, আত্মীয় ও আশ্রিত জনের ভরণ পোষণ করে, নানা উপায়ে সমাজের ও

চরমপন্থী কর্ম্মী।

জগতের সেবা করে। যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করে। ব্রাহ্মণ হইলে যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয় হইয়া আর্ত্তত্রাণ, শত্রুজয়, রাজ্যশাসনাদি, বৈশ্য হইয়া কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি এবং শূদ্র হইয়া শ্রদ্ধান্বিত ভাবে পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম করে, ইহলোকে যশস্বী হইয়া পরলোকেও সুখী হইবার প্রত্যাশায় দেহত্যাগ করে। এই একদল লোক। সেকালের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আজকাল ঠিক থাকুক বা না থাকুক, সমাজের ব্যবস্থা ও সংস্থান বিবিধ কারণের ঘাত প্রতিঘাতে যতই বিপর্য্যস্ত বা পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, এ প্রকারের লোক জগতে চিরকাল আছে ও থাকিবে, কেবল ভারতবর্ষে নহে, সকল দেশেই থাকিবে, কারণ ভিতরে মানবপ্রকৃতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। এ সকল লোক, বড় বেশী ভাবিতে চায় না, কারণ তাহারা কিছু চঞ্চল, এবং কিছু বহির্ম্মুখী। তাহারা যে লোক মন্দ তাহা নহে, তবে তাঁহারা ধ্যান-নিষ্ঠার পক্ষপাতী নহেন, বরং অনেকস্থলে একরূপ তাহার বিরোধী। তাঁহারা বলেন অতিরিক্ত ধ্যান-নিষ্ঠা মানবকে অলস করিয়া দেয়, প্রত্যক্ষ হইতে সরাইয়া এক অজ্ঞাত ও 'বোধ হয়' অজ্ঞেয় অপ্রত্যক্ষের দিকে উন্মুখ করিয়া রাখে। এই একদল, ইহাদের নাম দেওয়া যাউক 'চরমপন্থী' কর্ম্মী, The followers of the extreme view of sansationalistic hedonism ইহারা যে মন্দ লোক, তাহা নহে। তবে সময়ে সময়ে তাহার পরিণতি খারাপ হয়, তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যানের সাহায্যে ক্রমে দেখাইব।

আর একদল চরমপন্থী জ্ঞানী। তাঁহারা বলেন এই মৃত্যুর সংসারে, মানব যে সুখান্বেষণ করিতেছে, ইহা তাহার অবিদ্যার ফল। মোহাচ্ছন্ন জীব! কর্ম্মের এই উত্তেজনা পরিত্যাগ কর, অন্তর্মুখী হও, সৎ কি, অসৎ কি, দেহ কি, ইন্দ্রিয় কি, মন কি, বুদ্ধি কি, এই সব, বিচার কর। তত্ত্বসমূহের সহিত পরিচিত হও, তাহা হইলে বৈরাগ্য জন্মিবে। বৈরাগ্য হইতে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সংযত হইবে। তখন কেমন মনে হইবে, এই সংসার দারুণ বন্ধন, ইহা

পরিত্যাগ করাই লাভ। এমনি করিয়া ধ্যান-নিষ্ঠা আশ্রয় কর। সুখ দুঃখের অতীত, ত্রিগুণের পরপারে 'চিদানন্দরূপ আমি' তাহাই অনুভব হইবে। ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা, ইহাই মুক্তি। কর্ম্ম কেবল বন্ধন, যে পরিত্যাগ করিবে সেই বাঁচিবে, যে আশ্রয় করিবে সেই মরিবে। অতএব কর্ম্মপাশ ছেদন কর। ইংরাজী ভাষায় ইহাদের Followers of the Extreme view of Idealistic Asceticism বলে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের বিরোধ বা বেদের ব্রাহ্মণ অংশের সহিত উপনিষদ ও আরণ্যক অংশের সহিত বিরোধে ইহার সূত্রপাত। বেদের সংহিতা অংশে ইহার সমন্বয় ছিল। সমুচ্চয়বাদই আদি ও শেষ। পরবর্ত্তী কালে জৈমিনি ও বাদরায়ণ এই দুই মত লইয়া উপস্থিত। গীতায় তাহার সমন্বয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত দক্ষের সহিত শিবের বিরোধে ও দক্ষযজ্ঞনাশে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে দক্ষযজ্ঞের আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইব। পূর্ব্বেই বলা হইল বেদের সংহিতায় সমন্বয় ছিল। মূল ভুলিলেই বিরোধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই সমন্বয়। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের নাম পরমহংস সংহিতা বা সাত্বত সংহিতা।

চরমপন্থী জ্ঞানী।

দক্ষযজ্ঞে সমন্বয়।

বেদের সংহিতা অংশ সমুচ্চয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্‌গীতায় এই সমুচ্চয়বাদ। ভগবতদ্গীতার পূর্ব্বেও সমুচ্চয়বাদের অতীব সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশোপনিষৎ শুক্ল যজুর্ব্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত। এই ঈশোপনিষদে সমুচ্চয়বাদের বিশেষ আলোচনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে এই ঈশোপনিষৎ গ্রন্থ একরূপ আনুপূর্ব্বিক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে স্মরণীয়। আমরা সর্ব্বাগ্রে এই ঈশোপনিষদের শ্লোকগুলি উদ্ধার করিতেছি।

ঈশোপনিষদে সমুচ্চয়।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ-বিদ্যায়াং রতাঃ॥

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥
অন্ধং তম প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতি মুপাসতে।
ততো ভূয় ইবতে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥”

অবিদ্যা ও বিদ্যা।

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আবার যাঁহারা বিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহারা আরও ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। এইরূপ কথিত আছে যে বিদ্যার ফল একরূপ, আর অবিদ্যার ফল অন্যরূপ। যাঁহারা এসম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিয়াছেন, এই প্রকারের ধীর ব্যক্তিগণের নিকট আমরা অন্যরূপ শুনিয়াছি। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে একই সময়ে জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করেন।

অসম্ভূতি ও সম্ভূতি।

যাঁহারা অসম্ভূতির উপাসনা করেন তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আবার যাঁহারা সম্ভূতিতে রত তাঁহারা আরও অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ বলেন সম্ভবের উপাসনার ফল একরূপ, আর অসম্ভবের উপাসনার ফল অন্যরূপ। যাঁহারা এসম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিয়াছেন, এ প্রকারের ধীর ব্যক্তিগণের নিকট আমরা নিম্নরূপ শুনিয়াছি। যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ, এই উভয়কে একই সময়ে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া সম্ভূতির দ্বারা অমৃত লাভ করেন।

ঈশোপনিষৎ সমুচ্চয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিকের ভাষায় সমুচ্চয়বাদ এইরূপ। দুটি জিনিস, একটির নাম বিশেষ, আর একটির নাম ভূমা বা সর্ব্ব। এই দুইটির সম্বন্ধ কি? বিশেষের মধ্যেই সর্ব্ব আছেন এবং সর্ব্বের মধ্যেই বিশেষ আছেন, অখণ্ড জ্ঞানদৃষ্টিতে এইটি দেখিতে হইবে,—ইহাই সাধনা। উদাহরণ লওয়া যাউক, আমার পুত্র, তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, ভগবান্ "সর্ব্বজীবং" তাঁহাকে অর্থাৎ নিখিল বিশ্বকে ভালবাসিতে হইবে। আমি পুত্রকে ভালবাসি, তাহার হিতসাধনায় সতত ব্যস্ত, সুতরাং আমি আর কি করিয়া বিশ্বকে ভালবাসিব, আমার যদি পুত্র না থাকিত তাহা হইলে বিশ্বকে ভালবাসিতাম। এ কথা যিনি বলেন তিনি ঈশোপনিষদের ভাষায় অবিদ্যা বা অসম্ভূতির উপাসনা করেন, তিনি অন্ধকারে যাইবেন। আর একজন বলিতেছেন আমি বিশ্বকে ভালবাসিতে চাই, অতএব আমি আর পুত্রকে, ভ্রাতাকে, মাতাকে, পরিবারকে বা দেশকে কি করিয়া ভালবাসিব? একথা যিনি বলেন তিনি বিদ্যার বা সম্ভূতির উপাসনা করেন, তিনি আরও বেশী অন্ধকারে যাইবেন। সমুচ্চয়বাদী বলেন পুত্রকে ভালবাসা আমার তখনি কেবল সত্য ও সফল, যখন এই পুত্রের মধ্যে আমি সেই বিশ্বজনীনকে পাই, বিশ্বজনীনকে ভালবাসা আমার তখনি কেবল সত্য ও সফল, যখন এই ভালবাসায় আমার পুত্র আমার স্নেহাস্পদ হয়। বিশেষকে অবহেলা করিয়া যিনি সর্ব্বকে পাইতে চাহেন, তিনি কল্পনাকে পাইতেছেন; আবার যিনি সর্ব্বকে অবহেলা করিয়া বিশেষকে পাইব বলিয়া ছুটিয়াছেন, তিনিও কল্পনাকেই পাইবেন। একদিকে শূন্য আর একদিকে কাম। ইহার সমন্বয় যাহা তাহারই নাম সমুচ্চয়বাদ।

বিশেষ ও সর্ব্ব।

এই উভয়কে অঙ্গাঙ্গীভাবে এক সঙ্গে ধরিতে হইবে। একটি ছাড়িয়া অপরটি লইলে চলিবে না।

দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে; একটি জ্ঞানের বা তত্ত্বের দিক্, আর একটি ভাবের বা প্রেমের দিক, দুইটীই সমুচ্চয়বাদ। ভগবদ্‌গীতার উপদেশ শ্রবণের পর অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ যখন দিব্যদৃষ্টি

প্রথম উদাহরণ, তত্ত্বের।

দিলেন, সেই দিব্যদৃষ্টি সাহায্যে অর্জ্জুনের যখন সত্যদর্শন ঘটিল তখন তিনি কি দেখিলেন ?

গীতা বলিতেছেন,—

"তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥"

অর্জ্জুনের দিব্য দৃষ্টিলাভ ও বিশ্বরূপ দর্শন।

সেই সময়ে তৃতীয়পাণ্ডব অর্জ্জুন দেখিলেন, জগৎ, যাহা আমাদের নিকট দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা অনেকভাগে বিভক্ত বলিয়া প্রতীত হয় তাহা এক ও অখণ্ড এবং তাহা দেব-দেবের শরীরে অবস্থিত। অর্থাৎ তিনি খণ্ডকে বা বিশেষকে দেখিলেন কিন্তু খণ্ডরূপে বা বিশেষরূপে নহে, অখণ্ড ঐক্যের বা ভূমার মধ্যে। ইহারই নাম সম্যক্ দর্শন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, এইরূপ যিনি দেখেন তিনিই উত্তম ভক্ত।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

সর্ব্বভূতে আত্মা, আত্মায় সর্ব্বভূত।

শ্রীধরস্বামীর টীকানুযায়ী এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এইরূপ। যিনি ব্রহ্মভাবের দ্বারায় সকলভূতে নিজের সমন্বয় দেখেন এবং ব্রহ্মরূপ আত্ম-অধিষ্ঠানে সকল ভূতকে দেখেন, তিনি উত্তম ভক্ত। শ্রীধরস্বামী আরও সরল করিয়া বুঝাইলেন যে তন্ত্রে আছে "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ" অতএব আত্মা যে হরি, তাঁহাকে সর্ব্বভূতে অর্থাৎ মশকাদিতেও নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান ও নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যবান্‌রূপে দেখেন, তারতম্য দেখেন না। আবার আত্মায় অর্থাৎ হরিতে ভূত সকলকে দেখেন। সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ ভগবত্তা দেখেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ কুন্তী, প্রেমের।

এই গেল জ্ঞানের দিক্। এইবার ভাব বা প্রেমের দিকে আলোচনা করা যাইতেছে। কুন্তীদেবী শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন পাণ্ডবগণে ও যাদবগণে এই যে আমার দৃঢ় স্নেহপাশ ইহা ছেদন

করিয়া দাও। এই কথা বলিয়াই কুন্তীদেবী ভাবিলেন কৃষ্ণও যে যাদব। তাই বলিলেন,--

"ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি॥"

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুযায়ী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ। তুমি স্নেহপাশ ছিঁড়িতে চাও, তবে কি ব্রহ্মজ্ঞানে তোমার স্পৃহা জন্মিয়াছে, তবে কি আমার প্রতি তোমার যে স্নেহ তাহাও ছিন্ন করিতে চাও? কুন্তীদেবী বলিতেছেন না, না, হে মধুপতে! তোমাতে আমার অনবচ্ছিন্না প্রীতি নিরন্তর বিদ্যমান থাকুক। এখন তুমি ও তোমার ভক্ত অভিন্ন তাহা আমি জানি, সুতরাং তোমার প্রতি প্রীতি দ্বারা পাণ্ডব ও যাদবগণ, যাহারা তোমার ভক্ত তাহাদের প্রতিও প্রীতি সাধিত হইবে। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে পূর্ব্বে আমি যাদব ও পাণ্ডবগণকে ভালবাসিতাম। আমার আত্মীয় ও পুত্র, আমার সহিত তাহাদের দৈহিক সম্বন্ধ আছে, এই জন্য তাহাদের ভালবাসিতাম, এখনও তাহাদের ভালবাসিব কিন্তু এভাবে নহে। এখন ভালবাসিব, তাহারা তোমার ভক্ত বলিয়া অর্থাৎ এতদিন আমি তাহাদের ভালবাসিতাম বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের ভালবাসার মধ্য দিয়া আমার অজ্ঞাতসারে আমি আমার এই দেহকেই ভালবাসিতাম, এখনও ভালবাসিব কিন্তু এই ভালবাসার মধ্য দিয়া আমার দেহকে নহে, হে মধুপতে, হে আনন্দময়! এই ভালবাসার মধ্য দিয়া তোমাকেই ভালবাসিব। হে সর্ব্ব! আমার যাবতীয় প্রেমের মধ্যে তোমার প্রতি আমার যে পরমপ্রেম তাহাই সফল হইবে। আমার প্রীতি তোমাকে ভালবাসাতে কোন প্রতিবন্ধক অনুভব করিবে না। গঙ্গা যেমন সাগরে মিশিয়া যাবতীয় নদনদীর সহিত স্থায়ীভাবে ও সত্য করিয়া মিশিয়া যান, সেইরূপ।

ভগবৎপ্রেমে বিশ্বপ্রেম।

এ প্রেম বন্ধন নহে, মায়িক নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে এই জগৎকে, এ জীবনকে একদল

সংসার

সকল সময়ে প্রতিবন্ধক নহে।

লোক ভগবদ্ধারাধনার প্রতিবন্ধক বিবেচনা করেন আর একদল প্রতিবন্ধক মনে করেন না বরং উপায় মনে করেন, এই দ্বিতীয়দল সমুচ্চয়বাদী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঈশোপনিষদের সমুচ্চয়বাদ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের সেই শ্লোকগুলি আলোচনা করিতেছি।

মনুর স্তব।

প্রথম মনু, তাঁহার নাম স্বায়ম্ভুব। তিনি শতরূপার পতি। তিনি রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য সস্ত্রীক বনে প্রবেশ করেন। তিনি সুনন্দা নদীর তীরে একপদে ভূমি স্পর্শ করিয়া অবিশ্রান্ত শতবৎসর দুষ্কর তপস্যা করিতে করিতে বিস্মিতের ন্যায় এইরূপ বলিয়াছিলেন।

"যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যৎ।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ সঃ॥
আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥
যং পশ্যতি ন পশ্যন্তং চক্ষুর্যস্য নরিষ্যতি।
তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবতঃ॥
ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরোনান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামুনি যদ্‌যস্মাদ্বিশ্বঞ্চ সদৃতং মহৎ॥
স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে॥
অথাগ্র ঋষয়ঃ কর্ম্মাণীহন্তে কর্ম্মহেতবে।
ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রয়োঽনীহাৎ প্রপদ্যতে॥

ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসজ্জতে।

আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তং॥

তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বুধং নিরাশিষং পূর্ণমনন্যচোদিতং।

নৃণ্ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্ত্ম সংস্থিতং প্রভুং প্রপদ্যে-

ঽখিলধর্ম্মভাবনং॥"

৮ম স্ক, ১ম অধ্যায়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে আমরা একদিকে যেমন সমুচ্চয়বাদের যাহা আদর্শ তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইব, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবত উপাস্য পরমেশ্বরের যে ভাব বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও জানিতে পারিব (The conception of God according to the Bhagabata.)

চিদাত্মার চেতনায় জগৎ চেতন।

শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই। চিদাত্মা কর্তৃক বিশ্ব চেতন হয়, বিশ্ব তাঁহাকে চেতন করে না, কারণ তিনি স্বতঃচেতন। জীব যখন নিদ্রিত, তখন যিনি জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকেন, কি আশ্চর্য্য ইনি (জীব) তাঁহাকে জানেন না, কিন্তু তিনি ইহাকে জানেন। ১

ঈশ্বরার্পণই প্রকৃত ভোগ।

আত্মা বা ঈশ্বরকর্তৃক সত্তা ও চৈতন্যের দ্বারা এই জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্যাপ্ত। অতএব ঈশ্বর যাহা দেন তাহাই ভোগ করিবে। অথবা ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া বা ঈশ্বরার্পণরূপ ভোগ করিবে। আপনার নিমিত্ত কাহারই বা ধন আছে যে তাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে। ২

তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্তু কোন লোক অথবা কাহারও চক্ষুঃ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি চক্ষুরাদির অবিষয়। তিনি প্রমাতা, কোন প্রমাণ তাঁহাকে সপ্রমাণ করিতে পারে না। অতএব সকল ভূতের অন্তর্যামী, অসঙ্গ সেই ঈশ্বরেরই ভজনা কর। ৩

তাঁহার আদি, অন্ত, মধ্য এবং আত্মীয় পর ও অন্তর বাহির

নাই, বিশ্বের আদি অন্ত প্রভৃতি তাঁহা হইতেই হয়, বিশ্ব তাঁহার স্বরূপ তিনি সত্য ও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। ৪

সেই ঈশ, স্বয়ং, সত্য, স্বপ্রকাশ এবং নির্ব্বিকার, তাঁহার শরীর এই বিশ্ব, তাঁহার নাম বহুতর, তিনি আত্মমায়া দ্বারা বিশ্বের জন্মাদি বিধান করেন। অথচ নিত্য সিদ্ধ বিদ্যাহেতু ঐ মায়াত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয়ই আছেন। ৫

পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর ঈহমান অর্থাৎ কর্ম্মান্বিত হইয়াও যখন অনীহ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় সেইরূপ ঋষিগণও নৈষ্কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করেন। ৬

অনেকে বলেন যে কর্ম্ম বন্ধন। কর্ম্মের দ্বারায় কর্ম্মকারী পুরুষ অবগুণ্ঠিত হইয়া কোষকার কীটের মত বদ্ধ হন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কেননা ভগবান্ ঈশ্বর চেষ্টা বা কর্ম্ম করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে আসক্ত নহেন, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুবৃত্তি করেন, তাঁহারাও আত্মলাভ করিয়া চরিতার্থ হইবেন, আসক্ত হইবেন না। ৭

তাহা হইলে শ্রীভগবান্ কেমন (ক) নিজবর্ত্ম সংস্থিত—রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা অবতারানুরূপ নিজবর্ত্মে সম্যক্‌রূপে অবস্থিত, (খ) কর্ম্মাচরণ রত (গ) নিরহঙ্কৃত জগৎ সৃষ্ট্যাদি করিয়াও কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য (ঘ) বুধ (ঙ) নিরাশী (চ) পূর্ণ (ছ) অন্যকর্ত্তৃক নিযুক্ত নহেন (জ) কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু এই অপরকে শিক্ষা দিতে চাহেন, (ঝ) প্রভু (ঞ) অখিল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ৮

আমাদের উপাস্য শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত যাহা বলিলেন, ভগবদ্গীতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। এই জন্য আমরা গীতার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য আরও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

শঙ্করমতে কাম ও কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য কর্ম্ম, কর্ম্ম নহে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গীতা সমুচ্চয়বাদই প্রচার করিয়াছেন, আরও বলা হইয়াছে যে আচার্য্য শঙ্কর ইহা অস্বীকার করিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার এই রহস্যটুকু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন যে কেহ কেহ বলেন যে

গীতাশাস্ত্রে সকল আশ্রমীর পক্ষেই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে, ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীগণের জন্য এরূপ কথা বলা হয় নাই। আমরা এস্থলে ইহার বিশেষ আলোচনা করিলাম না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম স্কন্ধের টীকা অলোচনায় মনে হয় শঙ্করাচার্য্য সমুচ্চয়বাদ সমর্থন করেন। তিনি এই মাত্র বলেন যে যাহার মূলে কাম ও কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, তাহা কর্ম্মই নহে।

রাজর্ষি জনক ও ভগবান্ স্বয়ং কর্ম্মরত।

ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই রাজর্ষি জনক কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহার লক্ষ্য লোকসংগ্রহ। কেবল রাজর্ষি জনক কেন, ভগবান্ নিজেও বিশ্বকল্যাণের জন্য কর্ম্মরত। গীতায় যাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইল সেই অর্জ্জুনও গীতার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেন।

অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বাড়ে।

গীতার যাহা আদর্শ আমরা তাহা সহজে এই প্রকারে বুঝিতে পারি। জগতে মানুষ যত বড় হইতেছে তাহার দায়িত্ব বা ভার তত বাড়িতেছে। অনেকে মনে করে যে যত বড় হইতেছি তত অধিকার বাড়িতেছে, অধিকার বাড়িতেছে ইহা সত্য, কিন্তু অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বাড়িতেছে। যে মানব অধিকারের দিকে যায় সে নিতান্ত প্রাকৃত মানব, নিতান্ত হীন জীবন যাপন করিতেছে। যিনি প্রকৃত মানুষ তিনি এই দায়িত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অধিকার বা উচ্চপদের সহিত যখন দায়িত্ব বাড়িয়া যাইতেছে, তখন যাঁহার অসীম অধিকার বা উচ্চতম পদ তাঁহার দায়িত্ব বা ভারও অসীম। ভগবান্ ঠিক তাহাই, তাঁহার দায়িত্বের সীমা নাই। সুতরাং যাঁহাকে ভগবানের পথে চলিতে হইবে তাঁহার দায়িত্ব এড়াইলে চলিবে না। বেশী বেশী দায়িত্বের ভার আনন্দের সহিত বহন করিতে হইবে। এই যে আদর্শ, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই আদর্শে উন্নীত করিলেন। ইহাই গীতার সাধনা। প্রথমে বলিয়াছিলেন স্বধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া, সাংসারিক কীর্ত্তির প্রতি চাহিয়া যুদ্ধ কর, কিন্তু এই মন্ত্র যখন খাটিল না, তখন যাবতীয় তত্ত্বকথা উপদেশ করিয়া এই নিস্কাম-কর্ম্মের মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত

আনন্দের সহিত দায়িত্ব বহন করাই ভাগবত-ধর্ম্ম।

করিলেন। অধর্ম্ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা নর, আমাদের প্রত্যেকেই সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া এই সংসার-কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি, নারায়ণ আমাদের প্রত্যেকেরই সারথী তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। বিশ্বনাথ নিজে বিশ্বসেবার ভার লইয়াছেন, বিশ্বসেবার ভার এড়াইতে যাহারা ব্যস্ত, তাহারা বিশ্বনাথের নাম লইবার অধিকারী নহে।

বিশ্বনাথ বিশ্বসেবক।

সমুচ্চয়বাদেই লীলাবাদ ও প্রেমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।

ভক্তি ও সামাজিক সদাচার।

অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ব অর্থাৎ পরমার্থ সত্য। এই তত্ত্বই একমাত্র আশ্রয়ণীয়, জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল; জানিয়া বা না জানিয়া সকলেই এই তত্ত্ব-বস্তুর অভিমুখী। এই তত্ত্ব-বস্তুই নিখিল চরাচরকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং সকলেই বিবিধ ঘাতপ্রতিঘাত ও জয়পরাজয়ের মধ্য দিয়া এই তত্ত্বের অভিমুখে ছুটিতেছে। যাহা এই তত্ত্বের যতটুকু অভিমুখী বা নিকটে, তাহাই তত সত্য, তত উচ্চ ও তত শ্রেয়স্কর।

তত্ত্ব এক, সমগ্র বিশ্ব তাহারই আকর্ষণে চালিত।

এই তত্ত্ব ত্রিবিধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। এই তিনটি নাম এই ভাবে বুঝিতে হইবে। আমাদের জ্ঞানের নিকট একটা জ্ঞেয় জগৎ বা ইদং, সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সমূহ ও তাঁহাদের অধিপতি মনই মানুষের সর্ব্বস্ব নহে, ইহা ছাড়া অর্থাৎ এই পরোক্ষজ্ঞান ছাড়া মানুষের আরও কিছু আছে। সেই যে 'আরও কিছু' যাহা পরোক্ষজ্ঞানের বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইলেও, জ্ঞানের বা মানবচৈতন্যের বিষয়ীভূত, সেই জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান বা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান বলে। উপস্থিত আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা সূক্ষ্ম-বিচার-ময় যে অনুমান, সেই অনুমানের বিষয়ীভূত। কিন্তু সকলের নিকটেই যে তাহা আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহা নহে। এখন প্রশ্ন এই যে এই অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত এই তত্ত্বের সহিত এই যে প্রত্যক্ষ 'ইদং' ইহার সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। একজন বলিলেন এই 'ইদং' এর সাহায্যে তিনি আছেন এই মাত্র অনুমান হয় আর কিছুই সম্বন্ধ নাই। "ইদং"টা সত্য সত্য নাই, এ একটা ভুল মনে হওয়া, যেমন দড়ি দেখিয়া মনে হয় সাপ দেখি-

অহং ও ইদং, বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের সম্বন্ধ।

১। 'ইদং'নাই, ইহা ব্রহ্মবাদী মত।

তেছি। মনে করুন, আমি দাঁড়াইয়া আছি, দর্পণে যেমন হউক আমার একটা ছায়া পড়িয়াছে, এ ছায়া তো আমাতে নাই, এ ছায়া যে দর্পণ দেখে তাহারই মনে আছে, সত্য সত্য নাই। তত্ত্বের সহিত 'ইদং' এর এই সম্বন্ধ। আর একজন বলিলেন এই যে ছায়া ইহার সম্ভাবনা বা হেতু আমার মধ্যে সর্ব্বদাই আছে অর্থাৎ এই সম্ভাবনা আমার স্বরূপের একটি লক্ষণ। আমার স্বরূপের অন্যান্য লক্ষণও থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে, সে সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্তু এই যে লক্ষণটি অর্থাৎ ছায়ার হেতু, এই লক্ষণটির দ্বারাই লোকে, যাহারা ছায়া দেখে তাহারা, আমাকে ধরিতে পারে, অন্য কোন প্রকারে পারে না। আর একদল বলিলেন এই ছায়াপাত করা এই কার্য্যটিই আমার, নিত্যই আমি দর্পণে আমার মুখ দেখি ও অপরকে দেখাই, ইহাই আমার সময় কাটাইবার উপায়, ইহাই আমার আনন্দের খেলা। তুমি কেবল ছায়া দেখ, ছায়া আর কায়া দুই এক অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখিতে পার না, কাজেই মিথ্যার পশ্চাতে পশ্চাতে অনাদি বহির্মুখ হইয়া ঘুরিয়া মর। এখন বুঝিতে চেষ্টা কর, ছায়া ছাড়া কায়া নাই, তাহা হইলে আমাকে ধরিতে পারিবে, আমিই তত্ত্ব, আমাকে ধরাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য ও ব্রত।

২। 'ইদং' ব্যতীত, 'অহং' এর পরিচয় নাই; ইহা পরমাত্ম-বাদীর মত।

৩। 'ইদং' লইয়া খেলা করাই 'অহং' এবং কার্য্য, ইহাই ভগবদ্-বাদীর মত।

এই তিনটি ভাবের মধ্যে প্রথমটি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় পরমাত্মা, আর তৃতীয় ভগবান্। শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যাখ্যা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সেই ভগবান্ই জগতের সর্ব্বস্ব, 'ইদং' এর প্রাণ। "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিত"।

ভগবৎ-প্রাপ্তিই তত্ত্বের পূর্ণ-প্রাপ্তি ইহা ভক্তি সাধ্য।

ভক্তির দ্বারাই সেই ভগবান্‌কে পাইতে হইবে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ। ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম, এই জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন।

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥"

এই তত্ত্ব ভক্তির দ্বারা প্রাপ্য। এই ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-যুক্তা। বেদান্তশ্রবণের দ্বারা ইহার দৃঢ়তা সাধিত হয়। শ্রদ্ধা ইহার সাধন। শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ এই ভক্তির দ্বারা সেই তত্ত্ব-বস্তুকে দর্শন করেন। প্রশ্ন হইতেছে, কোথায় দর্শন করেন? উত্তরে বলিতেছেন, আত্মায় অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই তত্ত্ব কেমন? তিনি কি আত্ম-ব্যতিরিক্ত, অনাত্মভাবাপন্ন, কোন জ্ঞেয়শ্রেণীর বস্তু? উত্তরে বলিতেছেন, না, তিনিই পরমাত্মা।

ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্তা।

বেদান্ত-শ্রবণ ও শ্রদ্ধা আবশ্যক।

তত্ত্বদর্শন বাহিরে নহে, আত্মায় পরমাত্মারূপে।

শ্রীবৃন্দাবনলীলা আলোচনা কালে উদ্ধৃত শ্লোকের প্রতিপাদ্য যে তত্ত্ব-কথা তাহা অনেকে বিস্মৃত হইয়া যান। এইজন্য অপ্রাকৃত প্রেমলীলার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতকার এই তত্ত্বটুকু আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এই ভাবে বুঝাইতেছেন।

ইহা না বুঝিলে বৃন্দাবনলীলা ঠিক বুঝা যায় না।

"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্ব স্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশাবলীয়সী॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবৈহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ।

প্রথম পাঁচটি শ্লোকে দেখাইতেছেন যে স্বতঃ অর্থাৎ আপনা

আত্মপ্রেম স্বতঃসিদ্ধ।

অন্য প্রীতি ঔপাধিক।

স্বদেহপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

আত্মাধ্যাসের তারতম্যে প্রীতির তারতম্য।

মূঢ় ও অমূঢ়ভেদে প্রীতির তারতম্য।

হইতেই বা নিজের স্বভাববশতঃ আত্মাই আমাদের প্রিয়তম বস্তু। অন্য যাহা কিছু আমরা প্রিয় বলিয়া মনে করি, সেই সমস্তের প্রতি যে প্রীতি তাহা ঔপাধিক অর্থাৎ আত্মার প্রকাশক উপাধি বলিয়া। "হে রাজন্! আত্মাই যাবতীয় ভূতের প্রিয়; পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয়। এই জন্য নিজ নিজ অহঙ্কারাস্পদ যে দেহ সেই দেহের প্রতি শরীরিগণের যেমন স্নেহ হয়, এই মমতা অর্থাৎ আমার দেহ এই যে মৌলিক অভিমান এই অভিমানকে আশ্রয় করিয়া যাহারা আপনার হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ পুত্র, ধন, গৃহ প্রভৃতিতে সেরূপ হয় না।" আত্মাধ্যাসের তারতম্যে প্রীতিরও তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহাকে যতটুকু আপনার বলিয়া মনে করি তাহাকে ঠিক ততটুকুই ভালবাসি। এই টুকু দেখাইবার জন্য পরের দুইটি শ্লোকে মূঢ় ও অমূঢ়ভেদে প্রীতির কিরূপ তারতম্য হয় তাহাই দেখাইতেছেন। "যাহারা দেহাত্মবাদী অর্থাৎ যাহারা এই দেহকেই আমি বলিয়া মনে পড়ে, দেহাতীত কোন কিছু আছে বা থাকিতে পারে ইহা যাহারা জানে না তাহারা আপনার দেহটিকে যেমন ভালবাসে এই দেহের যাহারা অনুবর্ত্তী অর্থাৎ এই দেহের সম্পর্কে যাহারা সম্পর্কিত হইয়া 'আমার' বলিয়া প্রতীত হয়, যেমন পুত্র প্রভৃতি, তাহারা সেরূপ প্রীতিভাজন নহে। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, এই যে দেহ, ইহার যখন আর আশা নাই, অর্থাৎ ইহার বিনাশ যখন অবশ্যম্ভাবী সে সময়েও বাঁচিয়া থাকিবার আশা অত্যন্ত প্রবলভাবেই থাকে। আর বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, দেহ নিশ্চয়ই যাইবে ইহা যখন স্থির হইল তখনও যখন বাঁচিবার ইচ্ছা রহিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে, এই যে প্রীতি ইহা দেহগত বলিয়া এতদিন প্রতীত হইলেও সত্য সত্য তাহা দেহগত নহে, তাহা আত্মগত।" শ্রীধর-স্বামী এই শ্লোকটির আর একরূপ অর্থও করিয়াছেন। তাহা এই—'যখন মানুষের অবিবেকের বা অজ্ঞানের অবস্থা সে সময়ে দেহ ধ্বংস হইতেছে দেখিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আশা

করে। এই জীবতাশা বিবেকী বা জ্ঞানী ব্যক্তির প্রীতির বিষয় যদিই বা হয় তাহা হইলেও আত্মার ন্যায় প্রীতির বিষয় হয় না। অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী তাঁহার দেহ যাইতেছে, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে দেহ থাকুক, এবং এই যে ইচ্ছা বা দেহপ্রীতি অবিবেকীর ন্যায় হইলেও তাঁহার ইহা দেহের জন্য নহে, আত্মার জন্য।" "অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে নিজের আত্মাই সর্ব্বদেহীর প্রিয়তম। এই চরাচর জগৎ সমস্তই আত্মার জন্য প্রিয়।" এইবার শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেছেন। তাঁহাকে কিরূপে দেখিতে হইবে। সাধারণ মানুষ বলিবে তিনি আমাদের ন্যায় দেহী। তিনি একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষমাত্র। ভাগবত বলিতেছেন ইহা ভুল। "কৃষ্ণকে যাবতীয় আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবেন। তিনি জগতের মঙ্গলার্থ মায়াযোগে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।" তাহা হইলে দেখা গেল যে দেহের সঙ্গে আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার বা প্রকৃত জীবের যে সম্পর্ক, এই আত্মার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্পর্ক।

চরাচর প্রিয় আত্মার জন্য।

কৃষ্ণ যাবতীয় আত্মার আত্মা। কৃষ্ণের জন্য আত্মাপ্রিয়।

তাহার পর এই প্রসঙ্গে ভাগবতকার আরও অনেক কথা বলিতেছেন, যাঁহারা সত্য সত্য ভাগবত-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে চাহেন পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি তাঁহাদিগকে বিশেষ ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইল যে, দেহকে আমরা যে ভালবাসি তাহা আত্মার অধ্যাসের জন্য অর্থাৎ আত্মার জন্যই দেহ প্রিয় অর্থাৎ দেহ যে নাই তাহা নহে, কিন্তু দেহের এই যে থাকা বা প্রিয় হওয়া ইহা আত্মার দ্বারাই সাধিত হইতেছে। অনেকে মনে করে আত্মা বলিলে দেহ নহে এমন একটা কিছু বুঝিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, দেহের যাহা সত্য তাহা আত্মা। সেইরূপ আত্মার আত্মা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বলিলে এই সমস্ত দেহ-ব্যতিরিক্ত একটা কিছু মনে করাও ভুল। এই তত্ত্বটুকু বড়ই কঠিন, বেশ ধীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

দেহের যাহা সত্য, তাহা আত্মা; আত্মার যাহা সত্য, তাহা কৃষ্ণ।

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥"

কৃষ্ণ সকল জগতের কারণ। (আত্মার আত্মা বলিলে কেহ যেন মনে না করেন যে জড় বস্তু বলিয়া একটা পৃথক জিনিস আছে কৃষ্ণ তাহা নহেন ; যেমন অবিবেকগণ বলেন তিনি "চৈতন্য স্বরূপ") এই তত্ত্ব যিনি জানেন তাঁহাদিগের পক্ষে চরাচর ভগবদ্রূপ। তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই।" এই তত্ত্বটুকু পরের শ্লোকে আরও ভাল করিয়া ব্যক্ত করিতেছেন।

"সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্॥"

কার্য্য কারণে আছে—কৃষ্ণ সর্ব্বকারণ কারণ—অতএব সকল কার্য্য কৃষ্ণে সত্যরূপে বিরাজিত।

সকল বস্তুর পরমার্থ (The Real Self) কারণে অবস্থিত। (মূলে আছে ভবতি: শ্রীধর স্বামী ইহার অর্থ করিতেছেন। ভবৎ=পরিণামং প্রাপ্নুবৎ=কারণং--তস্মিন্। যাহা পরিণাম তাহা পরিণামীতেই আছে। Becoming Beingএর মধ্যে আছে) কৃষ্ণ সেই কারণেরও কারণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। He is the unity of all things and beings, there is no negation.

এই যে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম হইতেই এই তত্ত্বের দিকে ঈঙ্গিত করিতেছেন। এই জন্যই আমরা প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে দশমস্কন্ধের শ্লোকের আলোচনা করিলাম। এইবার আলোচ্য শ্লোকটির তাৎপর্য্য বিশদরূপে আলোচনা করা যাউক।

ভক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন এই ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্তা এবং বেদান্ত-শ্রবণের দ্বারা ইহার দৃঢ়তা সাধিত হয়। আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ভক্তি মানবের একটি মৌলিক বৃত্তি অর্থাৎ ইহা অজন্যা, আরও বলা হইয়াছে যে, ভক্তিতে জ্ঞান ও

ভক্তি অজন্যা।

কর্ম্ম এই দুইটি সাধন পথ সমন্বয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত ভক্তি যাহা, তাহার আদর্শই মানবের পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম এবং শ্রীমদ্ভাগবত সেই আদর্শই প্রদান করিয়াছেন। বেদান্ত শ্রবণের দ্বারা ভক্তি জন্মায়

বেদান্ত-শ্রবণের অর্থ।

না, তবে দৃঢ়ীকৃত হয়। এক্ষণে চিন্তা করিতে হইবে এই শ্রবণ কি? আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিচার ও তর্কই বুঝি বেদান্ত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বেদের যাহা শিরোভাগ বা উপসংহার তাহার নাম বেদান্ত The conclusious of the Vedas. বেদ অর্থে অপৌরুষেয় জ্ঞান, যাহার উপর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই বেদবিহিত অনুশীলন করিয়া যাঁহারা উন্নততর স্তরে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সমূহই বেদান্ত। এই বেদান্ত-শ্রবণ শ্রদ্ধার সহিত সাধুসজ্জনের নিকট করিতে হইবে, উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য। "শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে হইবে" বলায় শ্রদ্ধাবৃত্তির আবশ্যকতা যে সর্ব্ব প্রথমে এই কথা বলা হইল। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই শ্রদ্ধা ভক্তিরই প্রাথমিক অবস্থা। শ্রদ্ধার সাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই ধর্ম্মহীনতা, ভোগপরায়ণতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার যুগে শ্রদ্ধাবৃত্তির অভাব অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছে। শৈশব হইতে যাহার চিত্তে শ্রদ্ধাবৃত্তির বিশেষ অনুশীলন না হয়, ভক্তিপথের পথিক হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। ভক্তিশাস্ত্রের মহত্ত্ব অনেকেই হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারেন না, কারণ শ্রদ্ধার অভাব। আমি বুঝি, আমি পণ্ডিত এই প্রকারের ভাব যাহাদের চিত্তে দৃঢ় তাহারা ভক্তিরাজ্যের কোমল মধুর অনুভূতি লাভ করিতে পারে না।

শ্রদ্ধা ভক্তিরই প্রাথমিক অবস্থা।

শ্রদ্ধা-ব্যতীত কিছুই হয় না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ কৃপায় লভে ভক্তি-লতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়,
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥

ভক্তিবীজ গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় লভ্য।

শ্রবণ-কীর্ত্তন জল-সিঞ্চন।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ।

ভক্তি-লতা বিকাশের অন্তরায়।
১। বৈষ্ণব অপরাধ।

তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন
কৃষ্ণ-চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাথা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে; তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতী যৈছে না হয় উদ্গম॥

২। উপশাখা
ক। ভুক্তি-মুক্তি ইচ্ছা।
খ। অসদাচার
গ। দোষ দর্শনের অভ্যাস বা অতি-সমালোচনা প্রবৃত্তি।
ঘ। হিংসা।
ঙ। লাভ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥
এইত পরমফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥”

উদ্ধৃত অংশে শ্রীশ্রীচরিতামৃতকার বলিলেন যে ভক্তিলতার বীজ শ্রবণ কীর্ত্তন জলে সেচন করিতে হইবে ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের

"শ্রুতগৃহীতয়া" এই পদটীর অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত আর দুইটি কথা বলিলেন জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্তা। পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে তৎক্ষণাৎ বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান হইবে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিলেন, "বৈষ্ণব অপরাধ" 'হাতির মাথা' এই মাথা ভক্তিলতাকে ছিঁড়িয়া দেয় এবং অনেক সময়ে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলে। 'বৈষ্ণব অপরাধ' হয় কেন ? শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভাবেই তাহা হইয়া থাকে। এ কালের লোকের চরিত্র ও মনোভাব আলোচনা করিলে ইহার তাৎপর্য্য বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্ম-সাধনার পথে অহঙ্কার অতি প্রধান অন্তরায়, ইহা এত সূক্ষ্মভাবে থাকে যে তাঁহাকে ধরা ও উৎপাটন করা বড়ই কঠিন। ইংরাজীতে বলে Tendency to self-reference. ধর্ম্মজীবনের সামান্য আভাস পাইবার মাত্র আমরা নিজেদের সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করি এবং অন্যান্য ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ বা ভক্তগণ যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা হয়ত উন্নততর স্তরে অবস্থিত, এমন কি তাঁহাদেরও কোন ভাব বা ক্রিয়া যদি আবোধ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া থাকি, এই এক অতি প্রধান বিপদ। শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য ও জ্ঞান, এই তিনটির সাধন সর্ব্বদা অত্যন্ত যত্নশীল হইয়া করিতে হইবে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অন্তর্মুখী হইয়া অতীব গভীর ভাবে নিজের হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিতে হইবে যে এই তিনটির প্রতি অমনোযোগী হইয়া পড়িতেছি কিনা। তাহার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি উপশাখা সমূহও এই ভক্তিলতার বৃদ্ধির অন্তরায়, আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে শ্রদ্ধান্বিত ভাবে বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনা করিলে এই সমস্ত উপশাখার হস্ত হইতেও আমরা পরিত্রাণ পাইব।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বেদান্ত-শ্রবণ জ্ঞান ও বৈরাগ্য সর্ব্বথা আশ্রয়ণীয়।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ভক্তিসাধনার এই উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া যে কোন ব্যক্তি ধন্য হইতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষকে কেবল মাত্র উপদেশ দেওয়াই তো যথেষ্ট নহে। সামা-

উপযুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা ব্যতীত ভক্তি-সাধনা হয় না।

জিক ব্যবস্থা যগুপি এই অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল না হয়, তাহা হইলে সাধারণ একজন মানুষ নিজের চেষ্টায় এই পথে সকল সময়ে অগ্রসর না হইতেও পারে; যেমন একটি শিশুকে যদি কেবল বলা যায় যে তুমি এই কার্য্য এই এই ভাবে করিবে, এইরূপ উপদেশ দিলে শিশু কি তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে? শিশু তাহা পারে না। আমরা মানুষ, একালে অত্যন্ত অহঙ্কারী হইয়া পড়িয়াছি, আমরা মনে করি যে আমরা বাহিরের কোনরূপ বাধ্যতা বা বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকেও নিজেদের মঙ্গলসাধন করিতে পারি। এই প্রকারের ধারণা যে প্রায় সবই ভুল ইহা একটু সরলচিত্তে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং সামাজিক ব্যবস্থার সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। এখন, সে সমাজ কোথায়? যে সমাজের বিধি, ব্যবস্থা, আচার, সংস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়া চিত্তবৃত্তির অনুশীলন হইলে পর জীবনের যে লক্ষ্যের কথা বলা হইল মানব তাহা পাইতে পারে, যে সমাজ মানবকে পঞ্চমপুরুষার্থস্বরূপ এই যে প্রেমভক্তি ইহা লাভ করিবার উপযুক্ত করিতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবতকার উত্তর দিলেন বর্ণাশ্রমাচারই সেই ব্যবস্থা। যে সমাজে বর্ণাশ্রম প্রচারিত হইয়াছে, সেই সমাজই এই অনুশীলনের উপযুক্ত ও অনুকূল ক্ষেত্র। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন বটে, কিন্তু এমন কথা বলেন নাই যে বর্ণাশ্রমাচার যেখানে নাই সেখানে এই ধর্ম্ম হইবে না। এই মাত্র বলিলেন প্রকৃত বর্ণাশ্রম, যাহা মানব সকল সময়ে ঠিক বুঝিতে পারে না, তাহার লক্ষ্য এই প্রেমভক্তি। বর্ণাশ্রমাচারই সুগম ও উৎকৃষ্ট পথ। কেবল তাহাই নহে, সুনিশ্চিত পথ। অন্যান্য পথে হয়ত কাহারও হইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত তাহা আলোচ্য নহে। কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে উপলক্ষে বা উপায়ে এতাদৃশ আত্মহারা হইয়া পড়ে যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য একেবারে ভুলিয়া যায়, সে সময়ে সেই লক্ষ্যটি বিশেষ ভাবে প্রচার করা, সেদিকে মানুষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়েও আমাদের দেশে

বর্ণাশ্রমাচার সেই সামাজিক ব্যবস্থা।

বর্ণাশ্রম প্রেম ভক্তির সুগম ও উৎকৃষ্ট পথ।

বর্ত্তমান যুগের সমস্যা—দুইদল চরম-পন্থী।

ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। একদল লোক বর্ণাশ্রম ভাঙিবেন, আর একদল বর্ণাশ্রমের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া গায়ের জোরে তাহা রাখিবেন। এই দুইদলই ভ্রান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত যেন এই উভয় দলের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন করিয়া মানবকে ও জগৎকে প্রকৃত কল্যাণে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকটি এই।

ভাগবতে দুই দলের সন্ধি-স্থাপন।

"অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং॥"

শ্রবণাদির দ্বারা গৃহীত যে ধর্ম্ম তাহার ফল ভক্তি—অর্থ কামাদি নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক সমূহের দ্বারা এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিতেছেন—অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! লোকে বর্ণাশ্রমের বিভাগানুসারে যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তদ্দ্বারা হরির তুষ্টি লাভ করিতে পারিলেই তাহা সার্থক।

হরিতোষণ বর্ণাশ্রমের লক্ষ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত যেন একটি তুলাদণ্ড দিলেন। আমরা যে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করি না কেন, কেবল মাত্র বাহির হইতে তাহা উত্তমরূপে সাধিত হইয়াছে কি না ইহা বুঝিতে পারা যায় না, এই হরিতোষণ বা হরি-ভক্তিলাভ তাহার তুলাদণ্ড, এই তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তাহার সংসিদ্ধি নিরূপিত হইয়া থাকে।

এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত সূত্ররূপে সংক্ষেপে যাহা বলিলেন সপ্তম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত নারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে তাহা বিশদরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা যদি এই পাঁচটি অধ্যায় আলোচনা করি, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বুঝিতে পারিব।

প্রথম কথা এই যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। মনুষ্যদিগের স্বভাবানুসারে এই ধর্ম্ম যুগে যুগে বিহিত হইয়াছে। চিত্ত স্বভাবতঃ কাম-বাসনাময়। এই কাম-বাসনাময় চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া মানবকে নৈর্গুণ্যে লইয়া যাইতে হইবে, ইহাই সামাজিক ব্যবস্থার

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সনাতন।

জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কর্ম্মের সাহায্যে ক্রমোন্নতি-সাধন ইহার লক্ষ্য।

লক্ষ্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তাহাই করে। এই বর্ণাশ্রমাচারে মানব স্বভাব-বিহিত বৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক নিজের কর্ম্ম করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বভাবত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে ও নিগুর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জন্মান্তরবাদ, কর্ম্ম ও জন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীবের ক্রমিক উন্নতি এই তিনটি তত্ত্ব বর্ণাশ্রমবিভাগের ভিত্তিমূলে অবস্থিত।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও সংযমের মধ্য দিয়া জগতের জন্য বা সমাজের জন্য জীবন ধারণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ এই বর্ণাশ্রমের বিধানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সংযমের মধ্য দিয়া প্রত্যেক মানবকে কেবলমাত্র নিজের সুখ, সুবিধা বা ভোগ-বাসনার চরিতার্থতার জন্য নহে, পরন্তু সমাজের জন্য এবং জগতের জন্য জীবন ধারণ করিতে হয়। প্রকৃত মানবত্ব ত্যাগে, ভোগে নহে ; আত্ম বিসর্জ্জনে, আত্মপুষ্টিতে নহে। এই বিধান গৃহস্থকে উপদেশ দেন যে, যে পরিমাণ ধনাদিতে উদর পূর্ত্তি হয়, তাবন্মাত্রেই দেহীদিগের স্বত্ব। যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক দ্রব্যের অভিলাষ করে সে চৌর, সুতরাং দণ্ড পাইবার যোগ্য। সুতরাং জগতের জগতের বৈষম্য ও প্রতি-দ্বন্দ্বীতা দূর করিয়া মানব সমাজে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ এই বর্ণাশ্রম।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে বর্ণাশ্রম ভক্তি-সাধনার ভিত্তি।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমের বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু এ জন্য আমরা প্রকৃত বর্ণাশ্রমাচারকে যেন পক্ষপাতদুষ্ট বা বর্ণ বিশেষের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় গঠিত বলিয়া বিবেচনা না করি। শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রকৃত বর্ণাশ্রমের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সহিত মর্ম্মী ও রসিক ভক্ত রায় রামানন্দের যে কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রমাচারকেই অধ্যাত্ম সাধনার প্রথমস্তর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গৃহস্থের পক্ষে ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে নারদের উপদেশ।

পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের যে দুইটি শ্লোক বলা হইল, তাহার পর ভাগবত বলিতেছেন যে ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মই যখন প্রয়োজন, ভক্তি-হীন যে ধর্ম্ম, তাহা যখন পণ্ডশ্রমমাত্র, তখন সাত্বতপতি যে ভগবান্, একাগ্রচিত্তে তাঁহার কথা শ্রবণ করা, তাঁহাকে ধ্যান করা ও তাঁহার পূজা করা একান্তভাবে প্রয়োজন। সপ্তম স্কন্ধে দেবর্ষি

নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এই উক্তির বিস্তৃতি মাত্র। নারদ বলিয়াছেন :—গৃহস্থ-ব্যক্তি কৃষ্ণার্পণপূর্ব্বক যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া, যথা-কালে মহর্ষিগণের উপাসনা করিবে এবং সর্ব্বদা অমৃত স্বরূপ ভগ-বানের অবতার-কথায় অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শান্ত-দান্ত জনগণে বেষ্টিত হইয়া থাকিবে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় ও সত্য বলিয়া মনে হয়, জাগরণে তাহা আপনা আপনি চলিয়া যায়, তদ্রূপ শান্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গ করিলে দেহ ও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি যে অত্যধিক স্নেহ তাহাও আপনা হইতে চলিয়া যায়। যে পরিমাণ প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ বিষয়সেবা করিয়া অন্তরে দেহের ও গৃহের প্রতি বিরক্ত হইবে এবং বাহিরে আসক্তবৎ আচরণ করিয়া লোকমধ্যে পৌরুষ প্রকাশ করিবে। কুত্রাপি আগ্রহ করা উচিত নহে। জ্ঞাতিগণ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃদ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহা বাঞ্ছা করে, তাহাতেই আমোদ করিবে, কিছুতেই মমতা রাখিবে না, এই প্রকারে নারদ যে উপদেশ দিয়াছেন, গৃহস্থের পক্ষে তাহাই ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

বর্ণাশ্রমের ইহাই বিধান।

ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-বিষয়ক উপদেশে প্রথম কথা বলিলেন ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। পরের শ্লোকে এই শ্রবণের ফল কি তাহাই বলিতেছেন।

হরি-কথা শ্রবণের ফল।

"যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্ম-গ্রন্থি-নিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিং॥"

ভগবানের অনুধ্যানরূপ যে খড়্গ সেই খড়্গাযুক্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ বিবেকীগণ অহঙ্কারের বন্ধন ও কর্ম্ম এতদুভয়কে ছিন্ন করিয়া থাকেন, অতএব কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানের কথায় না রতি করিবেন?

শ্রবণের মধ্যেই অনুধ্যান রহিয়াছে। কেবল শুনিয়া হয় না। শ্রুতবাক্যের অর্থ গ্রহণের জন্য মনকে ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়, এই

শ্রবণ অনুধ্যান যুক্ত হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়।

যে মানসিক ক্রিয়া ইহার নাম অনুধ্যান। আমরা সর্ব্বদা মূল্যহীন অসার কথা শ্রবণ করিতেছি, ফলে ক্রমে ক্রমে অসার বিষয়ে বদ্ধ হইয়া অবনতির দিকেই ধাবিত হইতেছি। অসার বিষয় শ্রবণ ও আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া যদ্যপি সৎশাস্ত্র, বিশেষতঃ শ্রীভগবানের লীলা-কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, তাহা হইলে ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আসিবে, নির্ম্মল চিত্তে সত্যের প্রকাশ হইবে এবং আমরা ধন্য হইব, এই জন্য মঙ্গললাভের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায় এবং যাহা আমরা অনায়াসেই আশ্রয় করিতে পারি, শ্রীমদ্ভাগবতকার আমাদের জন্য—তাহারই ব্যবস্থা করিলেন।

শুদ্ধচিত্তে সত্যের প্রকাশ।

এখন কথা হইতেছে যে হরি-কথায় রতি কর্ম্মনির্ম্মূলনী তাহা সত্য, কিন্তু কথায় রতি জন্মায় কৈ? এই প্রশ্ন কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে নহে, চিরদিনই সাধকগণের চিত্তে উদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ইহার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হরি-কথায় রতি জন্মাইবার উপায়।

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধূনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

১। তীর্থসেবা।
২। সাধুসেবা।

হরি কথায় যদ্যপি রতি না হয় তাহা হইলে পবিত্র তীর্থের সেবা

করিতে হয়, মহতের সেবা করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রদ্ধা জন্মে, শুনিতে ইচ্ছা হয় এবং ক্রমে বাসুদেব কথায় রুচি হয়। ভাগবতী কথায় রতি হইলেই সকল অশুভ বিদূরিত হয়, কারণ যাঁহারা হরি কথা শ্রবণ করেন সাধুগণের সুহৃৎ হরি তাঁহাদের হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহাদের কামাদি বাসনারূপ বাহ্য ও আন্তরিক যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করেন। নিত্য ভাগবত সেবা দ্বারা সেই সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হইলে পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। তখন রজঃ ও তমোগুণ জন্য কামলোভাদি চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না, অন্তঃকরণ সত্বগুণে অবস্থিত ও প্রসন্ন হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তিযোগে মন এইরূপে প্রসন্ন হইলে সংসারপাশ হইতে মনুষ্য মুক্ত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার অহঙ্কার নষ্ট হয়, সকল সংশয় দূরীভূত হয় এবং কর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মত ও চতুর্দ্দশ সোপান।

পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য্যস্বরূপে চতুর্দ্দশটি সোপান আচার্য্যগণের উপদেশানুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সোপান কয়টী এই। ১। সাধুদিগের কৃপা ২। মহৎসেবা ৩। শ্রদ্ধা ৪। গুরুপদাশ্রয় ৫। ভজনে স্পৃহা ৬। ভক্তি ৭। অনর্থাপগম ৮। নিষ্ঠা ৯। রুচি ১০। আসক্তি ১১। রতি ১২। প্রেম ১৩। দর্শন ১৪। মাধুর্য্যানুভব।

হরি-কথায় রুচি প্রথম। সাধুসঙ্গ ও চিত্তশুদ্ধি।

পূর্ব্বের ছয়টী শ্লোকের দ্বারা ভাগবতধর্ম্মের সাধন আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা হইল। হরিকথায় রুচি সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। কথায় রুচি হইলে সাধুসঙ্গ, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। লোকে শুনিতে চায় না, কর্ণ ও হৃদয় রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ অহঙ্কারের দুঃস্বপ্ন লইয়া আমরা বসিয়া আছি। দুঃখ সকলেরই আছে, অভাব সকলেরই আছে এবং এই দুঃখ ও অভাব দূর করিবার জন্য আমরা কত লোকের শরণাপন্ন হইতেছি কত প্রকারের উপায় অবলম্বন করিতেছি, নানা কথায় জগতের বায়ু-মণ্ডল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রুচির সহিত ভগবানের কথা কথা কেহ শুনিতে চায় না। ইচ্ছা করিয়া যে মনুষ্য শুনিতে চাহে

না তাহাও ঠিক নহে, রুচি নাই অর্থাৎ তাহা ভাল লাগে না! প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের কথাই একমাত্র সত্য কথা, অন্য কথায় যে সত্য নাই তাহা নহে, কিন্তু সে সকল কথায় সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; কেবল তাহাই নহে অন্যান্য কথায় যে সমস্ত সত্য আছে তাহা পারমার্থিক সত্য নহে, ব্যবহারিক সত্য। ভগবানের কথা ব্যতীত অন্য কথায় আমাদের কোন সমস্যারই মীমাংসা হয় না, হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। কিন্তু তবু আমাদের ভগবানের কথায় রুচি নাই। যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট, যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর তাহা খাইবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হয় না। ইহা আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

হরিকথা ব্যতীত হৃদয়ের তৃপ্তি নাই; জীবন-সমস্যার মীমাংসা নাই।

এখন এই রুচি উৎপাদনের সুগম উপায় কি? শ্রীজীব গোস্বামী এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সুগম উপায় তীর্থগমন। তাহার কারণ প্রায়স্তত্র মহৎসঙ্গো ভবতি অর্থাৎ তীর্থে গমন করিলে প্রায়ই সাধুসঙ্গ লাভ করা যায়। সাধুসঙ্গ হইলেই কোন না কোন রূপে সাধুসেবার সুবিধা ঘটে। যেমন ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামী বলিতেছেন "কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বতএব সংপদ্যতে। তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি। তদীয় স্বাভাবিক পরস্পর ভগবতকথায়াং কিমেতে সঙ্কথয়ন্তি তৎশৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে। তচ্ছ্রবণেন চ রুচির্জায়তে ইতি। অথাচ মহত্ত্ব এব শ্রদ্ধা ঝাটিতি কার্য্য করোতি ভাবঃ। যথা শ্রীকপিল দেববাক্যং—

রুচি উৎপাদনের উপায়—তীর্থ-গমন।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃতকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

অর্থাৎ নানাকর্য্যব্যপদেশে সাধুগণ প্রায়ই তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কখন কখন বাস করিয়াও থাকেন। সেবা নানারূপ ; দর্শন, স্পর্শন বা সম্ভাষণাদি দ্বারা আপনা হইতেই সাধিত হয়। এই সেবার প্রভাবে সাধুগণের আচরণে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। সাধুগণ পরস্পর ভগবৎ-প্রসঙ্গই আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহাদের এই প্রসঙ্গ অল্প শুনিলেই তাঁহারা কি কথা কহিতেছেন, একটু শোনা যাউক, এইরূপ ইচ্ছা হয়। তাহার পর, সেই কথা শুনিলে সেই কথায় রুচি হয়। মহতের নিকট হরি-কথা শুনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে, শ্রীকপিলদেবও এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্ট-রূপ সঙ্গ হইলে ভগবানের মহিমা ও করুণার কথা শুনিতে শুনিতে সঙ্গে সঙ্গেই অপবর্গবর্ত্মে শ্রদ্ধা ও রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে।"

তীর্থে সাধু-সঙ্গ ও সাধুসেবা।

সাধুদের আলাপে রুচি, শ্রদ্ধা ও রতি।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র আরাধ্যরূপে শ্রীভগবান্ বাসুদেবকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমে এই কথাটি শুনিলে সাধারণ মনুষ্য বিবেচনা করিবে যে তাহা হইলে ভাগবতকার একটি সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিলেন। একে বহু সম্প্রদায়ের কলহ ও প্রতীদ্বন্দ্বীতায় জগৎ অশান্তিকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর আবার এই এক সম্প্রদায়ের মত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত কোন সাম্প্রদায়িক মত প্রচার করেন নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কেবল বাক্য লইয়াই বিব্রত থাকি, ততক্ষণ বক্তার সহিত মিলন অসম্ভব। বাক্য শুনিয়া যদি বাক্যের অর্থের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে মিলনের ও বিশ্বজনীনতার ভূমি দেখিতে পাইব। পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্য্য সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, যে যুগে এবং যে আদর্শ লইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের আবির্ভাব, সেই যুগ ও সেই আদর্শ আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে এ বিষয়ে

ভাগবতের উপাস্য বাসুদেব।

বাসুদেবতত্ত্ব, অসাম্প্রদায়িক।

ভাগবতের যুগ ও আদর্শ।

বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছি, আর একবার তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া সঙ্গত। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটি অতি প্রধান ঘটনা; এই মহাযুদ্ধের পর চিন্তাশীল ভারত-বাসীগণের চিত্ত এক দারুণ সন্দেহ-দেলায় আলোড়িত হইতেছিল। মানুষকে ভগবানের জন্য জীবনধারণ করিতে হইবে, ভগবান্ লীলাময়, তিনিই একমাত্র কর্ত্তা এই অনুভূতিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার জন্য জীবনধারণ করিতে হইবে। জীবনের এই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—এই সকল কারণে কবিগণ অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বারা যাঁহারা সত্য প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারা, পরম আনন্দসহকারে ভগবান্ বাসুদেবে মনঃসংশোধনী ভক্তি করিয়া থাকেন।

প্রাচীন আচার্য্যগণের মতানুযায়ী শ্লোকটির বিস্তৃত তাৎপর্য্য এই। শাস্ত্রের কথা বলা হইল। তাহাতে দেখা গেল যে সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা ও সাধুমুখে শ্রীভগবানের কথা শুনিয়া সেই কথায় রুচি-লাভ করাই আমাদের প্রথম কার্য্য। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে অনেক পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে, কিন্তু এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম! কেবল শাস্ত্র যে এই কথা বলিয়াছেন তাহা নহে! এই পথ সদাচারসম্মত। চিরদিন কবিগণ এই পথ আশ্রয় করিয়াছেন! যে পথ শাস্ত্র ও সদাচারসম্মত, তাহা নিশ্চয়ই আশ্রয়-নীয়। তাহা ছাড়া আরও কথা আছে। ধর্ম্মজীবনের পথ আমরা সর্ব্বদাই অত্যন্ত কষ্টকর পথ বলিয়া বিবেচনা করি। সাধারণতঃ মানুষ ধর্ম্মের নামে যে টুকু করে, সে টুকু হয় যমদূতের বা নরকযাত-নার ভয়ে অথবা সহজে স্বার্থসাধন হইবে, এই প্রকারের লোভের প্রেরণায়। কিন্তু এই যে ধর্ম্ম ইহা প্রকৃত ধর্ম্মপদবাচ্য নহে। ধর্ম্মপথ কষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করা অজ্ঞানতার ফল। ধর্ম্মজীবনের পথ আনন্দে পরিপূর্ণ। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কষ্টকর, তবে শেষফল সুখকর, কিন্তু তাহা নহে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানও সুখকর, শেষফলও সুখকর। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী

ধর্ম্মপথ কষ্টকর নহে।

বলিতেছেন "কর্ম্মানুষ্ঠানবন্ন সাধনকালে সাধ্যকালে বা ভক্ত্যনুষ্ঠানং দুঃখরূপং। প্রত্যুত সুখরূপম্ এব।" কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় ভক্তির অনুষ্ঠান সাধনকালে বা সাধ্যকালে দুঃখরূপ নহে পরন্তু সুখরূপ। অবশ্য সাধারণতঃ আমরা যাহাকে সুখ বা আরাম বলি, সে প্রকারের সুখ নহে, কারণ সে সুখ তো সংস্পর্শজ এবং তাহা দুঃখের সোপান-মাত্র। এ সুখ আত্যন্তিক, অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও শাশ্বত।

সুখকর।

বলা হইল যে মনঃসংশোধিনী ভক্তি ভগবান্ বাসুদেবে করা হইয়া থাকে। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিজের উপাস্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভব করিয়াছে। উপাস্য যে কোনও প্রকার হইলেই তাহাকে ভক্তি করা যায় না। হৃদয়ের মধ্যে ভক্তির উদ্রেক করিয়া সেই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতে পারেন, উপাস্যের মধ্যে সেই সমস্ত কল্যাণ-গুণ আছে, উপাসকের অন্তরে এরূপ প্রতীতি থাকা চাই; যেমন 'ভালবাস' বলিলেই অমনি একজনকে ভালবাসা যায় না, ভয়ে বা লোভে ভালবাসা যায় না, সেইরূপ ভক্তি কর বলিলেই ভক্তি করা যায় না। 'বাসুদেব ভগবান্' বলিলে সেই পরমার্থ-তত্ত্বের এমন কতকগুলি লক্ষণ বা ধর্ম্ম সূচিত হইয়া থাকে যে সেই লক্ষণগুলি গূঢ়রূপে চিন্তা করিলে বা সত্য করিয়া বুঝিলে মানুষ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত ক্রমে ক্রমে আমাদের সহিত সেই পরমার্থতত্ত্বের পরিচয় সাধন করিয়া দিবেন। পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে তাহারই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা করিতেছেন

উপাস্যের প্রকৃতিভেদ ও উপাসকের ভাবভেদ।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃপুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥"

যদিও এক পরমপুরুষ, প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি এবং হর

বাসুদেব সত্ত্ব-মূর্ত্তি।

এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ধারণ করেন, তথাপি সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতেই মনুষ্যদিগের শ্রেয়ঃ বা মোক্ষ হয়।

শ্রীধরস্বামী বলেন যে ব্রহ্মাদি ত্রিদেব একাত্মা হইলেও বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সত্ত্বতনু। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ একটু অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যাখ্যা ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে সামান্য প্রভেদ আছে। যাহা হউক এই উভয় ব্যাখ্যার সাহায্যে আমরা ভাগবতধর্ম্মের উদারতা ও বিশ্বজনীনতা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিব। শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার তাৎপর্য্য এই।

"না পূজিবে অন্য দেবী দেবা" ইহার প্রকৃত অর্থ।

বলা হইল যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বিষয়ে যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তিই করণীয়া। কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্য যে কিছুই নহে, এমন কথা বলা হয় নাই। এইমাত্র বলা হইতেছে যে এজন্য যে যত্ন, যে চেষ্টা করা হইয়া থাকে তাহা না করিয়া যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলে কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের যাহা উদ্দেশ্য তাহাও সুন্দররূপে সিদ্ধ হইবে। প্রেম বা সেবাও এক অর্থে কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু এখানে কর্ম্ম বলিতে দেবতার উপাসনা বুঝিতে হইবে না। শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টই বলিলেন, "দেবতান্তর ভজনমপি ন কর্ত্তব্যম্ ইত্যাহ সপ্তভিঃ।" সপ্ত শ্লোকে বলিলেন অন্য দেবতার পূজা কর্ত্তব্য নহে। * অন্য দেবতার কথা কি, ভগবানের গুণাবতার যে বিষ্ণু তাঁহার পূজা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ তাঁহাতেও পরব্রহ্মের অভাব রহিয়াছে। প্রথমতঃ যাঁহারা শ্রেয়ঃপ্রার্থী, তাঁহারা রজঃগুণের অবতার ব্রহ্মা ও তমঃগুণের অবতার শিব, ইঁহাদের ভজনা করেন না (পরমতত্ত্ব বুদ্ধিতে)। অবশ্য পুরুষ এক বই দুই নহেন, সেই এক পরম পুরুষই এই বিশ্বের স্থিতি,

* একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। গৌড়ীয় আচার্য্যগণের দেবতান্তর-পূজা নিষেধ ও এককালে পৌত্তলিকতা-বিনাশ এক জিনিস নহে। সংক্ষেপে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বোধ হয় এই যে প্রথমটি হিন্দুসাধনার ভিতর হইতে এবং অপরটি বাহিরের অনুকরণ হইতে সঞ্জাত। ফলেও প্রভেদ আছে।

সৃষ্টি ও লয়ের জন্য যথাক্রমে সত্ত্ব ও রজঃ ও তমোগুণে'যুক্ত হইয়াও স্বরূপতঃ তৎসমুদয় গুণের দ্বারা অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া হরি, বিরিঞ্চি, হর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ধারণ করেন অর্থাৎ সেই সেইরূপে আবির্ভূত হয়েন। এই ত্রিদেবের মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ভক্তি প্রভৃতি শুভ ফলসমূহ, শ্রীবিষ্ণু হইতেই হয়, কারণ তিনি সত্ত্বতনু, সত্ত্বশক্তিতে অধিষ্ঠিত। (তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এই ত্রিদেবের উপাসনা দুই প্রকারে হইতে পারে, এক উপাধিদৃষ্টিতে আর এক তত্ত্বদৃষ্টিতে। উপাধিদৃষ্টিতে ভজনা করিলেই দেবতান্তরের ভজনা হয়, কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে ভজনা করিলে পরম পুরুষের ভজনা হয়।) ব্রহ্মা ও শিব, রজঃ ও তমোগুণের এই দুই গুণাবতারের যদ্যপি উপাধি-দৃষ্টিতে সেবা করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, তাহা ঘোরত্ব ও মূঢ়ত্ব এই উভয় গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অতিসুখকর হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সাধিত হইতে পারে, মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু কামনাপূর্ত্তি হইতে উদ্ভূত যে সুখ তাহা স্থায়ী হইবে না। এই সুখ কখন (অর্থাৎ রজোগুণের স্পর্শ থাকিলে) অহঙ্কারে চিত্তকে উদ্ধত করিয়া দিবে এবং অপরের অনিষ্টসাধন আদি অপকর্ম্ম ও অমঙ্গল জন্মাইবে; আবার এই সুখ কখন (অর্থাৎ তমোগুণের স্পর্শ থাকিলে) মোহ আনয়ন করিবে। উপাধি পরিত্যাগ করিয়া যে সেবা তাহাতে মোক্ষ হয় সত্য, কিন্তু এ প্রকার সেবার হঠাৎ সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া ঈষৎ উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত ভজনা হয় না। শ্রীবিষ্ণুর সেবা উপাধিদৃষ্টিতেও যদি করা যায়, তাহা হইলে যে ধর্ম্ম অর্থ কাম সিদ্ধ হয় তাহা সুখদ, কারণ সত্ত্বগুণ শান্ত। আর যদি নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান হয় বলিয়া সাক্ষাৎ মোক্ষ হইতে পারে, এই জন্যই স্কন্দ-পুরাণ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের দ্বিবিধ উপাসনা
১। তত্ত্ব-দৃষ্টি
২। উপাধি-দৃষ্টি

গুণাবতারের উপাসনা।

বিষ্ণুতে বা বাসুদেবে ঈষৎ উপাধি সম্বন্ধ থাকিলেও নিরাপদ।

বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ।
কৈবল্যদঃ পরংব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতন॥

উপাধি পরিত্যাগে ভক্তি।

উপাধি-পরিত্যাগের দ্বারাই পঞ্চমপুরুষার্থ ভক্তি হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণু পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হয়েন, এই জন্য বিষ্ণু হইতে শ্রেয়ঃ-লাভ হইয়া থাকে। শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়ের টীকার শেষ অংশ-টুকু ধীরভাবে চিন্তা করিলে প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে গুটিকয়েক কথা বা নাম লইয়া বহির্ম্মুখভাবে বিরোধ করিয়া থাকে। সম্প্রদায়সমূহের গতি ও পরিণতি আলো-চনা করিলে হিন্দু সাধনা কেমন করিয়া ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

উপাস্যে পরমাত্মবুদ্ধি, আবশ্যক।

যিনি যে নামে বা যে ভাবেই উপাসনা আরম্ভ করুন না কেন, তাঁহাকে উপাধি পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ যতক্ষণ সাধক তাঁহার উপাস্য দেবতাকে একটি পরিমিত কোন কিছু বলিয়া মনে করিবেন, অন্যের উপাস্য হইতে ও অন্যান্য বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিয়া জানিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যে মন্ত্রই জপ করুন, আর যে কোন অনুষ্ঠানই করুন তিনি পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম, তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবেন না অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মজীবন প্রকৃত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে সফলতা, তাহা লাভ করিতে পারিবে না। শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা, সত্ত্বগুণের উপাসনা। মানুষ না জানিয়াও এই শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনা করিতেছে। যোদ্ধা যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া তবে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ আমরা শান্ত-ভাবে জ্ঞানালোকের সাহায্যে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি। সত্ত্বগুণে চিত্ত অবস্থিত হইলে বিষ্ণু পরমাত্মাকারে প্রকাশিত হয়েন। এই প্রকাশের নাম বাষ্ট্যন্তর্য্যামীরূপে প্রকাশ। তখন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কিছু আছে সমস্তের গুহাশয়স্থিত যিনি, সকলেরই সত্ত্বা ও চৈতন্যের হেতু যিনি, তিনি এক; এই উপলব্ধি মানবের ক্ষুদ্রতা দূর করিয়া দেয়, তাহার চিত্ত প্রসারিত হয়, সে ব্যক্তি বিশ্বপ্রেমের যে সনাতন পথ সেই পথে পদার্পণ করে। এই পথে চলিতে চলিতে উপাধি পরিত্যাগ অর্থাৎ আমার আমিটিকে অন্য সমস্ত হইতে নিত্য-স্বতন্ত্র বলিয়া যে অভিমান, তাহার বর্জ্জন সহজেই হইয়া থাকে।

নামে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

রজোগুণের আশ্রয় লইলে বিক্ষেপ আর তমোগুণের আশ্রয় লইলে আবরণ আসিয়া থাকে। অবশ্য এ কথা একেবারে মিথ্যা নহে যে এই উভয়গুণের মধ্য দিয়াও কালে কখনও নিস্ত্রৈগুণ্যে উপস্থিত হইয়া উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চমপুরুষার্থ যে প্রেম তাহা অর্জ্জন করা যায়। কিন্তু আবরণ বিক্ষেপের মধ্য দিয়া যাওয়ার প্রয়োজন কি? শান্তভাবের আশ্রয় গ্রহণই মঙ্গলের সুগম পথ।

রজোগুণে বিক্ষেপ, তমোগুণে আবরণ।

শান্তভাব গ্রহণীয়।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য যে বাসুদেব-উপাসনা, যাহা প্রারম্ভে বলা হইয়াছে, তাহা শুনিয়া কেহ যেন বিচলিত হইয়া এরূপ চিন্তা না করেন যে শ্রীমদ্ভাগবত কোনরূপ সাম্প্রদায়িক মতের প্রচার করিতেছেন এবং এই গ্রন্থ সম্প্রদায়বিশেষের, অর্থাৎ জগতের বা সকল মানবের নহে। প্রাচীন টীকাকারগণের যে ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে দেখা গেল এই ত্রিগুণের খেলায় সত্ত্বগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে জগৎ হয়ত এমন একটা অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে যাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহারা সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতাস্বীকার করিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবেন না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে তমোগুণ ও রজোগুণ মানব-প্রকৃতিতে অত্যন্ত প্রবল। মানব, ধর্ম্মের নামে যাবতীয় জ্ঞানচর্চ্চাকে অবহেলা করিয়া আলস্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাহে। এক অবস্থায় এরূপ প্রবৃত্তি মানবপ্রকৃতিতে স্বাভাবিকী। এ বড় ভয়ানক অবস্থা। এ অবস্থায় অনেক সময়ে এক বাহ্য শান্তিপ্রিয়তাও আসিয়া থাকে এবং মূঢ়মানব এই শান্তিশীলতাকে মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারে না, মনে করে ইহাই বুঝি সত্ত্বগুণ। মানুষের আর এক অবস্থা আছে, সে অবস্থায় মানুষ তীব্রাপ্রবৃত্তি ও বিক্ষেপকেই ভালবাসে, চঞ্চলভাবে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অতীত বা ভবিষ্যতের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ না রাখিয়া বর্ত্তমানেই আত্মহারা হইয়া যায়। এই অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে বেশ মোহনীয় বলিয়া মনে হয়। তমোগুণ ও রজোগুণ একত্রভয়ের ধ্বংস বা বিনাশের উপর

রজঃ ও তমোগুণের সমন্বয়ে সত্ত্ব।

সত্বগুণের প্রতিষ্ঠা নহে, এইটুকু বেশ দৃঢ়রূপে মনে রাখিতে হইবে— তমোগুণ ও রজোগুণের শাশ্বত সমন্বয়ের নামই সত্বগুণ। চৈতন্যের দিক্ হইতে দেখিলে যেমন সৎ ও চিৎ এই উভয়ভাব আনন্দভাবে পরিণতি লাভ করে, জড়ের দিক্ হইতে বা প্রকৃতির দিক্ হইতে দেখিলে ঠিক সেই রূপ তমোগুণ ও রজোগুণ সত্বগুণে পরিণতি লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবত যখন বাসুদেব-উপাসনার কথা বলিলেন তখন এই সত্বগুণে সমন্বয়ের কথাই বলিলেন, কোনরূপ বর্জ্জন বা সাম্প্রদায়িকের কথা বলেন নাই। আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ যেমন সৎ ও চিৎ বা সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই উভয়শক্তির সমন্বয়-রূপা হ্লাদিনীশক্তির সহিত নিত্যক্রীড়ারত, বাসুদেবও তেমনি ব্রহ্মা ও রুদ্র এই উভয়ভাবের সমন্বয়, বাসুদেবকে ধরিয়া তুরীয় কৃষ্ণে যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী তাহাই করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত ঠিক তাহাই করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোক আবার জ্বলিয়া উঠুক, আমাদের হৃদয় আবার সেই মহামিলনের আনন্দস্বপ্নে বিভোর হইয়া উল্লাসে নৃত্য করুক, অশান্ত ও অজ্ঞান জগতে হে বাসুদেব, তুমি আসিয়া আবার আবির্ভূত হও, আবার নিত্য বৃন্দাবন প্রপঞ্চে প্রকট হউক। বর্ত্তমান জগৎ ঠিক এই ভাগবত-ধর্ম্মই চাহিতেছে। এই ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত বর্ত্তমান জগতের আর অন্য পথ নাই।

সত্ব হইতে আনন্দ, বাসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণ।

প্রকৃতির তিনগুণের মধ্যে সত্বগুণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। সত্বগুণের অভিমুখী না হইলে মানব ভাগবতধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। পুণ-তীর্থে স্নানাদি করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে অমলাত্মা সাধুগণের সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র উপদেশ দিলেন। চিত্তকে সত্বগুণের অভিমুখী করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশ। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ না করিলে কোনই ফল হয় না, শাস্ত্রে এই উপদেশ পুনঃ পুনঃ দেওয়া হইয়াছে।

পুণ্যতীর্থ স্নানে ও সাধুসঙ্গে সত্বগুণের উদয় হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলিলেন :—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ।"

মুমুক্ষু শান্ত ও বাসুদেব উপাসনারত।

এই উভয় শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়টির অর্থ প্রথমে উপলব্ধি করিলে বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

যে সকল ব্যক্তির প্রকৃতিতে রজোগুণ বা তমোগুণের আধিক্য অর্থাৎ যাহারা কাম ও লোভের দ্বারা পরিচালিত, তাহারা ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, এবং পুত্রাদি কামনায় পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতি প্রভৃতির আরাধনা করে। আরাধনকারীর প্রকৃতি যেমন, আরাধ্যের প্রকৃতিও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট ভৈরবাদিকে পরিহার করিয়া অসূয়াশূন্য-চিত্তে শান্ত নারায়ণ-মূর্ত্তিসকলের উপাসনা করেন। "অসূয়াশূন্য-চিত্তে" উপাসনা করেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারা উচ্চাধি-কারী হইলেও কখন অন্যের উপাস্য দেবতার নিন্দা করেন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,

কাহার ও উপাস্যের নিন্দা করিতে নাই।

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই। উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও লোকে একনিষ্ঠ হইয়া স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে পারে না। অনেক সময়েই প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। ইহার কারণ জীব নিজ নিজ প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করে। পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংস্কার, যাহা বর্ত্তমান জীবনে অভিব্যক্ত হয় তাহারই নাম প্রকৃতি। জ্ঞানবান্ লোকেই এই প্রকৃতির সদৃশ কার্য্য করিতেছে, সুতরাং মূর্খের কথা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য কেহ নিষেধরূপ নিগ্রহ করিয়া কি করিবেন? কোনও কর্ম্ম মহানরকের

জীব স্ব স্ব প্রকৃতির অনুগামী, সুতরাং উচ্চ-তম আদর্শ একেবারে কেহ লইতে পারে না।

সাধন, এরূপ জানিয়াও লোকে দুর্ব্বাসনার প্রবলতানিবন্ধন ভগবানের শাসনাতিক্রমে ভীত না হইয়া তাহা সাধন করিয়া থাকে। ইহাই মানবের প্রকৃতি। এইজন্য যাঁহারা সত্যই রজো ও তমোগুণের শাসন ছাড়াইয়া সত্ত্বগুণের ভূমিতে উঠিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং ভয়ঙ্কর ভৈরবাদির পূজা না করিয়া শান্ত নারায়ণমূর্ত্তিসমূহের পূজা করেন সত্য, কিন্তু যাহারা নিজের প্রকৃতির অনুবর্ত্তনে কামলোভ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পিতৃ, ভূত, প্রজাপতি প্রভৃতির উপাসনা করে, ইঁহারা তাহাদের কোনরূপ নিন্দা, উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেন না।

ভাগবতের আদর্শে বিরোধের অবসান ও প্রেমরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশ মানুষ যদি অনুবর্ত্তন করিতে পারিত তাহা হইলে জগতে যাবতীয় বিরোধের অবসান হইত, মানবসমাজে প্রেমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখা যাইতেছে না। নিজের যাহা ধর্ম্ম, তাহা জীবনে সফল করিবার জন্য বড় একটা চেষ্টা বা আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের আচরণ না করিয়া প্রচারের দিকেই আগ্রহ অধিক, আর এই প্রচার জীবনের দ্বারা নিঃশব্দে নহে, পরের দোষ ও ত্রুটী উদ্‌ঘাটন করিয়া এবং নিজের প্রশংসা করিয়া সমালোচনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জন্যই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত বিরোধ। এই জন্যই ধর্ম্ম মানবকে মৈত্রীর সূত্রে একতাবদ্ধ করিতে পারে নাই, মানুষে মানুষে সহস্র প্রকার হিংসা ও বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ভগবানের পূজার নামে ভগবান্‌কেই অবজ্ঞা করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রেমভক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জগতের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করার একমাত্র উপায়।

ভৈরবের উপাসনা।

পূর্ব্বে বলা হইল যাহাদের প্রকৃতিতে তমো ও রজোগুণ অত্যন্ত অধিক, তাহারা ঘোররূপ ভৈরবাদির পূজা করে। এরূপ উপাসনা আমাদের দেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। খুব ঢাক বাজিতেছে, শত শত মেষ মহিষ বলিদান হইতেছে, সেই রক্ত গায়ে মাখিয়া খুব মদ খাইয়া লোকে হৈ হৈ করিয়া নাচিতেছে, নাচিতে

নাচিতে দু একজন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল, লোকে বলিল দেবতার বা ভূতের আবেশ হইয়াছে। এই গেল এক রকমের উপাসনা।

ধর্ম্ম ইন্দ্রজাল।

তাহার পর একদল লোক আছে তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিলে যদি তাহাদিগকে প্রেমভক্তি আশ্রয় করিয়া সংযতভাবে ও শান্তভাবে জীবন যাপন করিতে বলা হয়, তাহা হইলে তাহারা আদৌ সন্তুষ্ট হয় না। তখন তাহারা আর একজন লোকের নিকট যায়; তিনি বলেন যে শ্মশানের ঈশান কোনে শিমুল গাছের উপর যে পেচক বাস করে, অমাবস্যা রাত্রিতে সেই পেচকটীকে মারিয়া যদি তাহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে সহজেই একটা বড় ব্যাপার হইতে পারে। তখন সে ব্যক্তির চিত্ত বেশ প্রসন্ন হইল।

সর্ব্বত্রই মানব-প্রকৃতি এক রূপ।

মানবের প্রকৃতিই এই। অন্য দেশের লোক অন্যভাবে খুন, ডাকাতি, দূরবর্ত্তি কোন দ্বীপে যাইয়া অসভ্য অসহায় লোকদের গুলি করিয়া বধ করিয়া নিজের প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে, আমাদের দেশে দীর্ঘকাল শান্তভাবের আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় এ সব দিকে আপনার প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধনের সকল সকল সময়ে প্রকাশ্য সুবিধা হয় না। যুদ্ধ করা, মৃগয়া করা প্রভৃতি বড় একটা নাই, কাজেই শ্মশানে গিয়া মদ্যপানাদি করিয়া অথবা তাণ্ডবনৃত্য করিয়া অজ্ঞান হইয়া অথবা খুব আগুণ জ্বালিয়া আগুণের উপর গড়াগড়ি দিয়া, নিজের অঙ্গে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া যাহা হউক একটা মহৎ কার্য্য করিলাম, এই প্রকারের একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এমন ধারা লোক জগতে সকলদেশে এবং সকল যুগেই আছে, যাহাদিগকে অল্প সময়ের মধ্যেই শান্তভাবের উপাসনায় দীক্ষিত করা অসম্ভব।

ভাগবত-ধর্ম্ম শান্তি ও সংযমের মধ্য দিয়া সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য-অবস্থায় তুরীয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। এই ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইলে

প্রেমধর্ম্মের প্রাথমিক সাধন।

কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করা উচিত। তাহার মধ্যে একটি অতি আবশ্যকীয় বিষয় এই যে ভগবদুপাসানা একটি বিরামবিহীন ব্যাপার। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেব এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজা স্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহঙ্ক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্ম্মণোগুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাং॥
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ॥
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥"

উদ্ধৃত এই দশটি শ্লোকের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে ভাগবত-ধর্ম্মের সাধনার যাহা প্রাণ তাহা বুঝিতে পারিব।

ফলের অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কাম ও অনতিহিংস্র-ভাবে পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে কথিত পূজাপ্রকরণ আশ্রয় করিবে। শ্রীজীব-গোস্বামী "অনতি হিংস্রেণ" ইহার অর্থ করিয়াছেন "অতি-হিংসারহিতেন---অতিশব্দঃ প্রাণাদিপীড়া পরিত্যাগ ফলপত্রাদি-জীবাবয়ব-স্বীকারার্থঃ।" অর্থাৎ প্রাণাদি পীড়া পরিত্যাগ করিয়া ফলপত্রাদি গ্রহণ করিবে।

১। নিষ্কামভাবে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সাধন।

শ্রীভগবানের প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণিতে ভগবানের ভাব চিন্তা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগের বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মিত্রতা, যম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরল আচরণ, সতের সঙ্গকরণ, এবং নিরহঙ্কারতা প্রদর্শন করিবে। এই সকল সদ্‌গুণের অনুশীলন করিলে সাধকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইবে এবং ভগবানের গুণ শ্রবণমাত্র বিনা পরিশ্রমে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবেন।

২। বিগ্রহসেবা
৩। মহতের সেবা
৪। দীনে দয়া
৫। মৈত্রী
৬। যম
৭। নিয়ম
৮। আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ
৯। সংকীর্ত্তন
১০। সরলতা
১১। সাধুসঙ্গ
১২। অহঙ্কার-হীনতা।

গন্ধ যেমন বায়ুপ্রভাবে আপনি আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, সেইরূপ ভক্তিযোগযুক্ত অধিকারীচিত্ত বিনাপ্রযত্নে পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌কে লাভ করে। এই প্রকারের চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বপ্রাণিতে আত্ম-দৃষ্টি দ্বারাই হয়। ভগবান্ বলিতেছেন আমি সকল ভূতের আত্মা-স্বরূপ হইয়া সর্ব্বপ্রাণিতেই সতত অবস্থিত আছি, তথাচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতেই পূজারূপ বিড়-ম্বন করিয়া থাকে। পরন্তু, আমি সর্ব্বপ্রাণিতে বর্ত্তমান, সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূঢ়তাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়, সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী, ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণির সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার মনও শান্তি প্রাপ্ত হয় না। হে অনঘে, যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহের নিন্দাকারী, সে যদি

বিবিধ দ্রব্য ও দ্রব্যে উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমাকে পূজা করে, তথাপি আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির মর্ম্ম আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে শ্রীভগবানের গুণ ও লীলা, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, গন্ধ যেমন বায়ুতে ভাসিয়া আসিয়া আপনি নাসিকার মধ্য দিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ আসিয়া আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয়েন। ভগবান্ হৃদয়ে উপস্থিত হইলে মানুষ কিরূপ হয়, তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিয়া কেমন করিয়া, লক্ষ লক্ষ পতিত জীব ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে আমাদের দেশের লোক ভগবানের গুণ ও লীলা প্রায়ই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেছেন, তবে আমাদের সকলদিকেই এত দুর্গতি কেন? ইহার উত্তর আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে দেখিতে পাইলাম। হৃদয়কে যে ভাবে পূর্ণ করিয়া, জীবনে যে পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া, এই গুণ ও লীলা শ্রবণ করিতে হইবে, সে ভাব এখনও আমাদিগের মধ্যে আসে নাই, সে ব্রত আমাদের দেশ এবং জাতি এখনও গ্রহণ করে নাই। প্রাচীন সমাজে এই ব্রতের অনুষ্ঠান যেটুকু ছিল এখন যেন সে টুকুও আমরা হারাইতেছি। এই কারণে অর্থাৎ সাধনার যাহা প্রাথমিক কথা তাহা ছাড়িয়া দিয়া শেষের বিষয় লইয়া আমরা কেবল শক্তির অপব্যয় করিতেছি বলিয়াই আমাদের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। বৃক্ষের মূল কাটিয়া তাহার অগ্রভাগে জলসিঞ্চন যে প্রকার নিস্ফল, আমাদের অধ্যাত্মসাধনাও সেইরূপ নিস্ফল হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভাগবত-ধর্ম্ম-সাধনের শ্রীকপিল দেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই প্রাথমিক বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পতিত হইলেই আমাদের মঙ্গল।

(আমাদের শ্রবণ, কীর্ত্তন নিয়মিত হয় না।)

আমাদের দেশে এই প্রাথমিক বিষয়গুলির উপদেশ প্রায়ই প্রদত্ত হয় না, এবং সে উপদেশ পাইবার জন্য কেহ যেন ইচ্ছুকও নহে। মানুষ সাধারণতঃ একটা অলৌকিক কিছু বা একটা

(প্রাথমিক বিষয়ে অমনোযোগিতা ও বুজরুকি)

ধর্ম্মহানির উপায়।

ইন্দ্রজাল চাহে। আমি যেমন ক্ষুদ্রচিত্ত, মহৎলক্ষ্যহীন, স্বার্থান্ধ ও ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব আছি ঠিক সেইরূপই থাকিব, এক তিলও পরিবর্ত্তিত হইব না, আর একজন গুরু আসিয়া এ সকল বিষয়ে কোনরূপ মনোযোগী হইবার জন্য আদৌ কোন কথা না বলিয়া এমন এক মন্ত্র দিয়া যাইবেন যে সেই মন্ত্রের সাহায্যে আমি একেবারে রাতারাতি অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চসীমায় আরোহণ করিব। একবার একজন লোক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অনেক টাকা দিয়া একজন নামজাদা বড় ডাক্তারকে আনাইয়াছিল, ডাক্তার আসিয়া ঔষধের দিকে তত মনোযোগী না হইয়া পথ্য, ব্যায়াম প্রভৃতি লইয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন, রোগী ধনবান্ লোক, এবং অত্যন্ত লোভী, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ডাক্তার বাবু, যদি পথ্য প্রভৃতিতেই সংযত হইব, তবে আর এত টাকা দিয়া আপনাকে ডাকাইব কেন? আপনি বড় ডাক্তার এমন ঔষধ দিবেন যে পথ্যাদি ব্যাপারে আমি যেমন আছি ঠিক তেমনই থাকিব, অথচ আপনার ঔষধের দ্বারা ব্যায়রাম সারিয়া যাইবে।" ডাক্তারবাবু বলিলেন "এ প্রকারের ঔষধের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" এই বলিয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। ডাক্তার বাবু চতুর লোক ছিলেন না। তিনি যদি চতুর হইতেন তাহা হইলে বলিতেন "আচ্ছা তাহাই হইবে তবে কিছুদিন সময় লাগিবে।" এই বলিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিতেন, রোগীর অদৃষ্টে যাহা হইবার তাহাই হইত, ডাক্তার-বাবুর কিছু অর্থলাভ ত হইত। ধর্ম্মরাজ্যে সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ের ইতিহাসেই এইরূপ পথ আচার্য্যগণকে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। এই জন্য শ্রীকপিলদেব কর্তৃক উপদিষ্ট এই প্রাথমিক বিষয়-গুলির প্রতি সকলের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ভাগবত-ধর্ম্মের সাধনার প্রথম কথা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ভগবান্ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত, ইহার উপলব্ধি। এই দুটি স্থূল কথা যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোক দুইটি আলোচনা করিতেছি, তাহার একটিতে আছে যে যাঁহারা 'মুমুক্ষু' তাঁহারাই ভয়ঙ্কর ভৈরবাদির উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের শান্তমূর্ত্তি সমূহের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই 'মুমুক্ষু' কথাটি ভাল করিয়া উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ও এই ভাগবতধর্ম্ম মুমুক্ষুদিগের জন্য। সুতরাং যাঁহারা এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে জীবন কৃতার্থ করিতে চাহেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই ধীরভাবে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিবেন আমার মানসিক অবস্থা কিরূপ, আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি, আমি মুমুক্ষু হইয়াছি কি না? মানুষ যে একেবারেই 'মুমুক্ষু' হইবে এমন কিছু কথা নাই। আর মুমুক্ষু হওয়াও যে খুব সহজ তাহাও নহে, তবে গভীরভাবে হৃদয় পরীক্ষা করা এবং চিন্তা করা দরকার আমি 'মুমুক্ষ' কি না। আমি মুমুক্ষু নহি এবং মুমুক্ষু হইবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা বা আগ্রহও নাই, এরূপ অবস্থায় যদি আমি মনে করি যে জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ ছাড়িয়া আমি শুদ্ধাভক্তির পথ বা ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি তাহা হইলে সেই কপটতায় আমার সর্ব্বনাশ হইবে। কেবল যে আমারই সর্ব্বনাশ হইবে তাহা নহে, আমার দ্বারা অন্য অনেকেরও সর্ব্বনাশ হইবে। এই প্রকারে ভাগবতধর্ম্মের আদর্শ প্রতিদিন ছোট করিয়া ফেলা হইতেছে, ইহা একটি অমঙ্গলের হেতু হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্যই এত কথা বলা প্রয়োজন।

'মুমুক্ষু' কথার অর্থ।

"মুমুক্ষু" বলিলে আমরা অনেক সময়ে মনে করি সাংসারিক কর্ত্তব্যের পরিত্যাগ। লেখা পড়া শিখিলাম না, কাজ কর্ম্ম করিলাম না, পিতামাতার অন্নজলের ব্যবস্থা করিলাম না, কোনরূপ সামাজিক দায়িত্বের গুরুভার গ্রহণ করিলাম না, সংসার সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র বলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া সাধু সাজিলাম, সাধুগিরি ব্যবসায় করিতে যে সমস্ত কৌশলের দরকার, একজন ভাল সাধুর নিকট শিক্ষানবীশ থাকিয়া সেগুলি বেশ করিয়া শিখিলাম। ব্যবসায় বেশ জমিয়া উঠিল। নাম জাহির হইল, খাদ্য জুটিতে

লাগিল, লোকে বলিতে লাগিল আমিও ভাবিতে লাগিলাম এই বুঝি মুমুক্ষুত্ব। মুমুক্ষুত্ব সম্বন্ধীয় এই ভ্রান্তধারণা, যাহা তামসিক-প্রকৃতির লোকের হইয়া থাকে, ভগবদ্গীতা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মের ভিত্তি গীতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ভাগবতধর্ম্মেও গীতার সেই মতের প্রতিধ্বনি পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলদেবও বলিলেন ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ভাগবতধর্ম্মের ইহাই প্রথম কথা এবং গীতা ও ভাগবতের মতে ইহাই প্রকৃত মুমুক্ষুতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ আমি কর্ম্মের ফলভোগ করিব, এই প্রকারের অপেক্ষা না করিয়া, এই কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে যিনি কর্ত্তব্যব্রত পালন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। অগ্নিসাধ্য ইষ্টাখ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি নিরগ্নি হইয়াছেন, এবং পূর্ত্তকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি অক্রিয় হইয়াছেন, তিনি নহেন।

সাধন-চতুষ্টয়।

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ বেদান্ত-শাস্ত্রের অন্তর্গত। ভাগবতধর্ম্মই প্রকৃত বেদান্ত ধর্ম্ম বা বেদান্তধর্ম্মের সুবিকশিত ও পরিণত মূর্ত্তি। বেদান্তসাধনায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভের পূর্ব্বে যে সমস্ত গুণে অন্বিত হইতে হয় তাহাকে সাধন-চতুষ্টয় বলে। এই সাধনচতুষ্টয়ের চতুর্থ সাধনের নাম মুমুক্ষুত্ব। ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যে এই সাধনচতুষ্টয়ের প্রয়োজন, এই সাধনচতুষ্টয় ব্যতিরেকে অধ্যাত্মরাজ্যে যে প্রবেশ করা যায় না, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র বলিলেন যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারাই এই শান্ত ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করেন। যাহাদের প্রকৃতিতে রজো ও তমোগুণ অত্যন্ত অধিক, তাহারা এই ধর্ম্মে আনন্দ পায় না, ইহা তাহাদের প্রকৃতির অনুকূলও নহে। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠার

সহিত স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। কার্য্যের দ্বারা ও চিন্তার দ্বারা সর্ব্বভূতেই যে অন্তরাত্মারূপে শ্রীভগবান্ আছেন আমাদিগকে তাহা সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই চেষ্টা যিনি আরম্ভ করিয়াছেন তিনিই এই ভাগবতধর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী।

১০

প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন।

বাসুদেব তত্ত্বই পরতত্ত্ব।

সকল শাস্ত্র এবং সর্ব্ববিধ সাধনপথ বাসুদেবতত্ত্বে সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ইহাই প্রথম কথা। বর্ত্তমান যুগের যে যুগধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম ও গতি ইহারা সকলেই যে বাসুদেবপর অর্থাৎ সেই বাসুদেবই ইহাদের তাৎপর্য্যগোচর, এই সত্যটুকু দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে লীলাশাস্ত্রের রহস্য কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইবে না। বাসুদেবই মোক্ষপ্রদ পরম বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

সকলই বাসুদেবপরা।

"বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরন্তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥"

প্রথমতঃ ধর্ম্ম বেদবিহিত। বেদ শ্রীভগবানেরই বাণী এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ক যাবতীয় উপদেশ এই বেদেই আছে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলিতেছেন,

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

অর্থাৎ কালপ্রভাবে প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা এই বাণী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে এই বেদ আমি ব্রহ্মাকে বলি। এই বেদেই মদাত্মক ধর্ম্ম অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম আছেন।

যজ্ঞের।

সাধারণ লোকে মনে করে যে বেদ যজ্ঞের উপদেশ। বৈদিক ধর্ম্ম কেবল যজ্ঞমূলক। এই সঙ্গে সঙ্গে আর এক কথাও প্রচলিত হইয়াছে যে যজ্ঞের ফল অদৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন বেদের তাৎপর্য্য বাসুদেব। যজ্ঞের কথা বেদে আছে সত্য, কিন্তু যজ্ঞের তাৎপর্য্যও তো বাসুদেব। এই কথাটুকু এক প্রকারের মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে বলিলেন।

যোগের ও দান ব্রতাদি ক্রিয়ার তাৎপর্য্য বাসুদেব।

তাহার পর অন্য মতাবলম্বীদিগের কথা বলিতেছেন। বৈদিক ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, যোগই বৈদিক ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন যোগের তাৎপর্য্যও বাসুদেব। কেহ কেহ বলিতেছেন যোগের লক্ষ্য আসনপ্রাণায়ামাদি ক্রিয়া। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন এই ক্রিয়াগুলি তো আর শুধু ক্রিয়ার জন্য নহে। ইহাদের তাৎপর্য্যও বাসুদেব। এই ক্রিয়াগুলিও বাসুদেবকে পাইবার উপায় মাত্র। বাসুদেবকে পাওয়া যায়, ইহাই এই সমস্ত ক্রিয়ার সার্থকতা।

জ্ঞান ও তপঃ বাসুদেব-পর।

কেহ কেহ বলেন বেদের তাৎপর্য্য জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, জ্ঞানের তাৎপর্য্যও বাসুদেব আর তপস্যার তাৎপর্য্যও তিনি। আর দান ব্রতাদি বিষয়ক যে ধর্ম্মশাস্ত্র অনেকে মনে করেন স্বর্গ প্রভৃতিই বুঝি ইহাদের চরম লক্ষ্য। কিন্তু তাহা নহে। কারণ এই টুকু চিন্তা করিতে হইবে যে স্বর্গ আমাদের লক্ষ্য হইল কেন, আমরা কি জন্য যাগযজ্ঞাদি করিয়া স্বর্গ পাইবার জন্য কামনা করি? ইহার উত্তরে আমাদিগকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে স্বর্গে আনন্দ আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, এই জন্যই আমরা স্বর্গের জন্য এত লালায়িত। স্বর্গ যদ্যপি আনন্দের স্থান না হইয়া দুঃখের

স্থান হইত তাহা হইলে কেহ স্বর্গ কামনা করিত না। এখন এই যে স্বর্গ ইহাই বা কি? এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন **"সাপি তদানন্দাংশপ্রকাশরূপত্বাৎ তৎ-পরৈব।"** অর্থাৎ স্বর্গ সেই বাসুদেবের পরিপূর্ণ আনন্দের একাংশের প্রকাশক সুতরাং স্বর্গও বাসুদেব-পর। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবত বাসুদেবতত্ত্বকেই পরম ও চরম তত্ত্ব বলিয়া এই দুই শ্লোক উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী ৪টী শ্লোকে সেই বাসুদেবতত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন।

স্বর্গ ও বাসুদেব-পর।

আমরা উল্লিখিত অংশটুকু আরও একটু বিশদরূপে আলোচনা করিয়া বাসুদেব-তত্ত্ব কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব এবং তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোক চারিটি আলোচিত হইবে।

যজ্ঞ, যোগ প্রয়োজন কেন?

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র যেন মানবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের প্রয়োজন কি? নানা প্রকারের চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়া নানা জনে নানারূপ কথা বলিবেন। কেহ বলিবেন যাগ যজ্ঞাদি করাই প্রয়োজন। চিরদিন যজ্ঞাদি চলিয়া আসিতেছে, বেদে যজ্ঞের উপদেশ রহিয়াছে অতএব যজ্ঞই প্রয়োজন। কিন্তু যজ্ঞ যে কেন প্রয়োজন, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন কি অভাব আছে, যাহা দুর করিবার জন্য মানবজাতি দীর্ঘকাল এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছে, এ চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত হইল না; নিজের পানে চাহিলাম না আত্মপ্রকৃতির মূলে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা-ভূমি রহিয়াছে তাহার সন্ধান করিলাম না, লোকমুখে শুনিয়াছি সকলে বলিয়া থাকে অতএব বলিলাম যজ্ঞই প্রয়োজন। নতুবা বলিলাম যোগানুষ্ঠানই প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন-সাধনের জন্য আসনপ্রাণায়ামাদি বিবিধ ক্রিয়ার প্রয়োজন। এই প্রকার উপদেশও লোক-মুখে শুনিয়াছি, এই শোনা কথার প্রতিধ্বনি করিয়া গম্ভীর-ভাবে বলিলাম যোগই প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন কি অভাব আছে, যাহা দুর করিবার জন্য মানুষ চিরকাল যোগানুষ্ঠান করিতেছে? মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এমন কি কামনা আছে,

যাহা পূর্ণ করিবার জন্য মানুষ যোগ করিতেছে? আমরা বহির্মুখ হইয়া কেবল শেখা কথার প্রতিধ্বনি করি, নিজের প্রতি চাহিয়া নিজের প্রকৃতির গভীরস্থলে যে সত্য লুকাইয়া রহিয়াছে তাহার অন্বেষণ করি না। এই কারণেই আমরা সত্যের শীতল ছায়ায় দাঁড়াইয়া জীবন জুড়াইতে পারি না, শাস্ত্র লইয়া সম্প্রদায় লইয়া কেবল দ্বন্দ্ব করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ করি। আমাদের কি প্রয়োজন এই প্রশ্ন শুনিয়া আর একদল লোক বলিলেন জ্ঞানই প্রয়োজন, আর এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইলে তপস্যা করিতে হইবে এ কথাও আমরা লোকের কাছে শুনিয়াছি। আর একদল লোক বলিলেন ধর্ম্মই প্রয়োজন। এখানে ধর্ম্ম বলিতে যজ্ঞ ছাড়া ব্রত নিয়মাদিও বুঝাইল। শুধু তাই নয়, শ্রীধর স্বামীর মতে, ধর্ম্মের লক্ষ্য যে স্বর্গ, সেই স্বর্গও বুঝাইল। এইবার কথাটা যেন প্রকৃত আলোচনার রাজ্যে আসিল। এতক্ষণ কেবল মাত্র কতকগুলি ভিত্তিহীন, পরের মুখে শোনা, চিরকাল-প্রচলিত, শেখা কথার আবৃত্তির মধ্যে আমরা বিফলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এখন যেন কতকটা দাঁড়াইবার জায়গা পাওয়া গেল। এতক্ষণে প্রকৃত চিন্তা বা আলোচনা করিবার সম্ভাবনা হইল।

উত্তর, স্বর্গের জন্য।

মানুষ তুমি স্বর্গ চাও? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে স্বর্গের যে ধারণা মানবজাতি দীর্ঘকাল হইতে পোষণ করিতেছে সেই ধারণাটী লইয়া আলোচনা করা আবশ্যক। স্বর্গ বলিতে আমরা কি বুঝি? শাস্ত্রে পাইতেছি—

স্বর্গ প্রয়োজন কেন?

"যন্নদুঃখেন সম্ভিন্নং নচ প্রাপ্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বপদাস্পদম্॥

অর্থাৎ যাহা দুঃখের দ্বারা সম্ভিন্ন নহে, অর্থাৎ দুঃখ যাইয়া যাহার কখনই ব্যাঘাত করিতে পারে না, যাহার অনন্তর নাই অর্থাৎ যাহা কখনও ফুরাইয়া যায় না, যে সুখের লালসায় চালিত হইয়া নৈরাশ্য ও বিঘ্নের মধ্য দিয়া অনিশ্চিত ভাবে পরিশ্রম করিতে হয়

না, এই প্রকারের সুখই স্বর্গ। এই প্রকারের একটা অবস্থা আমরা চাই। এইটিই আমাদের মূল লক্ষ্য।

উত্তর সুখের জন্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্বর্গই প্রয়োজন, এই কথা বলিলে পর কথাটা ঠিক হোক্ বা না হোক্, অন্ততঃপক্ষে তত্ত্বের আলোচনা করা যাইতে পারে এমন একটা দাঁড়াইবার ভূমি পাওয়া গেল। আমরা বুঝিলাম আমরা আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া আমাদের স্বরূপের যে সুখ, সেই সুখ চাই। অর্থাৎ "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মা ভূৎ" ইহাই আমাদের সকলেরই কামনা।

বেদ এই সুখের উপায় বলিয়া দিতেছেন, এই জন্যই মানব বেদকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিয়াছে। যজ্ঞ এই সুখ আনিয়া দিবে বলিয়াছে, এই জন্য জীব যজ্ঞের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। যোগ এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া স্বরূপের সুখে লইয়া যাইবে বলিয়াই মানুষ যোগ ও তৎসাধিকা বিবিধ ক্রিয়ার আশ্রয় লইয়াছে, জ্ঞানের দ্বারা এই আত্যন্তিক সুখ পাওয়া যায় বলিয়া তপস্যার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়া মানুষ এই জ্ঞানের অন্বেষণ করিয়াছে।

কেমন সুখ?

উত্তর আত্যন্তিক সুখ।

এইবার সুখান্বেষণের এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি সম্বন্ধে যদ্যপি বেশ ধীর ভাবে চিন্তা করা যায় এবং সুখ কি তাহাও যদি বেশ সূক্ষ্মভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে আমরা অধ্যাত্মসাধনার অনেকগুলি স্তর দেখিতে পাইব। বাসুদেবতত্ত্বের উপাসনা কিরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হইল এইবার তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জগৎ।

এখনও আমাদের দেশে অনেকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বলিয়া থাকেন যে এই প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে পৃথক এক চিন্ময় জগৎ আছে। এই কথাটি মোটেই সত্য নহে। প্রকৃত চিন্ময় জগৎ হইতে যে একেবারে পৃথক্ তাহা নহে, অবশ্য তাই বলিয়া এ রকমও যেন কেহ মনে না করেন যে এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎই চিন্ময় জগৎ। সুতরাং এই প্রত্যক্ষ নশ্বর জগৎ ও অপ্রত্যক্ষ নিত্য জগৎ

এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। কিন্তু এটুকু নিরূপিত না হইলে আমরা লীলাতত্ত্বও বুঝিবনা, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বও বুঝিব না এবং ফলে ভাগবতধর্ম্মের ভ্রান্ত ব্যাখায় আমাদিগকে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। এই বাসুদেবতত্ত্বের তাৎপর্য্যের মধ্যেই এই রহস্য আরম্ভ হইতেছে।

এতদুভয়ের সম্বন্ধ।

প্রথমে দুইটি জিনিস ধরিয়া লওয়া যাউক। একটি কার্য্য, আর একটি কারণ। এই প্রত্যক্ষ জগৎটা হইল কার্য্য। এখানে শান্তি পাওয়া যাইতেছে না, এখানে কেবল দুঃখ, কেবল যন্ত্রণা, এ কেবল মৃত্যুর মৃগয়া-কানন! কিন্তু আমি সুখ চাই, আমি অমৃত চাই; এই দুঃখের মধ্যে এই মরণের মধ্যে আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। একজন বৈদিকঋষি বলিলেন "অপাম সোমমমৃতাভবামঃ" সোমপান করিয়া অমৃত হইয়াছি। আমরা যজ্ঞে সোমপান করিতে লাগিলাম। বেশ অমৃতই হইলাম। কিন্তু কি প্রকারে অমৃত হইলাম. মরণকে একেবারে ত্যাগ করিয়া? তাহা ত হইতে পারে না। কারণ মরণ না থাকিলে অমৃত থাকে কি করিয়া?

কার্য্য ও কারণ।

মরণ ও অমৃত।

এই তত্ত্বটুকু মানুষ যখন ভাবে না, তখন মানুষ প্রত্যক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষে যাইবার জন্য লালায়িত হয়, কার্য্যকে বাদ দিয়া কারণকে ধরিতে চেষ্টা করে। দুঃখকে গ্রহণ না করিয়া যেন সুখকে পাইতে চায়। বিশ্বতত্ত্বের এই অতি সাধারণ সত্যটা সে বুঝিতে পারে না যে, যে দুঃখকে ভয় করিয়া কেবল তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে সে সুখ কি তাহা জানে না; পক্ষান্তরে আনন্দের সঙ্গে বীরের মত দুঃখকে যে আলিঙ্গন করিতে পারে, সুখ তাহারই। মরণকে ভয় করিয়া যে পলাইয়া পলাইয়া যায়, সে কেবলই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; আর মরণকে যে সানন্দে বরণ করে, মরণের মধ্য হইতেই অমৃত আসিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করে।

আমাদেব দেশে, কেবল আমাদের দেশে কেন, এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর লোকই—এই পৃথিবী, এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দুঃখমৃত্যু ও

শোকসঙ্কুল জগৎকে উপেক্ষা করিয়া ধার্ম্মিক হইয়া সুখ ও অমৃত খুঁজিতে গিয়াছিল। বাসুদেব উপাসনা সেই মতের এক অতি তীব্র প্রতিবাদ।

এক হিসাবে ইংরাজী শব্দের সাহায্যে এই বাসুদেব-উপাসনাকে A return to the Concrete বলা যায়। এই বাসুদেব উপাসনার প্রবর্ত্তনা হইতে আমরা নবযুগের আবির্ভাব Brith of Modernity গণনা করিতে পারি। এইবার "বাসুদেব" বলিতে কি বুঝায় তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে, তাহা হইলে কথাটি আরও স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে।

'বাসুদেব' এই কথার অর্থ।

"**বাসুদেব**" এই নামের ব্যুৎপত্তি বহু পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকলগুলিই এক ভাবের দ্যোতক। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে আছে—

"বাসঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮৭ অধ্যায়।

বিষ্ণু-পুরাণে প্রথম অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥"

বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র অর্থাৎ ষষ্ঠ অংশে ৫ম অধ্যায়ে আছে—

সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষ্বপি চ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ॥
ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ।'

এই ব্যুৎপত্তির বলে আমরা ভগবান্‌কেই পাইতেছি। কিন্তু ভগবান্ কিরূপ, কি ভাবে কোথায় আছেন?

পৌরাণিক বলিলেন তিনি সকলের বসতিস্থান, বহুবিশ্ব তাঁহার লোমে লোমে বিদ্যমান। তিনি পরমাত্মা সকল ভূত তাঁহাতে এবং তিনিও সকল ভূতে। এই বাসুদেবই জগতের ধাতা ও বিধাতা। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে বাসুদেব উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদের একটা প্রচলিত মতের তীব্র প্রতিবাদ। নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রচলিত মত' বলিলাম, তাহার কারণ এই বাসুদেব নির্গুণ ও গুণাতীত ইহাও সকল পুরাণেই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত খুব স্পষ্টরূপেই এ কথা বলিয়াছেন।

সকল ভূত, তাঁহাতে এবং তিনি সর্ব্বভূতে।

বাসুদেব-উপাসনা সাধকজীবনে প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন। এই কথাটীর প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধের উপর ভাগবতধর্ম্মের রহস্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

মানুষের জীবন একটা দ্বন্দ্বের সাহায্যে আপনাকে উপলব্ধি করে। এই দ্বন্দ্বের একদিকে জড় একদিকে চেতন, একদিকে অসুর একদিকে সুর, একদিকে সংসার আর একদিকে নিত্যধাম, এই লীলার নাম নিত্য-সমুদ্রমন্থন। বিষই বলুন আর অমৃতই বলুন, এই সমুদ্রমন্থনে সমুদয় সামগ্রীর উদ্ভব হইতেছে। যেমন ঘড়ির দোলকযন্ত্র বা পেন্‌ডুলাম্ সর্ব্বদাই একদিক হইতে অপর দিকে দুলিতেছে, উঠিতেছে আর নামিতেছে—বিরামহীন—এক মুহূর্ত্তেরও স্থৈর্য্য নাই তেমনই এই সংসার কেবলই সরিতেছে, ইহারি নাম জগৎ কেননা, ইহা চলিতেছে। Every thing is in a flux.

জীবনে নিত্য দ্বন্দ্ব।
জড় ও চেতন অসুর ও সুর।
নিত্য সমুদ্রমন্থন।

এই যে নিত্য চাঞ্চল্য, সর্ব্বদাই এদিক হইতে ওদিকে যাতায়াত, ইহারই মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার অবস্থিতি। জড়বস্তু, উদ্ভিদ, পশু বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকগণ যাহারই তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, সকলেরই ইতিহাসে এই বিরোধ বা সমুদ্রমন্থন আবিষ্কার করিতেছেন। মানুষ যখন চেতনভাবে এই সমুদ্রমন্থনের প্রতি চাহিয়া বিচলিতচিত্তে ইহার সমস্যার মীমাংসায় আত্মনিয়োগ করিল তখনই তাহার ইতিহাসে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। তখন সে দেখিল একদিকে প্রেয়, আর একদিকে শ্রেয়ঃ, সে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী,

উভয়েই তাহাকে যুগপৎ আকর্ষণ করিতেছে। একদিকে জড় আর একদিকে চেতন, উভয়ের মধ্যে সে দোলায়িত, তাহার মনে প্রশ্ন উঠিল সে কোথায় দাড়াইবে? দাঁড়াইবার একটা স্থিরভূমি পাইবার জন্য যে বিরামবিহীন চেষ্টা, সেই চেষ্টাই মানবজাতির ইতিহাস, এই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া যুগের পর যুগ অগ্রসর হইয়া দেখা গেল, মানুষ একবার এখানে একবার ওখানে আপনার চিরবিশ্রামের স্থান আছে এইরূপ অনুভব করিতেছে। মানুষ একবার জড়বাদী হইল, প্রত্যক্ষের মধ্যে ইহলোককে সর্ব্বস্ব করিয়া সান্ত্বনা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। একটা সাময়িক কৃতকার্য্যতাও সে পাইল, কিন্তু সেখানে দাঁড়াইতে পাইল না, তাহার নিজেরই প্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার সোণার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। হিরণ্যকশিপু একটা বড় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা স্থায়ী হইল না তাহার নিজেরই পুত্র প্রহ্লাদ বিদ্রোহী হইল। রাবণ এই প্রকারের একটা গৌরবময়ী সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও থাকিল না। শিশুপাল, দন্তবক্র ও দুর্য্যোধন, তাঁহাদের চেষ্টাও স্থায়িত্বলাভ করিল না। প্রাচীনভারতের ইতিহাসে এই প্রকারের বহু দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা প্রত্যক্ষেরই পূজা করিয়াছিলেন। অপ্রত্যক্ষকে অস্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু গঙ্গার স্রোতের মুখে ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছেন।

আমরা দ্বন্দ্বে দোলায়িত।

একবার জড়বাদ ও একবার অধ্যাত্মবাদ।

প্রত্যক্ষের মধ্যে যখন মানুষ দাঁড়াইতে পারে না, তখন সে প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষের আরাধনা করে। শ্রীমদ্ভাগবতের দক্ষযজ্ঞ প্রস্তাবে শিবের যে চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়া অপ্রত্যক্ষের উপাসনা। দক্ষ ও শিব দুজনেই চরমপন্থী। দক্ষ বলেন ভাব ভক্তি বা জ্ঞানের প্রয়োজন কি? আমি বিশুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিব, যথাবিহিত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিব, ক্রিয়ার ফল অবশ্যই হইবে। শিব বলেন যে আমার শ্বশুর দক্ষ যখন সভায় আসিয়াছিলেন, তখন আমি মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলাম, বাহিরে শরীরের দ্বারায় লোক দেখাইবার জন্য প্রণাম

দক্ষযজ্ঞের তাৎপর্য্য।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের দ্বন্দ্ব।

অভিবাদন করিয়া কি হইবে? এই গেল চরমপন্থিদের কথা। ইহাদের একজন বলে প্রত্যক্ষই সত্য, অপ্রত্যক্ষ একটা কল্পনামাত্র; আর একজন বলে অপ্রত্যক্ষই সত্য, প্রত্যক্ষ একটা মিথ্যা মায়া ও মোহাবেশ মাত্র; এই নিত্য সমস্যা। সমাজের মধ্যে আসিয়া মানুষ একবার বলে সমাজই মূলাধার, তুমি ব্যক্তি তোমার স্বার্থ সুবিধা সমস্তই সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমার পরমার্থ; এই আদর্শের অনুবর্ত্তনে কিছুকাল চলিতে চলিতে ব্যক্তি একদিন বিদ্রোহী হইয়া পড়ে, সে তখন বলে আমার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্যই সমাজ। সমাজ যদি আমার ব্যক্তিগত স্বত্ব ও সুবিধার উপর হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে আমি বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া সমাজের জীর্ণ কাষ্ঠখানিকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিব।

কাব্যে শিল্পে সর্ব্বত্রই এই বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। একবার বাহিরে ঝুঁকিতেছে ও ভিতরে আসিতেছে, একবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত তাহার উপাস্য হইতেছে। এই বিরোধের মীমাংসা কোথায়? আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে বাসুদেব উপাসনা এক হিসাবে প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন। একথা শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে অপ্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়া হিরণ্যকশিপুর মত রাজা বা দক্ষের মত ব্রাহ্মণ যে পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা সেই পথের কথা বলিতেছি। বাসুদেব-উপাসনা অপ্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়া নিত্যকে আত্মসাৎ করিয়া প্রত্যক্ষে ফিরিয়া আসিল। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। পূর্ব্বে একবার আলোচনা করা হইয়াছিল যে, মানবের চৈতন্যের চারিটী অবস্থা আছে। বহিঃপ্রাজ্ঞ, অন্তঃপ্রাজ্ঞ, উভয়তঃপ্রাজ্ঞ ও তুরীয়। এই যে তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ উভয়তঃপ্রাজ্ঞ অবস্থা, এই খানেই বাসুদেব-উপাসনার আরম্ভ, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে দক্ষ বহিঃপ্রাজ্ঞ, শিব অন্তঃপ্রাজ্ঞ আর বাসুদেব উভয়তঃপ্রাজ্ঞ। বাসুদেব নারায়ণ যখন আসিলেন তখন শিবের সহিত দক্ষের সন্ধি হইয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্ক গোড়া হইতেই ছিল, কিন্তু তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন নাই, সতী দক্ষেরই

চৈতন্যের চারিটি অবস্থা।

বাসুদেবে সমন্বয়।

কন্যা এবং শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী, সুতরাং শিব ও দক্ষ ইহাদের মিলন স্বাভাবিক কিন্তু যাহা স্বাভাবিক তাহা সহজে ঘটে না, তাই সতীকে নিজের দেহ আগুনে আহুতি দিতে হইল। সতীর এই দেহনাশ দক্ষকে কাঁদাইল, শিবকেও কাঁদাইল, শিব ও দক্ষের মধ্যে যে বিরোধ এত দিন ধূমায়িত হইতেছিল আজ তাহা বীরভদ্রের বিক্রমে ও হুঙ্কারে প্রকটভাবে জ্বলিয়া উঠিল। না জ্বলিলে নির্ব্বাপিত হয় না, তাই জ্বলিয়া উঠিল। সতীর দেহত্যাগ হিন্দু-সাধনার ইতিহাসে একটী বৃহৎ ঘটনা, সতীর দেহত্যাগ ছাড়া দুই চরমপন্থীর মিলন হয় না।

বাসুদেব-উপাসনা এই মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত—ভাগবতধর্ম্ম এই মিলনেরই আদর্শ।

বৃন্দাবনে এই সমন্বয়ের পূর্ণবিকাশ।

ভাগবতধর্ম্মের পরিপূর্ণ বিকাশ বৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দনের আবির্ভাবে। এই আবির্ভাব ও এই লীলা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের মিলন। মানুষ মানুষের উপাসক, অমানুষের বা অতিমানুষের নহে। এতদিন যাহাকে অতিমানুষ বলিয়া ভাবিতেছিলাম, আজ আমি ব্রজের মানুষ হইয়া দেখিলাম সে মানুষ। ব্রহ্মা কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিলেন না, ইন্দ্রও তাহা বুঝিতে পারিলেন না, যাহা হউক ইঁহারা দেবতা, প্রথমটা বুঝিতে না পারিলেও শেষে বুঝিতে পারিলেন, কারণ দিব্ ধাতু প্রকাশাত্মক। কংস ও শিশুপাল কিন্তু কখনই বুঝিতে পারিলেন না। কংস তাঁহার নিজের ভূমিতে দাঁড়াইয়া

কংস ও নারদ।

যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রহরীগণকে অস্ত্রে শস্ত্রে সাজাইয়া সারারাত্রি দ্বারে দ্বারে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন, নিজেও অমাত্য সভাসদগণ সহ জাগিয়া বসিয়া ছিলেন, কিন্তু কখন যে তাঁহারই কারাগারের অন্ধকার কক্ষ আলো করিয়া তিনি আসিলেন এবং কেমন করিয়াই বা চলিয়া গেলেন, বেচারা তাহা বুঝিতে পারিল না। নারদ, যিনি প্রহ্লাদের গুরু এবং লীলাময়কে ধরাইয়া দেওয়া যাঁহার কার্য্য, তিনি কংসকে সন্ধানটা দিয়াও দিলেন না—কংস আতঙ্কে বহুবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্ষিপ্তভাবে ঘুরিতে লাগিল। সুতরাং

বাসুদেব-উপাসনা প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন বলিয়া ব্যাপারখানা নিতান্ত সহজ নয়। ইহা কি তাহা বুঝাইতে হইলে, ইহা কি নহে তাহা বুঝিয়া দেখিলে সুবিধা হওয়া সম্ভব অর্থাৎ ব্রহ্মা বহির্মুখ করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া অন্বয়ী-মুখে অপেক্ষা ব্যতিরেকী-মুখে এই বাসুদেব-উপাসনার তত্ত্ব আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব।

লীলার সম্মুখে থাকিয়াও কংস শিশুপাল তাহা দেখে না।

কংসের কারাকক্ষে আবির্ভূত হইয়া কংসরাজ্যের সীমামধ্যে নিত্যলীলা প্রকট হয় অথচ, কংস তাহা দেখিতে পায় না। আর শিশুপাল দেখিয়াও দেখিতে পায় না। সুতরাং কংসের পরিচয়ের দ্বারা আমরা যদি সতর্ক হইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে হয়ত লীলা বা বাসুদেব-উপাসনা বুঝিতে পারিব।

কংসতত্ত্ব বা নিত্য কংস।

কংস কে ? আমার মধ্যেও কংস আছে, শুধু কংস কেন আমার মধ্যে সকলেই আছে, যদি আমার মধ্যে না থাকিত তাহা হইলে তাহার ভাবনা ভাবিয়া আমার কিছু লাভও হইত না, আর তাহার ভাবনা আমি ভাবিতেও পারিতাম না। আমার মধ্যে আছে সুতরাং কংসের অন্বেষণ করা যাউক।

কংসের ভীরুতা।

লোকে মনে করে কংস বড় সাহসী ও বীর, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহার মত ভীরু আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় দেখা যায় খুব সমারোহের বিবাহ। বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পাত্র বসুদেব আর পাত্রী দেবকী, রথে চড়িয়া যাইতেছেন। বিবাহের কন্যা শ্বশুরবাড়ি যাইতেছেন, সঙ্গে হাতী ঘোড়া লোকজন গীতবাদ্য মহামহোৎসব, চারিদিকেই আনন্দ। কংস ভগিনী দেবকীকে ভালবাসিতেন, সেই জন্য নিজেই ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন, আজ তাঁহার মনেও খুব আনন্দ। সৎপাত্রে ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে, বড়ই সুখের কথা। হঠাৎ দৈববাণী হইল "রে অবোধ কংস আজ এত আনন্দ করিতে করিতে যে ভগিনীকে লইয়া যাইতেছিস্ সেই ভগিনীর অষ্টম গর্ভে তোর বিনাশকর্ত্তার জন্ম হইবে" অপ্রত্যক্ষের এই প্রথম আক্রমণ, কংস যদি

দারুণ মৃত্যুভয়।

বীরের মত প্রত্যক্ষে বসিয়া থাকিতে পারিত তাহা হইলে সে বিচলিত হইত না। আবার সে যদি অপ্রত্যক্ষের প্রকৃত রহস্য বুঝিত, তাহা হইলেও বিচলিত হইত না। কিন্তু কংস দোলকযন্ত্রের ন্যায় দুলিতেছে, তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, উৎসবের আনন্দকোলাহল থামিয়া গেল। প্রকাণ্ড কালমেঘ আসিয়া শরতের পূর্ণচন্দ্রকে যেমন আচ্ছাদন করে, ঠিক সেইরূপ একখানি বিষাদের কালমেঘ আসিয়া উৎসবের ঔজ্জ্বল্য ঢাকিয়া ফেলিল।

কংস বাঁচিতে চায়।

সুশাণিত খড়্গ ঝল্ ঝল্ করিতেছে, দেবকীর কেশমুষ্টি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া কংস তাহাকে হত্যা করিবার জন্য সেই খড়্গ উত্তোলন করিল, চারিদিকে এত লোক কিন্তু সকলেই কংস-অনুচর, কাহারও সাহস হইল না কংসের কার্য্যে বাধা দেয়। বাধা দিবে কি, সকলেই ভাবিতেছে নিজেকে বাঁচানই পরম ধর্ম্ম। কেবলমাত্র বসুদেব আসিয়া কংসকে ধরিলেন, কেবলমাত্র তিনিই বিচলিত হন নাই। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পুরোদেশে বসুদেব যে শান্ত ও অবিচল ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহা জগতে অত্যন্ত বিরল। বসুদেব যাহা বলিলেন, তাহার প্রত্যেক কথাতেই তিনি যে বসুদেব অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান ইহা প্রমাণিত হইতেছে; বসুদেবও বীর সুতরাং ইচ্ছা করিলে তিনি কংসকে যুদ্ধেও আহ্বান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করেন নাই। তিনি প্রথম কংসকে সামমার্গ আশ্রয় করিয়া একরূপ তোষামোদ করিয়া তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যেটুকু বক্তব্য, বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সেটুকুও বলিতে ক্রটী করেন নাই। তিনি প্রথম বলিলেন হে কংস! তোমার গুণ প্রসংশনীয়, শূরগণ তোমার গুণের শ্লাঘা করিয়া থাকে, অতএব তুমি কি করিতেছ? ইহাতে তোমার দুর্যশ হইবে, এইটুকু বলিয়া কংসকে কিছু শান্ত করার পর তিনি যে কথাটী বলিলেন কংসের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা তাহার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিহিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, যাহারা জন্মাইয়াছে তাহাদের দেহের জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুও জন্মাইয়াছে সুতরাং দেহধারীর পক্ষে

মৃত্যু অনিবার্য্য, আজই হউক, আর শতবর্ষ পরেই হউক মৃত্যু প্রাণীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, কংসের নিকট বসুদেবের ইহাই প্রথম কথা। প্রথমে আমরা যে দ্বন্দ্বের কথা বলিয়াছি, যে সমুদ্রমন্থনের কথা বলিয়াছি, ইহাই তাহার প্রথম কথা।

কংস, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, একই তত্ত্ব।

মরণের পারে যাইতে চাই, মরণকে অতিক্রম করিতে চাই; কংসও চাহিয়াছিল, হিরণ্যকশিপুও চাহিয়াছিল, রাবণও চাহিয়াছিল, সমস্ত জগতই ত তাহাই চায় কিন্তু পার হইবে কি করিয়া? এই খানেই কংস ও বসুদেবের তর্ক। হিরণ্যকশিপু প্রত্যক্ষকে আয়ত্ব করিয়াছিল। ব্রহ্মার নিকট বর চাহিয়াছিল যেন অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে আমার মৃত্যু না হয়, মানুষ বা পশুর দ্বারা আমার মৃত্যু না হয়, দিবায় ও রাত্রিতে যেন আমার মৃত্যু না হয়, পৃথিবী বা আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়। সে ভাবিয়াছিল এই যে বর লইলাম ইহার দ্বারাতেই আমি অমর হইব, কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে মৃগও নহে মনুষ্যও নহে এমন প্রাণীর হস্তে, দিবাও নহে রাত্রিও নহে এমন সময়ে, পৃথিবীও নহে আকাশও নহে এমন স্থানে মৃত্যু হইতে পারে।

দেহাত্মবাদ

রাবণ যাহা মনেও করিতে পারে নাই, সেই নর ও বানরের হস্তে তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশাল বংশের ও রাজ্যের নাশ হইয়া গেল। মরণকে জয় করিতে হইবে। কিন্তু যে ভয় করে, সে জয় করিতে পারে না। সমুদ্রমন্থনের বিষে চরাচর যখন মৃত্যু-ভয়ে কাঁপে তখন সেই বিষ যিনি আনন্দের সঙ্গে পান করেন, তিনিই মৃত্যুঞ্জয়, সুতরাং মরণের গতি রোধ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে সে পুনঃপুনঃ মরিয়াছে। আর মরণকে যে হাসিতে হাসিতে বরণ করিয়াছে, সেই মরণের পরপারে অমৃতধামে গমন করিয়াছে। মরণ সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব, এই কষ্টি পাথর, যে ভীরু ইহাকে এড়াইতে চায় তাহার প্রত্যেক চেষ্টা তাহাকে মরণের সমীপবর্ত্তী করে। এই সত্যটা কংস বুঝিতে পারেন নাই।

বসুদেব যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই, জীব যখন জন্মায়

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তখন তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। সে সুখী হইবে কি দুঃখী হইবে, সে ধনী হইবে কি দরিদ্র হইবে, সে পাপী হইবে কি পুণ্যাত্মা হইবে, পণ্ডিত হইবে কি মূর্খ হইবে, ইহা বলা যায় না। কেবল একটা কথা স্থির করিয়া বলিতে পারা যায়, তাহা এই যে সে মরিবে সুতরাং এই চাঞ্চল্যপূর্ণ সংসারে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত। কিন্তু কংস এই সুনিশ্চিত সত্যকে রোধ করিতে চায় আর এই যে কংসের বাঁচিবার চেষ্টা ইহা দেহ লইয়া বাঁচা, কারণ তত্ত্বদর্শী বসুদেব তাহাকে বলিলেন যে, এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেহী আপনার কর্ম্মের দ্বারা অবশ হইয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হয়; অধিক কি পথে চলিবার সময় সম্মুখের পা মাটীতে রাখিয়া তাহার পর যেমন পিছনের পা তোলা হয়, অথবা তৃণ জলৌকা যেমন সম্মুখের তৃণটী ধরিয়া তবে পিছনের তৃণটী ছাড়ে, সেইরূপ জীব একটি নূতন দেহ আগে আশ্রয় করিয়া তবে পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করে। মৃত্যু যখন এই প্রকারের ব্যাপার, তখন সেজন্য বিচলিত হইবার কারণ নাই। কংস তাহার এই দেহটী লইয়া বাঁচিতে চায়। বাঁচিতে চাওয়াত স্বাভাবিক, ইহা প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মূলে বিদ্যমান্, কিন্তু সত্য সত্য বাঁচিতে হইবে। কংস যে ভাবে বাঁচিতে চাহেন ইহা সত্যকার বাঁচা নয়, ইহা একটী মোহ, একটী স্বপ্ন, তাই বসুদেব বলিলেন যে, রাজদেহ ও শূকরদেহ দুই সমান। জলে চন্দ্রের ছায়া পড়িলে পর বাতাসে যেমন তাহা কাঁপে, সেই প্রকার আত্মার জন্ম হয় না, দেহে অধ্যাস হয় মাত্র। বসুদেব এমন নিপুণভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, কংস বুঝিতে পারুন বা না পারুন, তখন নিবৃত্ত হইলেন। বসুদেব এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। আপাততঃ গোলযোগের নিষ্পত্তি হইল বটে কিন্তু কংস এই দেহ আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে অর্থাৎ যাহা মিথ্যা ছায়া মাত্র তাহাকে সত্য করিতে, যাহা হইবার নহে তাহাই করিতে, চেষ্টান্বিত হইয়া রহিলেন।

বাঁচিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

বাঁচিবার জন্য তিনি না করিয়াছেন, এমন কর্ম্ম নাই। নিরীহ ও নির্দ্দোষ বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, সদ্যজাত শিশুর চাঁদ মুখের পানে প্রসূতি যখন হৃদয়ভরা স্নেহ ও প্রাণভরা আনন্দ লইয়া করুণকোমল নেত্রে চাহিয়া আছেন, তখন সেই শিশুকে কাড়িয়া আনিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ মহাপাপ কেন? কংস বাঁচিতে চাহেন, যাহা হইবার নহে তাহাই করিতে চাহেন। কেবল বসুদেব-দেবকীর সন্তান-বিনাশেই কংশের চেষ্টা শেষ হয় নাই, শেষে তাহার রাজ্যমধ্যে যাবতীয় সদ্যজাত শিশুকে বিনাশ করিতে লাগিল, কেন না কংস বাঁচিতে চাহে। এই প্রকারে বাঁচিবার চেষ্টা কংস-প্রকৃতির লক্ষণ। কংসের পিতা উগ্রসেনের প্রকৃতিতেও এই ভাবটা সূক্ষ্মরূপে ছিল, প্রথমে আমরা তাহার পরিচয় পাই নাই, শেষে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। উগ্রসেনের প্রকৃতি মধ্যে লুক্কায়িত এই বিষ যখন ব্যক্ত হইল তখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ভারতের অধিকাংশ রাজবংশ ধ্বংস হইয়াছে, যদুবংশ তখন অত্যন্ত প্রবল। যদুবংশ ধ্বংশ হইলেই শ্রীকৃষ্ণ লীলা-সম্বরণ করেন। দশম স্কন্ধের প্রথমেই কংসের কথা, আর একাদশ স্কন্ধের প্রথমে উগ্রসেনের কথা। উগ্রসেনের কথাটা এই।

যদুবংশ-ধ্বংসের কারণও যাহা কংসের বিনাশের কারণও তাহাই।

যদুবংশের বালকগণ এতদূর উদ্ধত হইয়াছে যে, একদিন বড় বড় মহর্ষিগণের সহিত তাহারা কৌতুক করিয়া বসিল। বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ যাইতেছেন আর যদুবংশীয় বালকেরা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশ পরিধান করাইয়া মুনিদের সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই মেয়েটীর গর্ভ হইয়াছে, ইহার কি সন্তান হইবে বলিয়া দিলে অনুগৃহীত হইব। ঋষিগণ সমস্তই বুঝিলেন, কুপিত হইয়া বলিলেন ইহার গর্ভে তোমাদের কুলনাশন এক মুষলের জন্ম হইবে, বালকেরা সাম্বের উদরের বস্ত্র মধ্যে দেখিল একটী মূষল রহিয়াছে। তাহাদের মনে ভয় হইল

তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিল না, উগ্রসেনের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল। উগ্রসেন বালকদের কোনরূপ তিরস্কার করিলেন না, তিনি ঋষিদের অব্যর্থ বাক্য কি করিয়া ব্যর্থ করা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার সুপক্ক মাথায় একটা উপায়ও আসিয়া জুটিল। তিনি বলিলেন এই লৌহমুষলকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দাও। উগ্রসেন ভাবিয়াছিলেন তাহা হইলেই আর কুলনাশন হইবে না। মানুষের এই প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তৎপ্রসূত উপায়-উদ্ভাবন যদি সকল কার্য্যের নিয়ামক হইত, তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিত না। উগ্রসেন যাহা স্বপ্নেও কখন ভাবিতে পারেন নাই, দৈব ইচ্ছায় তাহাই হইল। মুষলের ভিতরের সামান্য একটু লোহা চূর্ণ হইল না। অপর অংশ গুঁড়া হইয়া গেল। সমুদ্রের লোণা জলের সহিত এই লৌহচূর্ণের কিরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া হইল তাহা বলা যায় না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা আলোচনা করিলে লাভবান্ হইতে পারেন। কিন্তু লোহার গুঁড়ায় এরকা নামক এক তৃণের জন্ম হইল, সে তৃণ পাহাড়ের বাঁশের মত। এই তৃণের লাঠিতে যদুবংশীয়গণ ভবিষ্যতে পরস্পর পরস্পরের মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে বলিয়া তৃণ বাড়িতে লাগিল। ঐ মুষলের যে অংশ চূর্ণ হয় নাই সেই অংশ এক মৎস্য আসিয়া গ্রাস করিল। এক কৈবর্ত্ত জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে সেই মাছটিকে ধরিয়া ফেলিল, মাছের পেট হইতে লৌহখণ্ড বাহির হইলে পর জরা নামক এক ব্যাধ সেই লৌহখণ্ড লইয়া তাহার তীরের ফলা প্রস্তুত করিল। এই প্রকারে যদুবংশের বিনাশ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের ব্যবস্থা অপ্রত্যক্ষের মধ্যে সকলের অগোচরে হইয়া থাকিল।

কংস প্রকৃতির প্রত্যক্ষবাদ, লীলাদর্শনের অন্তরায়।

তাহা হইলে কংস-প্রকৃতি কি, মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইতেছে। পুরাণাদি শাস্ত্র যতই শ্রবণ ও স্মরণ করা যাইবে এই প্রকৃতির সহিত আমাদের ততই পরিচয় হইবে। এই প্রকৃতি আমাদিগকে লীলা দেখিতে দেয় না।

ইহা ছাড়া আর এক প্রকৃতি আছে সেও লীলা দেখিতে পায়

না। কংস যেমন প্রত্যক্ষকেই সর্ব্বস্ব করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে, ইহারা তেমনই অপ্রত্যক্ষে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া প্রত্যক্ষকে মানিতে চায় না। বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞশালায় গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর রাখাল বালকগণকে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অন্নভিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। যজ্ঞের কার্য্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং সে সময় অন্ন দিলে তাঁহাদের কর্ম্মের কোন হানি হইত না; কিন্তু তাঁহারা অন্ন দিলেন না। শ্রীমদ্ভাগবত এই সমস্ত ব্রাহ্মণকে "বেদবাদী" বলিয়াছেন। "বেদবাদী" কথার অর্থ শ্রীধরস্বামীর মতে বেদ-ঘোষণশীল, অর্থাৎ যাঁহারা বেদের কথা লইয়া উন্মত্ত হইয়া আছেন, বেদের মর্ম্ম কি তাহা জানেন না। ইহারা 'ক্ষুদ্রাশা' 'ভূরিকর্ম্মা' 'বালিশ' অর্থাৎ মূর্খ, কিন্তু সে কথা বলিবার উপায় নাই, তাঁহারা নিজেদের অত্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধ ও ক্রিয়াদক্ষ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের পত্নীগণ, তাঁহাদের দ্বিজাতি-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, শৌচ ও ত্রিবিধ দীক্ষা না থাকিলেও লীলায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ভাগ্যে তাহা হইল না। পতিব্রতা পত্নীগণের পুণ্যের ফলে, শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের কিছু চৈতন্য হইয়াছিল বটে কিন্তু কংসরাজার ভয়ে তাঁহারা লীলা স্বীকার করিতে পারেন নাই। কংসের মৃত্যু-ভয় আর ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রভয় ও কংস-ভয়, এমন করিয়া ভয়ের মধ্যে থাকিলে লীলায় প্রবেশ ঘটে না।

আবার অতি-অপ্রত্যক্ষের উপাসনাও অন্তরায়; যথা বেদবাদী ব্রাহ্মণ

বেদ বলিয়াছেন 'অভীঃ' অর্থাৎ ভয়শূন্য হইতে হইবে। আবার বলিয়াছেন বলহীন ব্যক্তির আত্মলাভ ঘটে না, যাহারা 'আধমনা' লোক তাহারা লীলায় যাইতে পারে না। যে ব্রজবাসীগণকে লইয়া এই লীলা হইয়াছিল, তাহাদের বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমে দেখা যায় যে, তাহারা কেমন ভয়হীন, নিজেদের সরল বিশ্বাসের পশ্চাতে তাহারা চলিয়াছে, নিজেদের হৃদয়ের কাছে তাহারা চোর নয়। গোপীগণ তো লোকভয়, ধর্ম্মভয়, শাস্ত্রভয়, লজ্জা সকলই ছাড়িয়াছিলেন, অন্যান্য ব্রজবাসীরাও সকলই ছাড়িয়াছিলেন। ইন্দ্রযজ্ঞ একটা কত বড় ব্যাপার, কতকাল হইতে গোপ-পল্লীতে তাহার

বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্রজবাসীদের তুলনা।

অনুষ্ঠান, কৃষ্ণ তাহার প্রতিবাদ করিলেন, বলিলেন ইন্দ্র দেবতা সত্য, কিন্তু তোমাদের তিনি দেবতা নহেন, যে যাহা দ্বারা বর্ত্তমান হয় তাহার তাহাই দেবতা 'অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্যহি দৈবতম্' কিন্তু এটুকু বোঝে কে? আমার স্বভাব যাহা চায় আমি যে তাহা লুকাইয়া চলিয়াছি, গোপনে যাহা করি প্রকাশ্যে যে তাহারই প্রতিবাদ করি, এমন করিয়া মিথ্যার উপাসনা যে করে, সে লীলায় প্রবেশ করে না। ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপগণকে বুঝাইলেন যে, মানুষ যে ভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে যদি সে ভাব ছাড়িয়া অন্যভাবের পূজা করে, তাহা হইলে অসতী নারীর যেমন উপপতি-সেবা, ঠিক সেই প্রকার কার্য্য করা হয়। ইন্দ্র বড় লোকের দেবতা, স্বর্গে যাহারা সুধা খাইতে চায় তাহারা ইন্দ্রের পূজা করে করুক, তোমরা গরু বাছুর লইয়া চাষ আবাদ কর বড় লোকের দেবতা লইয়া তোমাদের কি?

দেবপূজার রহস্য।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় বৃদ্ধ গোপেরা বুঝিলেন। এতদিন তাঁহারা নিজের হৃদয়ের সরল স্পন্দনের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তাই মানুষ হইয়াও অতি-মানুষের মধ্যে অভীষ্ট দেবকে খুঁজিয়াছেন, আজ তাঁহারা সত্য বুঝিলেন। বেদবাদী ব্রাহ্মণদের মত কংসের ভয়ে সত্য পাইয়াও তাঁহারা অনুসরণে নিরস্ত হন নাই। বৃদ্ধ গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলেন। দেবরাজের কোপ ভূরি ভূরি অশনি-গর্জ্জন ও স্তম্ভের ন্যায় স্থূল জলধারার অজস্র বর্ষণের মধ্য দিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু গোপগণ কৃষ্ণের উপর বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকিলেন, বিচলিত হইলেন না। বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের উপর এমন ধারা অত্যাচার কংস বোধ হয় করিতেন না, কারণ তাঁহাদের পত্নীগণ রাখাল বালকদের জন্য সোণার থালায় করিয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন লইয়া গিয়াছিল বলিয়া রাজদরবারে কোন অভিযোগ হয় নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পণ্ডিত লোক, কাজেই বেশী সতর্ক, সকল দিক বজায় রাখিয়া চলেন। বেশী বিদ্যা হইলে এই রূপই হয়, কাজেই তাঁহারা জানিয়াও গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু এমন

ব্রজবাসীগণ নির্ভীক।

কংস ভীরু,

বেদবাদী ও ভীরু।

অতিবিদ্যার দোষ।

করিয়া সকল দিক্ যাহারা বজায় রাখিতে চাহিয়াছে, তাহাদের কোন দিক্ই বজায় থাকে নাই। ইহারই নাম ক্ষিপ্তচিত্ততা ; সারল্য ও একাগ্রতা ব্যতিরেকে কিছু হয় না। বেদবাদী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ-শালায় শ্রীকৃষ্ণ যে দিন অন্নভিক্ষা করেন, সেই দিন তিনি যমুনার তীরবর্ত্তী বৃক্ষ সমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের বা ভাগবত ধর্ম্মের যাহা সার কথা, তাহাই বুঝাইয়াছিলেন। টীকাকারেরা বলিয়াছেন এই কথাগুলির তাৎপর্য্য বড়ই গভীর, কারণ পরে দেখা যাইবে যে, বৃক্ষগণকে দেখিয়া বৃক্ষগণের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সত্য ধর্ম্মের যে শিক্ষা ও উপদেশ পাওয়া যায়, বহু শাস্ত্রের জটিল সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা পাওয়া যায় না।

বৃক্ষের জীবন।

বাসুদেব-উপাসনা প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন। ইহার অর্থ এই যে আমরা নিজেদের কাছে যেন নিজেদের বঞ্চনা না করি, হৃদয় যখন যাহা সত্য করিয়া চায় তাহা যদি অসৎ হয় তাহা হইলে আর চাহিব না, আর যদি সৎ ও স্বাভাবিক হয় তাহা হইলে জোরের সহিত নির্ভয়ে তাহা চাইব। শব্দের জন্য, স্পর্শের জন্য, রূপ রস গন্ধের জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে যে পাগল, সে যখন বলে আমার উপাস্য শব্দহীন স্পর্শহীন রূপরস গন্ধহীন, তখন সে ত মরিতে বসিয়াছে!

আদর্শের অনুবর্ত্তন।

"The death of nations is in the rejection of their own most wistful desire. The truth appears, is seen, touched, handled and debated ; is accepted but rejected in fact and crucified.

এই কথাটী একজন নব্য মার্কিন গ্রন্থকারের। সুতরাং বর্ত্তমান জগতে লীলাবাদের মূলে যে সত্য নিহিত, তাহা প্রচার হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বাসুদেবই বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা ও ধর্ম্মের লক্ষ্য, এই কথা বলার পর পরবর্ত্তী চারিটি শ্লোকে এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। এই সমুদয় শ্লোকে লীলাবাদের সাধনার যাহা আদর্শ তাহাই বলা হইতেছে।

বাসুদেব-তত্ত্বের বিবরণ।

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণোবিভুঃ॥
তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষুগুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ॥
যথা হ্যবহিতো বহ্নি দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথাপুমান্॥
অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূত সূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্॥

পূর্ব্বের শ্লোক দুইটিতে বলা হইয়াছে যে সকল শাস্ত্র ও সকল সাধনা বাসুদেবে সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন যেন আপত্তি করা হইতেছে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব?

"ননু জগৎসর্গপ্রবেশনিয়মাদিলীলা-যুক্তে বস্তুনি সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে কথং বাসুদেবপরত্বং সর্ব্বস্য।" জগতের সৃষ্টি, তাহাতে প্রবেশ ও তাহার পরিচালন, যে বস্তুর লীলা সেই বস্তুকেই সকল শাস্ত্র পরম বস্তু বলিয়াছেন সুতরাং সকল শাস্ত্র ও সকল সাধনা বাসুদেবপর এরূপ কথা বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন, এই বাসুদেবের কার্য্যকারণাত্মিকা মায়া, যাহার দ্বারায় তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই মায়া তাঁহার স্বরূপের অর্থাৎ তাঁহার আত্ম-মায়া। তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, আত্মমায়ায় সৃজন করিয়াও স্বয়ং অগুণ। এই গেল তাঁহার জগৎকারণতা, তিনি তাঁহার মায়ায় বিলসিত, এই সমুদয় গুণের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞান বা চিচ্ছক্তি দ্বারায় বিজৃম্ভিত অর্থাৎ অতিশয় উর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। এই গেল প্রথম দুইটি শ্লোকের অর্থ। ইহার দ্বারায় বাসুদেবতত্ত্ব যে একই সময়ে সগুণ ও নির্গুণ ইহাই বলা হইল। আর যে মায়া সৃষ্টি ও জগৎ প্রবেশ লীলা আদির হেতু, সেই মায়া তাঁহার নিজের ইহাও বলা হইল।

সগুণ ও নির্গুণ।

মায়া তাঁহার নিজের।

আর তৃতীয় কথা এই বলা হইল যে, পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতি আদি যাহা কিছু আমাদের উপাস্য তৎসমুদয়েরই বাসুদেব স্রষ্টা। তৃতীয় শ্লোকটীতে যাহা বলা হইল তাহা কঠোপনিষদের একটী সুপরিচিত শ্লোকের ভাব লইয়া রচিত এইরূপ মনে হয়। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার একটু অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্লোকটির প্রথম অর্থ এই যে, তিনি অর্থাৎ বাসুদেব এক হইয়াও বহুরূপে লীলা করিতেছেন। অগ্নি যেমন আপনার প্রকাশক বহু বস্তুতে নিহিত থাকিয়া নানারূপে প্রকাশিত হন, বিশ্বাত্মাপুমান্ অর্থাৎ পরমেশ্বর সেইরূপ যাবতীয় প্রাণীতে অন্তর্যামী বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া যোনিগত তারতম্য অনুসারে নানারূপে প্রকাশ পান। এই অর্থ শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, ইহাতে যেন অগ্নির প্রজ্জ্বলিত অবস্থার কথাই বলা হইল অর্থাৎ আগুণ যেমন বক্র কাষ্ঠে বক্র, চতুষ্কোণ কাষ্ঠে চতুষ্কোণ হইয়া প্রকাশ পায় অথচ আগুণ এক, বাসুদেবও সেইরূপ নানা দেহে নানারূপে অভিব্যক্ত। শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন অন্তর্যামী পরমেশ্বর সকলভূতে সর্ব্বদাই অবস্থিত, কিন্তু অগ্নি যেমন অপ্রকট তিনিও সেইরূপ। মন্থন করিলে অগ্নি যেমন সকল বস্তুরই ভিতর হইতে প্রকটিত হয় এবং সেই বস্তুকে পুড়াইয়া ফেলে, সেইরূপ শ্রবণাদি সাধনের সাহায্যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইবামাত্র জীবের মায়িক উপাধি দূর হইয়া যায়। সৃষ্টিলীলা, জগৎ-প্রবেশ ও প্রকাশলীলা বলার পর ৪র্থ শ্লোকে ভোগরূপালীলা বর্ণনা করিতেছেন। এই বিশ্বাত্মা ভূতসূক্ষ্মসমূহ, বিষয়সমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, আত্মা ও মন প্রভৃতির গুণময় ভাবের দ্বারা আপনার নির্ম্মিত দেব তির্য্যক্ প্রভৃতি ভূতে প্রবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ বিষয়-সমূহ ভোগ করিতেছেন। জীবের যে বৈষয়িক সুখভোগ, তাহা অন্তর্যামী-ব্যতীত সিদ্ধ হয় না এবং জীব তাঁহার তটস্থা শক্তি বলিয়া সেই জীবের সাহায্যে সেই অন্তর্যামী নিজেই ভোগ করিতেছেন অথবা জীবকুলকে ভোগ করাইতেছেন এরূপও বলা যায়। ইহাই শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত টীকার তাৎপর্য্য

বাসুদেবই একমাত্র জ্ঞাতা ও ভোক্তা

তাহা হইলে ব্যাপারটা এইরূপ। আমি মনে করিতেছি, আমি দেখিতেছি, ইহা ভ্রম। আমাদের এই অনন্ত কোটী জীবের বহু-রূপে দর্শন ক্রিয়ার মধ্যে একমাত্র তিনি দ্রষ্টা, আমাদের এই বহু জীবের বহুবিধ ভোগের তিনি একমাত্র ভোক্তা, ইহাই লীলাবাদ।

এইবার প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক।

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্ নরাদিষু॥

এই শ্লোকে অবতার সমূহের আবির্ভাবের, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণা-বতারের সাধারণ প্রয়োজন বলিতেছেন। প্রতিযোনিতে অন্ত-র্যামীরূপে বহুরূপ হইয়া বহু উপাধির আশ্রয়ে তিনি যে লীলা করিতেছেন তাহা বলা হইল, ইহা ছাড়া স্বরূপের নিত্যলীলায় তিনি লোকসমূহকে পালন করেন অথবা আপনাতে প্রেমযুক্ত করেন, তিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া দেব তির্য্যক্ নরাদিতে লীলার জন্য যে সকল অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে অনুরক্ত হইয়া লোক সকলের মঙ্গল হইয়া থাকে।

আনন্দ-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু আমাদের দেশে যে সংবাদ প্রচার করেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের মর্ম্মস্থলে বিদ্যমান। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কথাও আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না---কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা মর্ম্মকথা, তাহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-কর্ত্তৃকই সাধারণভাবে প্রচারিত হয়---সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে তদীয় ভক্তগণ যেভাবে বুঝিয়াছেন---ঠিক সেইভাবে বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে ভাব-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহার গতির সহিত আমাদের হৃদয়ের পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

ভাগবতের মর্ম্মকথা শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকর্ত্তৃক বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়।

এই ভাব-ধারার সহিত পরিচয় হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাব একটি আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে। এই ব্রহ্মাণ্ড-লীলার প্রথম প্রত্যূষ হইতেই গোপনে গোপনে---স্থূলদর্শী সাধারণ মানবের জ্ঞানের অগোচরে, অথচ ভক্তজনের হৃদয়কে আপ্যায়িত ও আনন্দিত করিয়া যে উদ্যোগ চলিতেছে, এই আবির্ভাব সেই আয়োজনসমূহের শেষফল। আচার্য্য ও ভক্তগণ এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন এবং লীলার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার ইহাই একমাত্র উপায়। এই ভাব-ধারার নাম আনন্দলীলা---বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে ইহার শেষদৃশ্যের অভিনয়।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব আকস্মিক ব্যাপার নহে।

আনন্দ লীলার শেষ দৃশ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের---প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনসম্মানিত টীকাকার শ্রীধর-স্বামী---শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রায় ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন---তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের যে টীকা রচনা করিয়াছেন

শ্রীধরস্বামীর টীকা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মত।

তাহার সাহায্যে সাধনশীল ও পবিত্রমনা অনেক মহাত্মা শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন—কিন্তু অধিকাংশ মানবের পক্ষে তাহা হয় নাই। নীলাচলে অবস্থিতিকালে বল্লভ ভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে শ্রীধরস্বামীর টীকা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যাহা মত তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। বল্লভভট্ট একদিন বলিলেন যে আমি শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছি—এই কথা শুনিয়া—

"প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেইজন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

অন্যস্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই বল্লভভট্টকেই বলিলেন—

"শ্রীধর স্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগৎগুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥"

* * * *

"শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত এই কয়টী পয়ার হইতে শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যাহা মত, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র ব্রহ্মসূত্রের অর্থ—মহাভারতের অর্থ-বিনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ মহিমা শ্রীধরস্বামীর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। শ্রীধরস্বামী এই সমস্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই সমস্ত মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছেন।

অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া কেবল শাস্ত্রের বলিয়া নহে সকল বস্তুরই অনাদর হইয়া থাকে। এই জন্য আমাদের দেশে অধিকারী-নির্ণয়ের জন্য এত চেষ্টা। এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রও একসময়ে অনধিকারীর হস্তে পড়িয়াছিলেন এবং তাহার ফলে অনেক ভ্রান্তমতও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই প্রকারের ভ্রান্তমত দূর করিবার জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধরস্বামীকে সপ্রমাণ করিতে হইয়াছে যে এই গ্রন্থখানিই শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাপারখানা বুঝুন—এ একেবারে যেন গোটা মানুষটাই চুরি! প্রাচীন অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে আস্থাবান্, তাঁহারা এই সমস্ত উক্তি উড়াইয়া দিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের অশেষ মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহারা এই আপত্তি তুলিলেন যে এই গ্রন্থখানিই সেই প্রকৃত ভাগবত কি না? অর্থাৎ এই গ্রন্থখানি যে জাল নহে তাহা কি প্রকারে জানা যাইবে?

ভাগবত সম্বন্ধে সন্দেহ শ্রীধরস্বামীর যুগেও ছিল।

প্রাচীনকালের এই আপত্তির কথা ভাবিলে একালের ইহা অপেক্ষাও একটা বড় আপত্তির কথা মনে হয়। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট এক বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়া পাশ্চাত্য জগতে সপ্রমাণ করেন যে কেবল সংস্কৃত সাহিত্য নহে, সমুদয় সংস্কৃত ভাষাটাই একটা মিথ্যা জুয়াচুরি। সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃত সাহিত্য বলিয়া সত্য সত্য একটা কিছু নাই এবং কখনও ছিল না। আলেক্জাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করার পর ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা গ্রীক্ ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হয়। তখন তাহারা এই গ্রীক্ ভাষা ও সাহিত্যের অনুকরণে একটা কৃত্রিম ভাষা ও সাহিত্য প্রস্তুত করে। পূর্ব্বে অর্থাৎ ইউরোপে যখন প্রথম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবের কথা প্রথম প্রচারিত হইতেছিল সে সময়ে ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্টের

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যসম্বন্ধে ডুগাল্ড্ ষ্টুয়ার্টের মত।

এই মত অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক কি ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ডাব্লিনের একজন অধ্যাপক এই মতের সমর্থন করিয়া এক প্রবন্ধ রচনা করেন। বিলাতে এই মতটা প্রচারিত হওয়ার অবশ্য একটা হেতু আছে। সে হেতুটা এই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর খৃষ্টান জেসুইট সম্প্রদায়ের একজন পাদ্রী একখানি পুস্তক লইয়া ফরাসী দেশে প্রচার করেন এবং বলেন যে ইহা ভারতবর্ষের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ভল্টেয়ার এই গ্রন্থের খুব সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমাণিত হইল যে এই গ্রন্থখানি জাল। এই কারণেই যখন প্রকৃত সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনা ও আদর আরম্ভ হইল তখন এই সমগ্র জিনিষটাই জাল, এই প্রকারের কথাও স্থানে স্থানে প্রচার হইতে লাগিল।

ভাগবতসম্বন্ধে সন্দেহের কারণ।

একটা গোটা ভাষা ও সাহিত্যই যদি জাল বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে, তাহা হইলে একখানি গ্রন্থকে 'জাল' বলিয়া অপবাদ দেওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। শ্রীধরস্বামীর টীকা আলোচনা করিলে এই প্রকার কথা প্রচার হইবার দুইটী কারণ অনুমিত হয়। প্রথম কারণ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ। মানুষ যতই 'এক ভগবান্ এক ভগবান্' বলুক না কেন, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ক্ষুদ্র-গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণটি শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার টীকার প্রথমেই শ্রীধরস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের কুব্যাখ্যা করিয়া, মূর্খ লোককে ঠকাইয়া অনেক স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তি সমাজের অমঙ্গল করিতেছিল। তাহারা নিবৃত্তি ও সংযমের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছাচার প্রচার করিতেছিল। এই দুই কারণেই সম্ভবতঃ এই প্রকারের একটা মত কোন কোন স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল যে এই গ্রন্থখানি প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবত নহে। শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে আমরা কথাটা দেখাইতেছি। শ্রীধরস্বামীকৃত প্রথম শ্লোকের টীকার শেষ কথা "অতএব ভাগবত নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্।" অতএব ভাগবত নামে

১। সাম্প্রদায়িক বিরোধ।

২। স্বার্থপর ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কুব্যাখ্যা।

অন্য গ্রন্থ আছে অর্থাৎ এখানি সে গ্রন্থ নহে এরূপ আশঙ্কা করিবেন না।

শ্রীশ্রীরাসলীলার টীকার প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামী বলিলেন যে এই লীলার উদ্দেশ্য মদনের দর্পজয়। অমনি যেন একজন আপত্তিকারী বলিয়া উঠিলেন, পরস্ত্রী-বিনোদের দ্বারা কি কন্দর্পের দর্প জয় হয়? ইহাতে যে কন্দর্পের সেবা করা বুঝায়। এই আপত্তির উত্তরে শ্রীধরস্বামী রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল হইতে চারিটী বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন যে এই চারিটী বাক্যের মর্ম্ম অবধারণ করিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য ও রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। তাহার পর তিনি বলিলেন আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রই নিবৃত্তির বা সংযমের উপদেশ করিয়াছেন, আবার এই রাসলীলা বিশেষ করিয়া নিবৃত্তিপরা। কাম-কথা, যাহা রাসলীলায় দৃষ্ট হয় তাহা একটি আবরণ-মাত্র। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন যে রাসের ব্যাখ্যা করিয়া আমি তাহা প্রতিপাদন করিব। "শৃঙ্গার-কথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি-ব্যক্তিকরিষ্যামঃ।"

এই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীধরস্বামী ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি, ইহা বেদের কথা। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মত ও শিক্ষা—যাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে তাহারা সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত "ষট্-সন্দর্ভ" নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের প্রথম সন্দর্ভেই অর্থাৎ তত্ত্ব-সন্দর্ভেই শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে খ্যাপন করা হইয়াছে। ঐ অংশটুকুর যাহা মর্ম্ম আমি কেবল তাহাই বলিতেছি; ঐ গ্রন্থ আপনারা আলোচনা করিবেন।

শ্রীজীবগোস্বামীর মত।

পুরাণ পঞ্চমবেদ, এরূপ কথা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ড হইতে বচন উদ্ধার করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী বলিতেছেন যে "বেদের ন্যায় পুরাণের অর্থকেও

বেদ ও পুরাণ।

নিশ্চল মনে করি। বেদসকল পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, পুরাণ হইতে সে সমুদয় অবধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাণ নানা দেবতার কথা বলিয়াছেন, সুতরাং পুরাণের অর্থ দুর্বোধ্য। মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে যে কল্পভেদে পুরাণের বিভিন্নতা হইয়াছে। সাত্ত্বিক কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক—রাজসকল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক এবং তামসকল্পে অগ্নির ও শিবের মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমোময় সংকীর্ণ কল্পসকলে সরস্বতীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে পুরাণসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। সাত্ত্বিক পুরাণসমূহ শ্রেষ্ঠ হইলেও তৎসমুদয়ের মধ্যেও আবার মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন ব্রহ্ম সগুণ, কেহ বলেন নির্গুণ, কেহ বলেন জ্ঞানমূলক, কেহ বলেন জড়মূলক, সুতরাং এই সমুদয়ের মধ্যে শেষ কথা কি তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ব্রহ্মসূত্র হইতে পরমার্থ নির্ণয় করা যায়, কিন্তু সূত্রগুলি অত্যন্ত অল্পাক্ষর ও গূঢ়, সুতরাং উপায় কি? শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপ প্রসঙ্গ করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন "তদেবং সমাধেয়ং যদেকতমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং সর্ব্ববেদেতিহাসপুরাণাদীনামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপম স্যাৎ। সত্যমুক্তম্। যত এবচ সর্ব্বপ্রমাণানাং চক্রবর্ত্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতম্ ভবতা"। ইহার অর্থ "যদি অপৌরুষেয় বেদ ইতিহাস ও পুরাণ সকলের সারার্থ-প্রকাশক ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য এবং এই জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত এবং পুরাণের যে সমস্ত লক্ষণ সেই সমস্ত লক্ষণযুক্ত কোন একখানি পুরাণ থাকে, তাহা হইলে সেই পুরাণের সাহায্যে এই সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। অতএব সকল প্রমাণের শীর্ষস্থানীয় আমাদিগের অভিপ্রেত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি উদ্ভাবিত হইল।

পুরাণের শ্রেণীবিভাগ।

শ্রীজীবগোস্বামীর মীমাংসা।

ভগবান্ বেদব্যাস সমুদয় পুরাণ আবিষ্কার করিলেন—ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিলেন, কিন্তু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ, বিচিত্র গূঢ় লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না—তখন তিনি সমাধিস্থ হইয়া আপনার রচিত সূত্র-সকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিলেন। "যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ব্ববেদার্থসূত্র লক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্ত্বাৎ।" অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ গায়ত্রী, সকল বেদার্থের সূত্রস্বরূপ আর শ্রীমদ্ভাগবত এই গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই প্রকারে নানা পুরাণের উক্তি-অবলম্বনে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীধরস্বামীর কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা, পূর্ণতা, ব্রহ্মসূত্রের অর্থরূপতা প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ভাগবতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয়।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের মত বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করেন নাই, শ্রীজীবগোস্বামী তাহারও হেতু নিরূপণ করিয়াছেন। এই হেতু অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের একটী উক্তির উপরেই এই কথাটীর প্রতিষ্ঠা। তথায় এইরূপ বলা হইয়াছে যে "শঙ্করাচার্য্য পরমভক্ত হইলেও ভগবানের একটী বিশেষ আদেশ-পালনের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবৎতত্ত্ব গোপন করিয়া মায়াবাদ অবলম্বনে উপনিষদাদির ব্যাখ্যার সাহায্যে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করাই সেই আজ্ঞা। এই কারণে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য স্বরচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদিগ্রন্থে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ব্রজেশ্বরীর বিস্ময়—ব্রজকুমারীগণের বসনচৌর্য্য প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার এই সমুদয় কথা শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যত্র নাই; অতএব তিনি শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন এবং গ্রহণও করিয়া-

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ভাগবত সম্বন্ধে মত।

ছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার আবির্ভাব, তাহার প্রাতিকূল্য ঘটিবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া জনসমাজে—এই গ্রন্থের প্রকৃত মহিমা প্রচার করেন নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। সাত্বত-(ভক্ত) গণের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য শিষ্য পুণ্যারণ্য প্রভৃতি আচার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায় না বুঝিয়া এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের মনে ভয় হইল যে বৈষ্ণবেরা শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্গুণ ও চিন্মাত্রপর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। এই জন্য তিনি শ্রীমদ্ভাবগতের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পথ প্রকাশ করিয়া দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহা শ্রীজীব গোস্বামী কৃত তত্ত্বসন্দর্ভের কথা। এই কথাগুলি আশ্রয় করিয়া আমি আপনাদিগকে প্রাচীন আচার্য্যগণের যাহা মত তাহাই জ্ঞাপন করিতেছি।

পৌরাণিক সাহিত্য।

আমরা আমাদের দেশে পৌরাণিক সাহিত্য নামে পরিচিত এক অতি বিশাল সাহিত্য দেখিতে পাই। অষ্টাদশপুরাণ আমাদের পরিচিত। ব্রহ্ম পদ্ম বিষ্ণু বায়ু ভাগবত নারদীয় মার্কণ্ডেয় অগ্নি ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত লিঙ্গ বরাহ স্কন্দ বামন কূর্ম্ম মৎস্য গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড এই অষ্টাদশ পুরাণ। ইতিহাস ও পুরাণাত্মক পঞ্চম বেদ শতকোটী শ্লোকে নিবদ্ধ এবং ব্রহ্মার মুখ হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীনকালের বিশ্বাস। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে ঐরূপ উক্তিই দেখিতে পাইবেন। মধ্যে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এমন একটা দিন আসিয়াছিল যখন এই সমুদয় পুরাণের নামও আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন জাতীয় চিত্তের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের অতীতের সহিত যাহাতে একটা প্রকৃত পরিচয় হয়, সেজন্য চারিদিকে একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রায় সমুদয় পুরাণই ইংরাজী ও বাংলাভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। সংস্কৃত মূলগ্রন্থও সুলভ, সুতরাং পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যতটা কঠিন ছিল এখন আর

ততটা নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনার সমুদয় পুরাণ ও উপপুরাণগুলি ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের সমগ্র সাধনার প্রতিবিম্ব এই পৌরাণিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত হৃদয়ের পরিচয় হয় নাই, এ প্রকারের লোককে জাতীয় হিসাবে শিক্ষিত বলা যায় না। অবশ্য পূর্ব্বে পুরাণগুলি যেরূপ উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল এখন আর সেরূপ উপেক্ষিত নহে—অনেকেই পুরাণশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু পৌরাণিক-সাধনাদ্বারা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করিবার জন্য পুরাণের আলোচনা অতিশয় বিরল। পুরাণের মধ্য হইতে, একালে আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি, তাহার কোন তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা, এই জন্যই আজ কাল পুরাণের আলোচনা হইতেছে। ইহাও একটী আবশ্যকীয় কার্য্য। কিন্তু এই প্রকারের কোন উদ্দেশ্য লইয়া সমালোচনার ছুরিকাহস্তে পৌরাণিক সাধনার তপোবনে প্রবেশ না করিয়া তথায় যে হৃদয়োচ্ছ্বাস চারিদিকে বহিয়া যাইতেছে সেই উচ্ছ্বাসের দ্বারা আত্মহৃদয়ের অনুশীলন করিবার জন্য শ্রদ্ধাবান্ সাধকের মত প্রবেশ করা অধিক প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে, আমরা আমাদের অতীতের সহিত যে পারস্পর্য্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলাম আমাদের নবীন শিক্ষা সেই সূত্র ছিন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের অতীতের বুক হইতে ভাব ও রসের ধারা বর্ত্তমানের নৈরাশ্য মরুভূমিকে যতদিন অবিশ্রান্তভাবে সরস না করিবে ততদিন আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ও উদ্যম কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের উদ্দেশ্য-হীন গতির মত।

ভাগবতে পৌরাণিক সাধনার পূর্ণ পরিণতি।

পৌরাণিক সাধনার পূর্ণ পরিণতি শ্রীমদ্ভাগবতে পরিদৃষ্ট হইবে। তত্ত্ব-সন্দর্ভ হইতে শ্রীজীব গোস্বামীর যে মত বর্ণনা করা গেল তাহার সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। প্রাচীনকালের সাধক ও ভক্তগণ, যাঁহারা রসিক ও ভাবুক হইয়া পৌরাণিক সাধনার যাহা প্রকৃত রস তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে এই পূর্ণতা দেখিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের

সহিত পরিচিত হইতে হইলে তাঁহাদের এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা তাঁহাদের হৃদয় ও মনের সহিত আমাদের ঠিক্ যোগ থাকিবে না। এমন হইতে পারে যে একালে আমরা নূতন কিছু পাইব, যাহা তাঁহারা পান নাই বা পাইলেও প্রচার করেন নাই, আবার তাঁহাদের সমগ্রভাবটি আমরা চেষ্টা করিয়া না পাইতেও পারি। এ প্রকারের কিছু প্রভেদ হওয়া কেবল সম্ভব নহে, স্বাভাবিক। কিন্তু বাঁচিতে হইলে, সত্যের আশ্রয়ে থাকিতে হইলে, যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য চেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পৌরাণিকী সাধনার পূর্ণতা কিরূপে হইল তাহা আমরা এইরূপ উদাহরণের দ্বারা বুঝিতে পারি।

যেমন একজন কবি একটী আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, একখানির পর আর একখানি, এই প্রকারে অসংখ্য কাব্য রচনা করেন এবং এই প্রকারে বহুকাব্যে তাঁহার ঐ মানস আদর্শ কিছু কিছু পরিব্যক্ত হইতে হইতে পরিণত বয়সের এক শুভক্ষণে বিরচিত একখানি কাব্যে তাঁহার সেই আদর্শ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে—সেইরূপ আমাদের এই আর্য্যজাতি অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া একটী বিশেষ ভাবের ছাঁচে এই দেশ ও কালে বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই চেষ্টার ফলে যাবতীয় পুরাণ প্রচারিত হইয়াছে, এই প্রকারে বহু পুরাণ প্রকাশিত হইতে হইতে ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমাধিস্থ হইয়া ধ্যানযোগে প্রাপ্ত হইলেন। যে তত্ত্ব অন্যান্য পুরাণে কম বা বেশী করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার পরিপূর্ণ সমাবেশ। পূর্ব্বে কবির যে আদর্শ-কাব্যের কথা বলা হইল, সেই আদর্শ কাব্যখানির সাহায্যে যেমন কবির অন্যান্য কাব্যগুলির সম্বন্ধ, মূল্য ও তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে পারা যায় এবং সমুদয় কাব্যের মধ্যেই এক সুমহান্ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা-ভূমিরূপে অখণ্ড কবিহৃদয়ের সমুদয় অংশটী আমরা দেখিতে পাই, পৌরাণিক সাহিত্যে শ্রীমদ্ভাগবতও

ঠিক্ সেইরূপ। স্কন্দপুরাণের একটী শ্লোক তত্ত্বসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ।
অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদিব॥"

ব্যাসচিত্ত

অর্থাৎ ব্যাসদেবের চিত্তস্থিত আকাশ, মহাকাশ—ঐ মহাকাশ হইতে খণ্ড খণ্ড করিয়া অন্যে গ্রহণ পূর্ব্বক, ভাণ্ডার হইতে বস্তু গ্রহণ করিয়া যেমন ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যাস একজন নহেন—একথাটী প্রাচীন কথা। বিষ্ণুপুরাণে ইহা আছে এবং তত্ত্বসন্দর্ভে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই উদ্ধৃত বাক্যে পরাশর বলিতেছেন আমার পুত্র ব্যাস অষ্টা-বিংশতি মন্বন্তরে চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিলেন। এই ধীমান্ বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদসমূহ যেমন "ব্যস্ত" (বিভক্ত) হইলেন, অন্যান্য ব্যাসকর্ত্তৃক ও আমাকর্ত্তৃক বেদ সকলও সেইরূপ বিভক্ত হইয়াছেন—হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ, এইরূপে সকল চতুর্যুগে বেদের বিস্তৃত শাখাভেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত হই-য়াছে। এই সমুদয় ব্যাসের মধ্যে মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে দ্বাপরযুগে গৌতম ঋষির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল (এখন ইউরোপে যেমন হইয়াছে)। ব্রাহ্মণেরা ভগবানের নিকট এই বিষয় নিবেদন করিলে ভগবান্ পুরুষোত্তম ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইয়া বেদের উদ্ধার সাধন করিলেন।

ব্যাস চৈতন্যের একটি অবস্থা—a state of consciousness
অনেকে ইহাতে সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন।

এইবার আমার যাহা বক্তব্য তাহা শ্রবণ করুন। পৌরাণিকী সাধনা একটী বিশিষ্ট সাধনা—এই সাধনপথ আশ্রয় করিয়া বহু ভক্ত মানব নিজ নিজ জীবন সফল করিয়াছেন। যেমন আজ-কাল আমরা বলি যে কবিদের একটী জগৎ আছে—ঐতি-হাসিকদের একটী জগৎ আছে বৈজ্ঞানিকদের একটী জগৎ আছে। বিশেষ সাধনা ব্যতিরেকে সেই সেই জগতে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। সেইরূপ আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যে

পৌরাণিক জগৎ।

পৌরাণিকদিগের একটী জগৎ আছে, সাধনাব্যতিরেকে আপনারা সে জগতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। পৌরাণিকের জগৎ বলিলে আপনারা অনেকেই হয়ত মনে করিবেন, এ এক কল্পনার রাজ্য। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পরমার্থতত্ত্ব (Ultimate Reality) লইয়া যখন বিচার, তখন আমরা যে জগৎকে প্রত্যক্ষ ও সত্য বলি, তাহার কতখানি সত্য আর কতখানি কাল্পনিক তাহাও বেশ সাহসপূর্ব্বক আলোচনা করা দরকার। এই প্রত্যক্ষই একমাত্র সত্য, সাধারণ বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, ইহাও একালের একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কার—এই কুসংস্কারও মানবচিত্ত হইতে ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে, ইহা আপনারা অন্য সময়ে আলোচনা করিবেন। একালের একজন সুপ্রসিদ্ধ মনিষী Sir Oliver Lodge এই সিদ্ধান্তটী বিশেষ দক্ষতার সহিত বর্ত্তমান জগতের চিন্তারাজ্যে উপস্থিত করিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে সত্যের প্রকারভেদ আছে। তাঁহার আলোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে উপস্থিত আমার কিছু বলিবার নাই। পৌরাণিকী সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করিলে এবং মানবীয় চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে আমরা এই তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। যেমন রসায়ন-শাস্ত্রের আলোচনায় সফলতা লাভ করিতে হইলে অতীতের যাবতীয় রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণা ও সাধনার দ্বারা আমার মনোবৃত্তির অনুশীলন একান্তভাবে আবশ্যক, অলঙ্কার-শাস্ত্রের বা ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের আলোক হস্তে লইয়া রসায়নবিদের জগতের বস্তুদর্শনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র, সেইরূপ পৌরাণিকী সাধনার দ্বারা হৃদয়-বৃত্তি বা অনুভূতির এক বিশিষ্টরূপ অনুশীলন ব্যতিরেকে এরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যজ্ঞানের আশা করা নিতান্তই বিড়ম্বনা। প্রতীচ্যদেশের চিন্তার সাহায্যে আমার প্রতিপাদ্য কথাটী যাঁহারা বুঝিতে চাহেন তাঁহারা Sir Oliver Lodge প্রণীত "Reason and Belief' গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন।

বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি নহে।

সার্ অলিভার্ লজের মত।

প্রাচীন পুরাণের মত ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর মত উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে আমাদের দেশের এক সম্প্রদায় সাধকের যাহা ধারণা, তাহা আপনাদিগকে জ্ঞাপন করা হইল। এখন আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় পৌরাণিকী সাধনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের দেশে এখনও কেহ কেহ মনে করেন যে পুরাণগুলি বুঝি আধুনিক। এ মতে আজকাল বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কেহ আর আস্থাবান্ নহেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পুরাণের কথা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। পুরাণ-সমূহ এখন যে আকারে রহিয়াছে চিরদিন হয়ত সে আকারে ছিল না – কিন্তু পুরাণ যে চিরদিনই রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিকী সাধনার শেষ সফলতা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলার মধ্যে আচার্য্য সাধুগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তগণকে যে নবচেতনায় জাগ্রত করিলেন, তাঁহার করুণার অঞ্জন প্রাপ্ত হইয়া এই সমুদায় সাধু যে শক্তি লাভ করিলেন, তাঁহার সাহায্যে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন।

পুরাণ আধুনিক নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে আমাদিগের আরও অনেক আলোচনা করিতে হইবে। অদ্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটী মূলভাব আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি, এই ভাবটী আপনারা গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনেক রহস্য বুঝিতে পারিবেন। এই মূল ভাবটীর নাম আনন্দলীলা। আমি পৌরাণিকের ভাষায় বিষয়টি আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিতেছি। আপনারা বৈজ্ঞানিকসমালোচনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাখানি কিছুক্ষণের জন্য তুলিয়া রাখিয়া ভাবুকের মত হৃদয় দিয়া এই রস পান করিবার চেষ্টা করিবেন।

ভাগবতের মূলভাব আনন্দব্রহ্ম।

মানুষ যখন সংসারে আসিয়া ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিছুদিনের জন্য বিষয়ভোগের আনন্দ-লাভের পর আত্মচিন্তায় রত হয় এবং চারিদিকে দুঃখ ও পরাজয় দর্শন করিয়া দুশ্চিন্তাকাতরচিত্তে জ্ঞানীর নিকটে জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হয়, তখন জ্ঞানী তাঁহাকে বলেন,

পরমাত্মার কথা শুনিবে, তাঁহাকে মনন করিবে এবং ধ্যান ধারণার সাহায্যে তাঁহার সহিত তোমার যে গূঢ় ও গভীর সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিবে। মানুষ তখন জিজ্ঞাসা করে এই যে পরমাত্মা ইনি কেমন? জ্ঞানী উত্তর করেন, বাক্য ইঁহাকে বর্ণনা করিতে পারে না, মন ইঁহাকে অনুমান করিতে পারেনা। ইনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি। এই সমুদয় শুনিয়া মানুষের ভয় হয়। ভয় ছাড়া লোভেরও উদয় হইতে পারে—কারণ বেদ যাঁহাকে শব্দ স্পর্শের এবং বাক্যমনের অতীত বলেন, কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে আবার সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। বেদ ক্রমশঃ বলিলেন যে এই যে পরমবস্তু যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি নামে অভিহিত, তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে "প্রিয়মুপাসীত"—তিনি পুত্র হইতেও প্রিয়—বিত্ত হইতেও প্রিয় —অন্য সমুদায় বস্তু হইতেও প্রিয় এবং অন্তরতম। এই প্রকারে বেদের মধ্যেই ভয় ও লোভের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া প্রেমধর্ম্মের সুস্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রেমধর্ম্মের আদর্শ-প্রতিষ্ঠাই যদি উপনিষদের শেষ সিদ্ধান্ত হয়—তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলা অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে। উপনিষদের শিরোভাগে ব্রহ্মতত্ত্বের যে সমুদায় পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসমুদায়কে এককথায় "আনন্দং ব্রহ্মেতি" তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই উক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায়, এই সূত্রটির মধ্যেই "আনন্দ-লীলা-বিভোর ভগবান্" তাঁহার "লীলারসমাধুরী" লইয়া লুকাইয়া রহিয়াছেন। সমগ্র পৌরাণিকী সাধনা, বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, এই ভাবটুকু ধরিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক যে প্রেমধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহার মর্ম্মকথা এই আনন্দ-লীলাময়ের উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার আরম্ভে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত এক সুরতরু; প্রণব ইহার অঙ্কুর (তারাঙ্কুর) সত্য ইহার ভূমি এবং ভক্তি ইহার আলবাল অর্থাৎ একটি অঙ্কুরের

তিনি প্রিয়।

ভাগবত সুরতরু।

চারিদিকে আলবাল দিয়া জলসিঞ্চন করিতে করিতে কালে সেই অঙ্কুর যেমন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেই প্রকার ভক্ত ভাবুক বা রসিক উপাসকগণ দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার রসবারি সিঞ্চনে এই প্রণব-অঙ্কুরকে শ্রীমদ্ভাগবতে পরিণত করিয়াছেন। প্রণবতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনার বিষয়। সঙ্ক্ষেপে বলিতে গেলে ইনি সগুণ ব্রহ্ম, এবং সগুণ ও নির্গুণবাদের পূর্ণ সমন্বয়ের উপর ভগদ্‌গীতার যে পুরুষোত্তমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, ইনি সেই পুরুষোত্তম। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষায় ইনি সেই পুরুষোত্তমের বাচক, কিন্তু পরমতত্ত্বে উপস্থিত হইয়া যখন নাম ও নামী অভেদ হইয়া যায়, তখন ইনিই সেই পুরুষোত্তম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বেদের সার গায়ত্রী এবং শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য। এখন আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে গায়ত্রীর সার প্রণব, এই প্রণবের মধ্যে মোটমুটি দেখিতে পাই, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়, লীলার এই তিনটী তরঙ্গ একত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং লীলাবাদের সমগ্র রহস্যই প্রণব। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই তিনই এক আনন্দ হইতে হইয়া থাকে সুতরাং প্রণব শ্রীমদ্ভাগবতের অঙ্কুর এবং "আনন্দং ব্রহ্মেতি" ইহাই বীজ। এইবার আনন্দ-ব্রহ্মের আলোচনা করা যাউক।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের সমন্বয়।

আমাদের প্রকৃতিতে আনন্দের ক্রীড়া হয়। হইতে পারে ঐ আনন্দ নির্ম্মল নহে, হয়ত উহা অত্যন্ত বিমিশ্র, কিন্তু তাহা হইলেও আনন্দ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা ধারণা আছে। সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ আনন্দবস্তুর সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণাই বৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দনের আরাধনা এবং সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সাধনা-ধারাও সেই আরাধনা সাগরে যাইয়া সম্মিলিত ও পরিণতি-প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আনন্দতত্ত্ব আমাদের বিশেষভাবে ধ্যানধারণার সামগ্রী। অন্ধকারময়ী রাত্রিতে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত এই আনন্দ আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা স্থির হয় না। কারণ আমরা ধরিতে

পারি না।৵ যে নবীন মেঘের গায়ে সৌদামিনী অচঞ্চলা হয়, আমাদের ভাগ্যাকাশে এখনও সে নবীন মেঘের উদয় হয় নাই। "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে" আনন্দের ক্ষণিক প্রকাশ আমাদিগকে ভ্রান্তির মধ্যে পথহারা করিয়া আরও গভীর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। কাজেই শান্ত ও নির্ম্মল চিত্তে আনন্দতত্ত্বের ধ্যানধারণা আমাদের যেন নিত্যকর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়।

আনন্দের স্বভাব আত্মবিতরণ।

আমাদের দিক্ দিয়া আনন্দের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আনন্দের সহিত আপনার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবার এবং পরকে আপন করিবার, নিজের আনন্দরস সকলকে পান করাইয়া নিজের মত তাহাদিগকেও আনন্দযুক্ত করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা রহিয়াছে। আনন্দ কেবল একটী জ্ঞান নহে, ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মধ্যেও ইহার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। চুপ করিয়া বসিয়া আছি, মনে আনন্দ নাই, মুখখানি মলিন, মুখে কথা নাই, হঠাৎ আনন্দ আসিল! এ আনন্দ হয় ত বিষয়ানন্দ। কিন্তু বিষয়ানন্দেরও প্রাণ ব্রহ্মানন্দ। আনন্দ যেমন আসিল, মলিনমুখ উজ্জ্বল হইল, মুখে হাসি আসিল, আনন্দ বাড়িতে বাড়িতে মানুষ উঠিয়া দাঁড়াইল, শেষে ছুটাছুটি করিয়া পথের লোককে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সহিত হাস্যালাপ ও কোলাকুলি করিতে লাগিল। ইহাই আনন্দের স্বভাব! আনন্দ প্রেম। "আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান।"

অসীম আনন্দ।

এইবার চিন্তা করা যাউক যিনি অসীম আনন্দময় তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ হইবে? বেশ মোটামুটি ভাবেই আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনায় আমাদিগকে একটি এমন কথা ব্যবহার করিতে হইবে যাহা আমাদের নিকট অবোধ্য। কিন্তু সেই কথাটি ব্যবহার করা ব্যতীত উপায় নাই। সে কথাটি "অসীম"। যিনি অনন্ত আনন্দময় তাঁহার প্রকৃতিতে আত্মবিতরণের অসীম ব্যাকুলতা আছে। এই 'অসীম ব্যাকুলতা' কি তাহা ধারণা করা খুবই কঠিন। মোটামুটি গণিত বা গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে আলোচনা

অসীম গতি ও স্থিতি।

করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে অসীম ব্যাকুলতা একরূপ নির্ব্ব্যাকুলতা। কারণ আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে অসীম-গতি আর ঐকান্তিকী স্থিতি একই কথা। Infinite motion is absolute rest. ইহা এই প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। মনে করুন আমার এই দুইটি অঙ্গুলির ব্যবধান একহাত। একটি সর্ষপকে এই ব্যবধানের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লইয়া যাইতেছি। এক মিনিটে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আনিলাম। এইবার সর্ষপের গতি দ্বিগুণ করা যাউক তাহা হইলে আধ মিনিটে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে আসিবে। গতিকে ৪ গুণ করিলে সিকি মিনিট লাগিবে। ১০০ গুণ করিলে এক মিনিটের একশত ভাগের একভাগ সময় লাগিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে গতি যত বাড়িতেছে ঐ বস্তুটির দুই বিন্দুতে অবস্থিতিকালের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা ততই কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং গতি যদি অসীমে যায় তাহা হইলে ব্যবধান একেবারেই থাকিবে না অর্থাৎ একই সময়ে ঐ সর্ষপ উভয় স্থানে অবস্থান করিবে অর্থাৎ বিন্দু, রেখা হইয়া স্থিতি লাভ করিবে। সুতরাং অসীম গতি আর স্থিতি যে এক জিনিস ইহা বুঝা খুব কঠিন নয়। এই চিন্তার প্রণালী আশ্রয় করিলে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের সমন্বয় কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে এবং এই সমন্বয়ের রহস্যটুকুর উপলব্ধি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন।

যাহা হউক মোটামুটি বুঝা গেল যে যিনি অনন্ত আনন্দময় তাঁহার প্রকৃতিতে এক নিত্যকালস্থায়ী অসীম ব্যাকুলতা রহিয়াছে। এই ব্যাকুলতা কিসের জন্য ? উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন! সকলই রহস্য তাঁহার বাহিরে যে আর কিছুই নাই, তাহা হইলে নিজে নিজেকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, নিজেকে নিজে আস্বাদন করিবার জন্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহারই নাম আত্মারামের রমণ। এ কথা শ্রীশ্রীরাসলীলায় পরিব্যক্ত হইবে। কিন্তু প্রথমেই বিষয়টিকে এত কঠিন করিয়া প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ আত্মদানের জন্য ব্যাকুল।

সহজ কথায় দেখিতেছি ভগবান্ আত্মদানের জন্য ব্যাকুল! সমুদ্র যেমন আপন আনন্দে অধীর হইয়া সর্ব্বদাই নৃত্য করে, ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া তটের চরণে আসিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু প্রস্তরময় তট নীরব ও নিস্পন্দ, সে সাড়াও দেয় না। সমুদ্র-তরঙ্গ বিফলমনোরথ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যায়—কিন্তু এজন্য সমুদ্রের রোষ নাই, অভিমান নাই। রোষ থাকিলে সমুদ্র অসীম জলরাশি উচ্ছ্বাসিত করিয়া পৃথিবীকে ভাসাইয়া ও ডুবাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করে না; বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়, আবার ঘুরিয়া আসিয়া সেই অকৃতজ্ঞ তটের অঙ্গে লুটাইয়া পড়ে—অনন্ত আনন্দময় পরমপুরুষও তেমন। চরমতত্ত্ব যাহাই হউক সে কথা তুলিয়া এখন প্রয়োজন নাই। এই প্রকাশিত বিশ্বলীলায় দেখিতেছি একদিকে শ্রীভগবান্ আর একদিকে মানুষ। মানুষ ভগবান্‌কে ডাকে না, তাঁহাকে ভুলিয়া আপনার প্রকৃত কল্যাণ উপেক্ষা করিয়া দুঃখ ও যন্ত্রণার পথে ছুটিতেছে। এখন ভাবিতে হইবে ভগবান্ কি করিতেছেন? তিনি কি কর্ম্মফলদাতা-রূপে যে যেমন কর্ম্ম করিতেছে কেবলমাত্র তদনুযায়ী ফল বিধান করিতেছেন? প্রথমটা অনেকের তাহাই মনে হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের স্বরূপের অর্থাৎ তাঁহার আনন্দভাবের পরিচয় যিনি পাইয়াছেন, তিনি দেখিতেছেন যে ভগবান্ ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন, তিনি আপনার আনন্দে বিভোর ও আত্মহারা, পুনঃ পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া মানবের হৃদয় দুয়ারে আঘাত করিতে-ছেন। মানুষ অহঙ্কারের অর্গল দিয়া হৃদয় দুয়ার বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া অবিদ্যার দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতেছে। প্রেমময় হরি সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া যইতেছেন, কিন্তু তাঁহার অভিমান নাই, তাঁহার রোষ নাই, আবার তিনি আসিতেছেন। এই লীলা তিনি সর্ব্বদাই করিতেছেন।

গীতার প্রথমস্তরে ভগবদাবির্ভাবের হেতু।

এইবার বিষয়টী শাস্ত্রবাক্য ও তত্ত্বের মধ্য দিয়া আলোচনা করা যাউক। পৌরাণিক সাধনার প্রাণের কথা শ্রীভগবানের

আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন তাঁহার অবতার অসংখ্য। একটা সাধারণ কথা ভগবান্ কেন আসেন? ইহার সাধারণ উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। সে শ্লোকটী সকলেই জানেন। সেখানে বলা হইয়াছে যে যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি আসেন ও দুষ্কৃতিকারী-দিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মসংরক্ষণ করেন। যাহারা শ্রীভগবানের আনন্দভাব হৃদয়ে অনুভব করেন এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহাদের মনে একটু সন্দেহের উদয় না হইয়াই পারে না। "আমি দুষ্কৃতি-কারীদিগকে বিনাশ করিব" এই কথা শুনিয়া মানুষ বলিবে তাহা হইলে দুষ্কৃতিকারীদের আর উদ্ধার নাই! এ যে অনন্ত-নরক-বাদ (Eternal damnation) প্রচার করা হইল। আচার্য্য শঙ্করের টীকায় এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন

"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥"

শিশুকে লালনে মায়ের তাড়না যেমন নির্দ্দয়তা নহে বিশ্বনিয়ন্তা মহেশ্বরেরও সেইরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীরাসলীলার শেষাংশে বলা হইয়াছে—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মানবদেহ আশ্রয় করিয়া এমন সব লীলা করেন যাহা শ্রবণ করিয়া মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়।

ভগবদাবির্ভাবের এই হেতুটিকেই সূত্ররূপে অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আনন্দলীলার ধারা, যাহা যুগকল্প মন্বন্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীনদীয়ায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

দৈত্যযুগলের তিনবার আবির্ভাব।

এই লীলার যাহা বিপরীত দিক্, সেই দিক্‌টা আশ্রয় করিয়া আমরা কথাটা পরিস্ফুট করিতেছি। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, দন্তবক্র ও শিশুপাল, এই তিন দৈত্য-যুগল পৃথিবীতে কত ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন করিয়াছে। ইহাদের অত্যাচারে পৃথিবী কাতরা হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং ব্রহ্মার সাহায্যে ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ এই সমুদায় দৈত্যের অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য, যথাক্রমে বরাহ ও নৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভগবানের এই আবির্ভাব ও দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে যে দারুণ ক্লেশভোগ করিতে হয়, সেই সকল ক্লেশের কথা আলোচনা করিলে প্রথমে আমাদের মনে হয় যে, এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যেন আর সৃষ্টি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দানবেরা যেন তাঁহার প্রায় সমকক্ষ। শ্রীরামচন্দ্রলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিলে স্বভাবতঃই মনে এইপ্রকার চিন্তার উদ্ভব হয়।

ইহারা বৈকুণ্ঠের দ্বারী।

শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সনকাদি মুনিগণ বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, জয় ও বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুইজন দ্বারী তাঁহাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। সনকাদি মুনিগণ এজন্য জয় বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করেন যে তোরা অসুর হইয়া জন্ম-গ্রহণ কর। শেষে ভগবান্ আসিয়া সমুদয় ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দেন। এই জয়বিজয়ই অসুরযুগল হইয়া তিনবার বিশ্ব-লীলার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিল।

ভগবানের পার্ষদ দুইজন ব্রহ্মশাপে আসুরি যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভগবান্ তাহাদের সান্ত্বনা করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমাদের ভয় নাই, ভালই হইবে; আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে পারি,

কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই। এই যে অভিশাপ ইহা আমার অভিপ্রায়মতই হইয়াছে -” শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের উনত্রিংশৎ শ্লোকের এইরূপ মর্ম্ম। এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন যে প্রকৃত তত্ত্ব এই—

শ্রীধরের মত।

“যদ্যপি সনকাদীনাং ক্রোধো ন সম্ভবতি। ন চ ভগবৎপার্ষদয়োঃ তয়োঃ ব্রাহ্মণ-প্রাতিকূল্যং। ন চ ভগবতো স্বভক্তোপেক্ষা! ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জন্ম। তথাপি ভগবতঃ সিসৃক্ষাদিবৎ কদাচিৎ যুযুৎসা সমজনি। তদান্যেষামল্পবলত্বাৎ স্বপার্ষদানাঞ্চ তুল্যবলত্বেঽপি প্রতিপক্ষানুপপত্তেঃ। এতৌ এব ব্রাহ্মণনিবারণে প্রতিবর্ত্ত্য তেষু চ ক্রোধমুদ্দীপ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রতিপক্ষৌ বিষয়ে যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়মিতি ভগবতৈব ব্যবসিতঃ অতঃ সর্ব্বং সংগচ্ছতে তদিদমুক্তং শাপো ময়ৈব নির্ম্মিত ইতি মাভৈষ্টমস্তু শমিতি হস্তেং নেচ্ছে—মতং তু মে ইত্যাদি চ॥”

জয় বিজয়ের অভিশাপের কারণ।

যদিও সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ হওয়া সম্ভব নহে এবং শ্রীভগবানের পার্ষদদুইজনের ব্রাহ্মণের প্রতি কোনরূপ শত্রুতা থাকা সম্ভব নহে, তাহার পর ভগবান্ আপনার ভক্তকে কখনও উপেক্ষা করেন না এবং যাহারা বৈকুণ্ঠে গিয়াছে তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, তথাপি শ্রীভগবানের মনে যেমন সৃষ্টির ইচ্ছা জাগ্রত হয়, সেইরূপ একদিন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। শ্রীভগবানের তুলনায় অন্য সকলেই অত্যন্ত অল্পবল, তাঁহার যাঁহারা পার্ষদ, তাঁহারা অনেকটা সমবল। ভগবানের এই যুদ্ধ-ইচ্ছা সফল করিবার জন্য তাঁহার এই পার্ষদ দুইজনকে

প্রতিপক্ষ করিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে বৈকুণ্ঠপ্রবেশে বাধা দিবার প্রবৃত্তি পার্ষদদ্বয়ের মনে জাগাইয়া দিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগের শাপ-প্রদানের ছলে স্বকীয় পার্ষদদ্বয়কে প্রতিপক্ষ করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পাদন করিতে হইবে এই প্রকারের ব্যবস্থা ভগবান্ই করিলেন। এইজন্যই ভগবান্ জয়বিজয়কে বলিলেন যে এই শাপ আমার অভিপ্রায়েই হইয়াছে, তোমরা ভয় করিও না। জয়বিজয়ের এই উপাখ্যান প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের সমুদয় ধারণা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। পূর্ব্বে ভাবিতেছিলাম দৈত্যের উদ্ভবের দ্বারা পৃথিবীর ক্লেশ হইলে ভগবান্ সত্যই বিপন্ন হইয় পড়েন—এবং সত্যই বুঝি তিনি দৈত্যগণকে বিনাশ করেন, এখন দেখা গেল দৈত্যেরাও তাঁহার আপনার লোক, যাত্রার দলের অধিকারী যেমন আপনার আশ্রিত ব্যক্তিকে আপনার শত্রু সাজাইয়া যুদ্ধের অভিনয় করিয়া স্বয়ং আনন্দের আস্বাদন করেন এবং অন্যান্য সকলের আনন্দ বিধান করেন—ভগবান্ও সেইরূপ আপনার লোককে দৈত্য সাজাইয়া বীররসের অভিনয় করেন। আনন্দই এই লীলার মূল। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই আনন্দ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

দৈত্যেরাও ভগবানের আপনার লোক।

মহারাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ঘটনা, এই ঘটনাতেও অনেকগুলি অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে এবং ভগবানের আনন্দলীলার সাহায্য ব্যতীত অন্যপ্রকারে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় এ কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। মহারাজা পরীক্ষিতের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভগবদ্‌ভক্ত সাধু ব্যক্তির পক্ষে সমাধিস্থ ব্রাহ্মণকে চিনিতে না পারাও অসম্ভব—সুতরাং এই প্রকারে ঘটনাগুলির সৃষ্টি করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মনে বৈরাগ্য জাগাইয়া তাঁহাকে স্বধামে লইয়া যাওয়া এবং কলিসমুত্তীর্ণ হওয়ার অমোঘ উপায়স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করা এই লীলার উদ্দেশ্য সুতরাং আনন্দময়ের আনন্দাস্বাদনই শ্রীমদ্ভাগতের যাবতীয় লীলার

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের হেতু।

গূঢ় ও একমাত্র তাৎপর্য্য। আমাদিগকে এই আনন্দভাবের জাগরণে জাগ্রত হইতে হইবে—এই জাগ্রত অবস্থার নামই "প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা"—এই অবস্থাতেই মানুষ রসিক ও ভাবুক হয়।—এই অবস্থার মধ্য দিয়া বিশ্বব্যাপারের আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় সর্ব্বত্র স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার গূঢ় মর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সার্ব্বজনীনভাবে প্রচারিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার সাহায্যে আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য বুঝিতে পারিলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে—ইহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকলব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন—তিনি অবতারী—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের মত—অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইলেও তাঁহার স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই—এই জন্য কেহ কেহ বলেন কৃষ্ণ নরনারায়ণ, কেহ বলেন তিনি বামন—আবার কেহ বলেন তিনি ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ অবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপায় প্রকৃত রহস্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে ইহার সমুদয়গুলি সত্য—যিনি যতটুকু দেখিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন সেইটুকুই বলিয়াছেন—প্রকৃত কথা এই, শ্রীকৃষ্ণ অবতারী—তাঁহার দেহে সমুদয় অবতার বিদ্যমান, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলার সমুদয় ঘটনা এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে।

শ্রীকৃষ্ণ অবতারী অবতার নহেন।

এ বিষয়ে বিবিধ মত।

কৃষ্ণ পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলাকে মোটামুটী তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, পুরদ্বয়ে অর্থাৎ মথুরা ও দ্বারকায় পূর্ণতর, আর বৃন্দাবনে পূর্ণতম—এই গেল মোটামুটি বিভাগ। তাহার পর শ্রীবৃন্দাবনে যে লীলা হইল তাহার সমুদয় ঘটনাও একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ

পূতনা ও অন্যান্য অসুর বধ করিয়াছিলেন, একথা লীলাগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপে অসুর সংহার করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের উক্তি অনুসারে "বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।" যিনি দৈত্য বিনাশ করিলেন তিনি বিষ্ণু।

কৃষ্ণ অসুর সংহার করেন না: বিষ্ণু করেন।

এই রহস্য কি প্রকারে বুঝিতে হইবে, এইবার তাহাই বলিতেছি। বিষয়টি অনেকের কাছে খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা উপদেশ পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অত্যন্ত সহজ। একটা ঘটনা ঘটিল। সকলের নিকট ঘটনাটি একরূপ নহে। যাঁহার শক্তি বা উপলব্ধি যেরূপ তিনি এই ঘটনাটিকে সেইরূপ একটা নাম দিলেন। এই, প্রকারের একটা ঘটনাকে একজন বলিলেন পূতনাবধ আর একজন বলিলেন পূতনামোক্ষণ। যাহারা বিষ্ণুতত্ত্বে ভগবত্তা পর্য্যবসিত দেখেন, তাঁহারা বলিলেন পূতনা বিনষ্ট হইল, আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বা নন্দনন্দনকে পরতত্ত্ব বলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহারা দেখিলেন পূতনা মাতৃগতি লাভ করিল। ইংরাজীতে যাহাকে Standpoint (অধিষ্ঠানভূমি) বলে তাহারই প্রভেদনিবন্ধন এইরূপ ঘটিতেছে। যাঁহারা বাহিরকে একান্তভাবে বাহির বলিয়া ধারণা করেন অর্থাৎ যাহারা বহিঃপ্রাজ্ঞ তাঁহারাও ইহা বুঝিবেন না—'সৎ' ভাবে বা 'চিৎ' ভাবে অর্থাৎ সত্তা বা চৈতন্যকে পরতত্ত্ব বলিয়া তাহারই সাহায্যে যাঁহারা যাবতীয় তত্ত্ব বা ঘটনা উপলব্ধি করেন তাঁহারা এই রহস্য বুঝিবেন না। যাঁহারা উভয়তঃ-প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সৎ ও চিৎ এই উভয়ভাবের আনন্দে সমন্বয় বা সার্থকতা উপলব্ধি করায় যাঁহাদের লীলাদৃষ্টি স্ফুরিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন।

অধিষ্ঠান-ভূমি-ভেদে উপলব্ধির বিভিন্নতা।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অনেক অসুর বিনাশ করিয়াছেন, ইহার সমস্তগুলি সম্বন্ধেই এই একই কথা।

তাহা হইলে এইটুকু পাওয়া গেল যে, বৃন্দাবনের শ্রীনন্দ-নন্দন

যদিও পরমতত্ত্ব, যদিও তিনি বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই লীলা করিতেছেন, তথাপি বৃন্দাবনে তাঁহাকে ধরা বড়ই কঠিন। ঘটনাগুলি বিমিশ্র, ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টিতে স্বরূপের প্রকাশ ইহা অবধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলায় এ প্রকারের দুরূহতা আদৌ নাই। এখানে বিমিশ্র ঘটনার সমাবেশের দ্বারা স্বরূপের উপলব্ধিতে আমাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই। অবশ্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দনের স্বরূপপ্রকাশের আরও অন্যান্য প্রতিবন্ধক আছে। বৃন্দাবনে অবতারীর দেহে থাকিয়া অন্যান্য অবতারেরা নিজ নিজ কার্য্যসাধন করায় আমরা পরতত্ত্বের উদ্দেশ সকল সময়ে করিতে পারি না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় স্বরূপের পরিচয় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

শ্রীচৈতন্যলীলায় সাহায্যে নন্দনন্দনের উপলব্ধি।

ভিখারী ভগবান্।

মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যাহার পরিচয় পাইতেছি, তাহার নাম **সংসার**। অনেক সময়েই ইহা আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখে, ইহা ছাড়া যে আর কিছু আছে বা থাকিতে পারে, এ প্রকা-রের চিন্তাই আমাদের মনে জাগে না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন মুহূর্ত্ত আসে, যখন আমরা বুঝিতে পারি, যেখানে রহিয়াছি তাহা সংসার অর্থাৎ বদ্‌লাইয়া যাওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়াই ইহার স্বভাব। শোকদুঃখ প্রভৃতির ন্যায় মিত্র কেহ নাই, তাহারা আমাদিগকে জাগাইয়া দেয়। মৃত্যু পরমগুরু, আমরা সকল সময়ে তাঁহার কথা ভাবি না, তাঁহার পানে চাহি না। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করিতেছেন, ইহার নাম সংসার—ইহা থাকিবে না, ইহা চলিয়া যাইবে,—সরিয়া যাওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়াই ইহার ধর্ম্ম।

মৃত্যু পরমগুরু।

শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া মৃত্যুর শিক্ষাগ্রহণ করিয়া সংসারের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পরাজয়! আমরা এই সংসারে আসিয়া পদে পদে কেবল পরাজিত হইয়াই চলিয়াছি। পরাজয় যে যাতনা! দাঁড়াইবার স্থান নাই। নিশ্চল প্রস্তর বলিয়া হাসিতে হাসিতে যেখানেই দাঁড়াইতেছি, পরক্ষণেই দেখিতেছি তাহা বালুকার স্তূপ! কালের নদী প্রচণ্ডবেগে চারিদিকে ছুটিয়াছে, তাহার একটি সামান্য তরঙ্গ আসিয়া বহুযত্ন ও বহু অন্বেষণে প্রাপ্ত দাঁড়াইবার স্থানটি ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। এখন দাঁড়াই কোথায়? ভাসিতেছি, তরঙ্গের আঘাতে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছি, আর খুঁজিতেছি, দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? আবার একটি স্থান পাইতেছি, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই তো জীবন! ইন্দ্রিয়ের মোহকর বিবিধ সামগ্রী যখন মোহন সুবেশে পুরোদেশে নৃত্য করে, মন

সংসারে পরাজয়।

যখন অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া অলীক স্বপ্নে ভাসিতে থাকে, তখন এ প্রকারের ভাবনা হয় না, কিন্তু যেমন চিত্ত স্থির হইয়াছে, বাহিরের কোলাহল স্তব্ধ হইয়াছে, তখনই এই সমুদয় চিন্তা আসিয়া চিত্তকে কাতর করে।

জীবন যে অপূর্ণ, এ যেন একটা ছায়া—এ যেন একটা সঙ্গীতের একটি চরণ মাত্র। ইহার আদি কোথায়, ইহার শেষ কোথায়, ইহার চিরবিশ্রামের স্থান কোথায়?

এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের চিত্তে সমুদিত হইয়াছিল। আমাদের মনে যে এ সকল প্রশ্ন জাগে না, তাহা নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে এই প্রশ্ন স্থায়ী হয় না। জলবুদ্‌বুদের মত জাগিয়া আবার তখনই মিলাইয়া যায়। প্রশ্ন স্থায়ী হয় না বলিয়াই ইহার মীমাংসা করিবার জন্যও আমরা কোনরূপ পরিশ্রম করি না। এই সকল চরম সমস্যার শেষমীমাংসায় আরোহণ করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপাত করিয়া নিরন্তর পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা তপস্বী।

তপস্বিগণের অন্বেষণ।

জগতের এই তপস্বিগণের চরণে প্রণাম। তাঁহারা আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে, অনিত্য হইতে নিত্যে, মিথ্যা হইতে সত্যে লইয়া চলিতেছেন। তাঁহারা এখনও রহিয়াছেন। হাত বাড়াইয়া আমাদিগকে আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য, নিজেদের করুণার দীপ জ্বালিয়া আঁধারে পথ দেখাইবার জন্য, দুর্ব্বলতার সময় হৃদয়ে, মনে ও দেহে বলসঞ্চার করিবার জন্য সংশয়াকুল চিত্তকে দৃঢ় করিবার জন্য তাঁহারা রহিয়াছেন। তাঁহাদের পদাঙ্কচিহ্নযুক্ত সুপবিত্র পথ এখনও রহিয়াছে। সেই পথে চলিয়া ধন্য হইবার জন্য ভক্তিসহকারে তাঁহাদের চরণে প্রণাম করুন।

আত্মার সংবাদ

এই তপস্বিগণের তপস্যা আমাদিগকে আত্মার সংবাদ দিয়াছে। এই আত্মার সংবাদ পাইয়া মানুষ সংসার পার হইয়াছে, অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ করিয়া ভোগ করিয়াছে। ইহাই আমাদের তপোবনের মন্ত্র। এই আত্মার কথা শুনিতে হইবে, শুনিয়া মনন করিতে

হইবে, দৃঢ়রূপে ও পবিত্রভাবে ধ্যানধারণা করিতে করিতে আমিই আত্মা ইহাই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহারই নাম সনাতন পথ—এই পথ জীবনে ও সত্যে লইয়া যাইবে। মৃত্যু ও মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আর দ্বিতীয় পথ নাই।

মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে, যে যুগে মানব এই পথের সংবাদ লইয়াছে, এই পথে চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, সেই যুগে সর্ব্বত্রই মঙ্গলের পারিজাতপুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছে, সমাজের মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, ব্যক্তির মঙ্গল। আর এই যে মঙ্গল, ইহা প্রকৃত মঙ্গল অর্থাৎ একের মঙ্গল অপরের অমঙ্গল নহে।

মানুষ সময়ে সময়ে এই পথের কথা ভুলিয়া যায়। এই বিস্মৃতির যুগ অধিকদিন থাকে না, কারণ থাকিতে পারে না। এই বিস্মৃতির যুগের অবসানের মুখে এমন সব মানুষ আসেন, যাঁহারা এই পথের বহুদিনের পথিক, এ পথের সংবাদ তাঁহারা সমস্তই জানেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই পথেরই অতি প্রাচীন পথিক, তাঁহারা আসিয়া সেই সনাতন পথই আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু-কর্তৃক সন্ন্যাসের পর আস্বাদিত ভাগবতের একটি শ্লোক।

নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত যখন নবীন যৌবনে কাটোয়া নগরে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসের মন্ত্র লইয়া বিশ্বহিতকামনায় একেবারে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন, তখন জগদ্গুরুর আসন লইয়া সর্ব্বপ্রথমে তিনি এই পথের কথাই প্রচার করিলেন। কথাটি নূতন নহে, শ্রীমদ্ভাগবতেই এ কথা আছে, কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, ভুলিয়া যাওয়ার জন্য আমরা মরিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাদিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

“এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥”

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারেণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা এই সারবেশ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ ॥
সেই বেশ কৈল, এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রি দিন ॥
নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ তিনজন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন।
যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সব লোক ॥
প্রেমাবেশে হরিবলে খণ্ডে দুঃখ শোক ॥
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলি ডাকে উচ্চ করিয়া ॥
শুনি তা'সবার নিকটে গেলা গৌরহরি।
'বোল বোল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি ॥

তা'সবারে স্তুতি করে' তোমরা ভাগ্যবান্;
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥"

পূর্ব্বে যে শ্লোকটি উদ্ধার করা হইল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেরই শ্লোক। একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের শ্লোক। উদ্ধবকে শ্রীভগবান্ এক ব্রাহ্মণের ইতিহাস বলিয়া সেই ব্রাহ্মণেরই উক্তিরূপে এই শ্লোকটী বলেন। সেই উপাখ্যানের মধ্যে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। এ জন্য উপাখ্যানটি জান প্রয়োজন।

অবন্তীনগরের ব্রাহ্মণের উপাখ্যান।

অবন্তীনগরে এক ধনবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কদর্য্য বৃত্তি আশ্রয় করিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আদৌ কোনরূপ সদ্ব্যয় ছিল না। তিনি সকলের সহিত কলহ করিতেন, সকলের অপ্রিয় আচরণ করিতেন। তাঁহার ব্যবহার এতই খারাপ ছিল যে, পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতারা পর্য্যন্ত তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন।

অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের ধননাশ আরম্ভ হইল, গৃহদাহ, দস্যুতস্করের উপদ্রব, রাজপীড়ন প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। এই আকস্মিক দারিদ্র্যে ব্রাহ্মণের উপকার হইল, কারণ দারিদ্র্যের সহিত বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ অতীত-জীবনের দুষ্কর্ম্মের জন্য সরলভাবে অনুতাপ করিতে করিতে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন। দুষ্টলোক ব্রাহ্মণের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিল। সে অত্যাচার অনির্ব্বচনীয়। ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ হইলেন না, এই সমস্ত অত্যাচার তাঁহার পরীক্ষা, এইভাবে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতেন এই দুঃখ সমুদয় আমার ভোক্তব্য।

দুঃখের কারণ মানুষ নহে, দেবতা নহে, গ্রহ, কর্ম্ম, কাল নহে,

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্নদেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃপরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্‌যঃ ॥

এই সকল দুষ্টলোক বা দেবতাগণ, গ্রহ কর্ম্ম ও কাল ইহারা কেহই

আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে। যে মন সর্ব্বদা সংস্কারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে, সেই মনই ইহার হেতু।

মনই কারণ।

অতএব মনকে নিগ্রহ করা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন সমস্তই ব্যর্থ।
"দানং স্বধর্ম্মো নিয়মোদমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥"

দান, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম ও ব্রতাচরণ, এ সমুদয় মনের নিগ্রহের উপায়মাত্র, কিন্তু মনের যে সমাধি, তাহাই পরমযোগ।

"সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ॥"

যাহার মন প্রশান্তভাবে সমাহিত হইয়াছে, দানাদিদ্বারা তাহার আর কি কার্য্য হইবে, আর যাহার আলাস্যাদিদ্বারা মন অসংযত হয়, তাহার দানাদিদ্বারাই বা অপর কি কার্য্য হইবে?

মন শান্ত হইলে পরাত্ম-নিষ্ঠার পথ দেখা যায়।

এই প্রকারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের মন যখন সমাহিত হইল, যখন বাহিরের সংসারের তরঙ্গাঘাত হইতে তিনি আপনাকে নির্মুক্ত করিলেন, তখন তিনি পরাত্মনিষ্ঠার যে সনাতন পথ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন যে, মুকুন্দচরণপদ্ম সেবদ্বারা আমি এই ঘোর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

এই পথ কল্পনামাত্র নহে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করার পর এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যেন সেই পথ দেখিতে পাইতেছেন। ইহা কল্পনা বা অনুমান নহে। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ এই পথ উপদেশ করিয়াছেন ও এই পথে বিচরণ করিয়াছেন। এই পথ যে সত্য, তাহা উপলব্ধি না করিলে মানব অগ্রসর হইতে পারে না। চারিদিকের ঘাত প্রতিঘাতে সে দুর্ব্বল

ইহাই সত্য।

হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পথের কথা জগৎকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এই পথই বৃন্দাবনের পথ।

মনের সমাধি ও বুদ্ধির জাগরণ।

পথ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইল যে, মনের সমাধি না হইলে বা বুদ্ধি জাগ্রত ও ক্রিয়ান্বিত না হইলে এই পথের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না। এইজন্য আমাদের প্রার্থনা করিতে হয়—আমার দম্ভ, দর্প, অভিমান, দূরীভূত হউক। যিনি বিশ্বাত্মা, তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁহারই কর্ম্ম তিনি করিতেছেন, আমরা যন্ত্র—কিন্তু অচেতন যন্ত্র নহি, সচেতন যন্ত্র—সচেতন ভাবে যাহা উচ্চতম ও মহত্তম বলিয়া বুঝি তাহাতে আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিব, কিন্তু অহঙ্কারের কেন্দ্রে বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া থাকিব না, আমার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মা কর্ম্মরত, তিনি আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতেছেন, আপনার অসীম মাধুর্য্য এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডলীলার মধ্য দিয়া আপনি আস্বাদন করিতেছেন।

অহঙ্কার ও লীলা।

আমার এই প্রার্থনা যে পরিমাণে সফল হইবে, অর্থাৎ এই ভাবে আমরা যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, লীলারস সেই পরিমাণে আমরা আস্বাদন করিতে পারিব। মনে করা যাউক, একটি দণ্ডের একদিকে লীলাময় ভগবান্ আর একদিকে অহংভি মানী 'আমি'। এই দণ্ডটি যেন একটা খুঁটির উপর ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এই খুঁটির একদিক্ যতটা নামিবে, আর একদিক্ ঠিক ততটা উঠিবে, যেমন তুলাদণ্ডের দণ্ড। লীলার ক্রমবিকাশে পরিদৃষ্ট হইবে যে এই 'অহঙ্কার' ক্রমে অবনত হইতেছে, আর লীলাময় তাঁহার আনন্দস্বরূপে প্রকটিত হইতেছেন।

আত্ম-নিবেদন ও লীলা-দর্শন।

শ্রীবৃন্দাবনে দেখা যাইবে যে, ব্রজদেবীগণের আত্মনিবেদন পূর্ণ হইয়াছে, অর্থাৎ যে দণ্ডটি ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরালভাবে ছিল তাহা লম্বভাবে চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

আনন্দ-ভাবের ক্রম-বিকাশ।

লীলায় এই আনন্দভাবেরই ক্রমবিকাশ দেখা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় যে, শ্রীনৃসিংহ অবতারে ভগবান্ প্রথম ধরা পড়িয়া গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে এই

রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। সে স্থানে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, নৃসিংহদেবের করাললোচন ক্রোধে দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছিল এবং তিনি জিহ্বা-দ্বারা আপনার বিস্তারিত বদনের প্রান্তভাগ পুনঃ পুনঃ অবলেহন করিতেছিলেন। হস্তিবধ করার পর সিংহের যেরূপ হয়, সেইরূপ রক্তবিন্দুতে তাঁহার কেশর ও বদন রঞ্জিত হইয়া অরুণ বর্ণ হইল এবং অন্ত্রের মালা গলদেশে দুলিতে লাগিল।

হিরণ্যকশিপু বধ।

সংরম্ভ-দুষ্প্রেক্ষ্য করাললোচনো ব্যাত্তাননান্তং বিলিহন্
স্বজিহ্বয়া।
অসৃগ্লবাক্তারুণকেশরাননো যথান্ত্রমালী দ্বিপহত্যয়া হরিঃ॥

মেঘ সকল তাঁহার জটাস্পর্শে প্রকম্পিত হইয়া বিশীর্ণ, গ্রহগণের জ্যোতিঃ তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা তিরস্কৃত এবং সাগর সকল নিশ্বাসপবনে আহত হইয়া ক্ষুভিত হইয়াছিল, দিগ্‌হস্তি সকল নিহ্রাদশব্দে ভীত হইয়া কাতরধ্বনি করিতেছিল:

নৃসিংহ মূর্ত্তি।

"সটাবধূতা জলদা পরাপতন্ গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ।
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভুর্নির্হ্রাদভীতা দিগিভা বিচুক্রুশুঃ॥"

আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ এইরূপ বিভীষিকাময়ী মুর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। হিরণ্য-কশিপু বিনষ্ট হওয়ার পর স্বর্গবাসী দেবগণের বিমানসমূহে গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, দেবতারা দুন্দুভিবাদন করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বেরা গান করিতেছেন, অপ্সরাগণ আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, আর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর, মুনি, প্রজাপতি, চারণ, বেতাল, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই মস্তকে অঞ্জলিপুট বন্ধন করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সকলেই দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, নিকটে যাইবার সাহস কাহারও হইতেছে না।

সকলের ভয়।

"সাক্ষাৎ শ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্টা তং মহদদ্ভুতম্ ।
অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা ॥"

দেবতারা স্বয়ং নিকটে যাইতে সাহস না হওয়ায় লক্ষ্মীদেবীকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু এ প্রকারের রূপ পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট বা শ্রুত না হওয়ায় ঐ মহৎ আশ্চর্য্য রূপ দর্শনে লক্ষ্মীরও অত্যন্ত ভয় হইল, তিনিও নিকটে যাইতে পারিলেন না।

তখন বেদপতি ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নির্ভীক প্রহ্লাদ নিকটে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

প্রহ্লাদের নিকট ভাব-পরিবর্ত্তন ও কারুণ্য-প্রকাশ।

প্রহ্লাদ যেমন নৃসিংহদেবের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, অমনি এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল। এতক্ষণ যে চক্ষুদুটিতে প্রলয়ের আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন প্রলয়ের বিভীষিকায় বিকম্পিত করিতেছিল, সেই চক্ষুদুটি অকস্মাৎ অতিশয় কোমল ও মধুর হইয়া উঠিল, স্নেহের অশ্রুতে চক্ষুদুটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যে হস্তের নখর বজ্র অপেক্ষাও সহস্রগুণে কঠোর, সেই হস্ত ও সেই নখর এখন অকস্মাৎ ফুলের অপেক্ষাও কোমল হইয়া গেল—তাঁহার গর্জ্জনে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ স্ফুটিত হইয়াছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তে স্নেহময় কোমল স্বর, নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের অঙ্গ হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিলেন। লীলায় শ্রীভগবান্ এই প্রথম ধরা পড়িলেন। এইবার ভগবানের যেন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কিন্তু প্রহ্লাদ নারদের শিষ্য এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রিয়মুপাসীত" যিনি পরমার্থ সত্য তাঁহাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে। কিন্তু 'ভালবাস' বলিলেই তো ভালবাসা যায় না, লাভের বা সুবিধার সম্ভাবনা আছে বলিলেও সত্য করিয়া ভালবাসা যায় না। হৃদয়ের নীরব

প্রেমের জন্ম।

আলিঙ্গনের দ্বারাই প্রেমের উদ্ভব। প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত্ত। ভগবান্ সম্বন্ধে প্রথমে আমরা শুনিয়াছিলাম, তিনি সর্ব্বাতীত, বাক্যমনের অগোচর। সে স্থানে ত হৃদয় লইয়া যাইবারই উপায় নাই, সুতরাং ভালবাসিবে কে? তাহার পর দেখা গেল, তিনি কেবল বিশ্বাতীত নহেন, তিনি বিশ্বানুগ। তাহার পর লীলা আরম্ভ হইল। তিনি নিকটে আসিলেন বটে, কিন্তু তিনি মোটেই আমাদের মত নহেন, আমাদের সঙ্গে তাঁহার কিছুই মেলে না, সুতরাং ভালবাসার মত বা আপনার করিবার মত কিছুই সেখানে নাই। এইভাবেই দিন চলিতেছিল, আজ নারদের শিষ্য প্রহ্লাদের নিকট ঠাকুর ধরা পড়িয়া গেলেন।

নারদ।

এখানে একটা কথা উঠিবে, নারদের শিষ্যের নিকট ধরা পড়েন কেন? ইহার একটু ইতিহাস জানা দরকার। নারদ কোঁদলের ঠাকুর বলিয়া জগতে বিখ্যাত। ঢেঁকি তাঁহার বাহন, এই বাহনে চড়িয়া নথ বাজাইতে বাজাইতে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে পর্য্যটন করেন। যেখানে অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্রে মিলিত হন, সেইখানেই নারদের গতি! নারদ গেলেই কোঁদল হয়। নারদের অবশ্য অন্যরূপ বর্ণনাও আছে। তিনি দেবদত্ত বীণায় মূর্চ্ছনা দিয়া নিত্য হরিগুণ গান করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণু অমৃতায়মান করিতেছেন। যাহা হউক, নারদের সঙ্গে ভগবানেরই ঝগড়া। পৌরাণিক সাহিত্যে এই ঝগড়া একটি অতি প্রধান ঘটনা।

তাঁহার ইতিহাস।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নারদের চরিত্রের যাহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যকীয় ঘটনা, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাণে যাহাকে যোনিজ সৃষ্টি বলে, অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইয়া পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিবে, নারদ ইহার বিরোধী। মানুষ সংসারী হইবে, সমাজ গড়িবে, জীবনসংগ্রামে আত্মহারা হইয়া আঁধারে আঁধারে বহু জন্ম পর্য্যটন করিবে, নারদ ইহার বিরোধী। নারদ

চাহেন, ভগবানের স্বরূপের পরমানন্দরস সকলের হৃদয়ে অব্যাহত-ভাবে নিত্য তরঙ্গায়িত হউক এবং সকলে তাঁহার ন্যায় একমাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া থাকুক। নারদের এই মত একালের পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন পণ্ডিতও বোধ হয় কখন কখন প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় যে, ভাগবতের মতে এই মত ঠিক নহে।

দক্ষের সহিত বিরোধ।

দক্ষ প্রজাপতির উপর ভার পড়িয়াছে, মিথুন-সৃষ্টির ব্যবস্থা করিবার জন্য। দক্ষ প্রজাপতির অযুত পুত্র, তাহাদের নাম হর্য্যশ্ব। প্রজাপতি তাহাদের উপর এই সৃষ্টিকার্য্যের ভার দিলেন। তাঁহারাও প্রজা-সৃজন-কামনায় তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে একদিন নারদ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত। নারদ তাঁহাদের কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"উবাচ চাথ হর্য্যশ্বাঃ কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ।
অদৃষ্ট্বান্তং ভুবো যূয়ং বালিশা বত পালকাঃ॥
তথৈকপুরুষং রাষ্ট্রং বিলং বা দৃষ্টনির্গমম্।
বহুরূপং স্ত্রিয়ঞ্চাপি পুমাংসং পুংশ্চলীপতিং॥
নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহম্।
ক্বচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি।
কথং স্বপিতুরাদেশমবিদ্বাংসো বিপশ্চিতঃ।
অনুরূপমবিজ্ঞায় অহো সর্গং করিষ্যথ॥"

দক্ষপুত্রের বৈরাগ্য গ্রহণ।

নারদ বলিলেন, অহে হর্য্যশ্বগণ তোমরা মূর্খ! তোমরা পৃথিবীর পালক হইবে, প্রজা সৃষ্টি করিবে, তোমরা কি ভূমির অন্ত দেখিয়াছ? যেখানে একমাত্র পুরুষ, সেই রাজা; যেখান হইতে কাহাকেও নির্গত হইতে দেখা যায় নাই, সেই বিল; যাহার বহুরূপ সেই স্ত্রী; যিনি পুংশ্চলীর পতি সেই পুরুষ; সেই নদী, যাহা উভয় দিকে বহিতেছে; সেই গৃহ, যাহা পঞ্চবিংশতি পদার্থদ্বারা অতিশয় অদ্ভুত; সেই হংস, যাহা চিত্রধ্বনিযুক্ত; সেই বস্তু, যাহা স্বতন্ত্র;

ভ্রমণশীল ও বজ্রদ্বারা নির্ম্মিত—এই সমুদয় না জানিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে? তোমাদের পিতা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অনুরূপ কি, তাহাও বিশেষরূপে জানা উচিত—তাহা না জানিয়া সৃষ্টিকার্য্যে অগ্রসর হওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে।

নারদের প্রশ্ন—তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রশ্ন। ইহা প্রবৃত্তি-মার্গের বিরোধী।

নারদের এই সমুদয় প্রশ্নে হর্য্যশ্বগণের 'মাথা খারাপ' হইয়া গেল, বিশ্বের রহস্যময় মৌলিক প্রশ্নসমূহের সমাধানের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন 'ভূমির অন্ত না জানিয়া' এই যে কথা বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর একমাত্র সাক্ষী, তাঁহার অন্য আশ্রয় নাই, নিজেই নিজের আধার, সেই অভব অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া ও তাহাতে চিত্ত সমর্পণ না করিয়া বৃথা কর্ম্ম করিলে কি ফল হইবে? যে বিলের কথা বলিলেন, তাহা পরমজ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাকে না জানিয়া বৃথা নশ্বর স্বর্গ-সাধন কর্ম্মসকল করিলে তাহাতে কি ফললাভ হইবে? "বহুরূপা-স্ত্রী" আমাদের মোহকারিণী বুদ্ধি, যাহা রজঃ প্রভৃতি নানাগুণে সমন্বিতা—যে মানব ঐ বুদ্ধির অন্ত না পায়, তাহার অশান্ত কর্ম্মসকল দ্বারা কি ফল হইবে? "পুংশ্চলীর পতি পুরুষ" মায়াসঙ্গী, ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট জীব। সৃষ্টি ও প্রলয়কারিণী মায়া—সেই নদী যাহা উভয়দিকেই বহিতেছে। পঞ্চবিংশতি পদার্থে নির্ম্মিত গৃহ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্চর্য্য আশ্রয় অন্তর্য্যামী পুরুষ, তিনি কার্য্যকারণ সংঘাতের অধিষ্ঠাতা, তাঁহাকে যে পুরুষ না জানে, তাহার স্বাতন্ত্র্য-কৃত কর্ম্ম-সকল নিষ্ফল। বিচিত্র কথাযুক্ত হংস—ঈশ্বরপ্রতিপাদক শাস্ত্র। ক্ষুর ও বজ্রাদিদ্বারা নির্ম্মিত যে স্বয়ং ভ্রমণশীল বস্তুর কথা বলিয়াছেন, তাহা সুতীক্ষ্ণ কালচক্র—সেই কালচক্রের বিষয় অবগত না হইয়া অসৎ কাম্য কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিলে কি ফল হইবে।

এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া হর্য্যশ্বগণ নারদের শিষ্য হইলেন এবং প্রজাসৃষ্টির কার্য্য অর্থাৎ সংসার ও সমাজপ্রতিষ্ঠার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই পথে প্রস্থান করিলেন, যথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না।

দক্ষপ্রজাপতি নারদের নিকটেই সংবাদ পাইলেন ও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মনে প্রজাসৃষ্টির জন্য ঔৎসুক্য প্রবল ভাবেই ছিল, তিনি সবলাশ্বনামক সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপন্ন করিলেন। এই পুত্রগণ পিতার আদেশে প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্য ব্রতধারণপূর্ব্বক নারায়ণসরোবরে গমন করিলেন ও শুদ্ধ চিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি হর্য্যশ্বগণের ন্যায় সবলাশ্বগণের চিত্তেও বৈরাগ্যভাব জাগাইয়া দিলেন।

ইহার পর নারদের অভিশাপ। দক্ষপ্রজাপতি শোকে জ্ঞানশূন্য হইলেন, নারদের নানারূপ তিরস্কার করিয়া এই অভিশাপ দিলেন।

দক্ষ-প্রজাপতি-কর্ত্তৃক নারদের অভিশাপ ও নিবৃত্তি-মার্গের গতিরোধ।

"তন্তুকৃন্তন যন্নস্ত্বভদ্রমচরঃ পুনঃ।
তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্‌ভ্রমতঃ পদম্‌॥"

তুমি সন্তানচ্ছেদক, আমাদের পুত্রগণকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া অভদ্রাচরণ করিয়াছ, তজ্জন্য কুত্রাপি লোকমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে না।

নারদের ত্রিলোকে স্থান নাই। সৃষ্টিচক্র ঘুরিতে লাগিল, তত্ত্বজ্ঞানহীন জীবকুল মায়াচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। নারদের কিন্তু নৈরাশ্য নাই। নারদ যেন ভগবান্‌কে বলিলেন, তুমি ভগবান্‌, তোমার সুস্পষ্ট অনুভূতি হইতে জীবগণকে বিচ্যুত করিয়া আপনার স্বরূপ গোপন করিয়া রাজরাজেশ্বর হইয়া যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করিতেছ। জগৎ তোমায় চেনে না, কিন্তু আমি জানি তুমি ভিখারীর রাজা, তুমি পরম ভিখারী! তুমি ভক্তের দ্বারে দ্বারে প্রেমবিন্দু ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও। নারদ এখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভগবান্‌কে ধরিয়া দিব। সৃষ্টির প্রবাহ রুদ্ধ হইবার নহে, এই সংসারকে উপেক্ষা করিয়া বা অস্বীকার করিয়া নহে, ইহাকে স্বীকার করিয়া ইহারই মধ্যে ভগবানের স্বরূপের যে ভিখারীভাব তাহা প্রতিষ্ঠা করিব। ইহাই নারদের প্রতিজ্ঞা।

নারদের প্রতিজ্ঞা।

প্রহ্লাদ যখন মাতৃগর্ভে, তখন ইন্দ্র, হিরণ্যকশিপু তপস্যা করিতে যাওয়ায় সুবিধা পাইয়া, তাঁহার পুরী আক্রমণ করেন এবং প্রহ্লাদের মাতাকেও বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। নারদ আসিয়া ইন্দ্রকে তিরস্কার করেন এবং প্রহ্লাদের মাতাকে আপনার আশ্রমে রাখেন। নারদ যোগবলে দৈব সহস্র বৎসর প্রহ্লাদকে গর্ভমধ্যে রাখিয়াছিলেন, প্রসব হয় নাই, কারণ সন্তান প্রসূত হইলে ইন্দ্র অনিষ্ট করিতে পারেন। এই দৈবসহস্র বৎসর কাল নারদ প্রহ্লাদকে ভক্তির উপদেশ করেন। নারদের শিষ্য প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের নিকট ভগবান্ প্রথম ধরা পড়িয়া গেলেন।

প্রহ্লাদের নারদের নিকট শিক্ষা-লাভ।

নারদ শুদ্ধাভক্তির প্রচারক, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের রচনাও নারদের প্রেরণাতেই হইয়াছে, এই শুদ্ধা ভক্তির দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ ধরা পড়িয়া যায়, অন্য উপায়ে নহে।

শুদ্ধাভক্তি।

নৃসিংহ অবতারে ভগবান্ প্রথম ধরা পড়েন। তাহার পর একটা ঘোষণা পড়িয়া গেল। সেই ঘোষণা এই। আমরা ভাবিতাম ভগবান্ কোন অংশেই আমাদের মত নহেন। তিনি কেবল বজ্রের মত কঠিন, এখন দেখা গেল, শুধু তাই নহে, তিনি আবার ফুলের মত কোমল। তাহা হইলে বোধ হয়, ভগবানের সহিত আমাদের মিলিতে পারে। কারণ আমরা যে ভিখারী। আমাদের চৈতন্যের যাহা মূল তাহার সফলতা, সার্থকতা ও পূর্ণতা যদি তাহাতে থাকে, তবেই তো তাঁহার সহিত আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ হইতে পারে, নতুবা অসম্ভব।

চোর ধরা।

নৃসিংহ

ভগবান্ ধরা পড়িয়া যাওয়ার পর ভাবিলেন, আবার যদি বড়লোক হইয়া যাই, তাহা হইলে লোকে গায়ে ধূলি দিবে। এইবার বামনরূপে আবির্ভাব! কশ্যপের উপদেশে অদিতি যখন পয়োব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবানের পূজা করিতেছেন, তখন ভগবান্ আসিলেন—চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম লইয়া নবীন নীরদশ্যাম শ্রীভগবান্ আসিলেন। ভগবান্ বলিলেন, "আমি তোমার পুত্র হইয়া আসিব।" অদিতি ভাবিলেন তুমি পুত্র হইয়া

আসিলে আমার লাভ কি? আমি তো পুত্রের মত তোমাকে ভালবাসিতে পারিব না, তোমার যে রূপ দেখিলেই প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইবে! ভগবান্ বলিলেন, আমি এমনভাবে আসিব যে, তুমি আমায় ঠিক পুত্রের মত ভালবাসিতে পারিবে।

ভগবান্ বামনরূপে আসিলেন। বামনদেবের উপনয়ন শ্রীমদ্‌-ভাগবতের একটি বড় ঘটনা। ভাগবতে নাই, কিন্তু অন্যত্র আছে যে নারদ ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং ভগবানের এই ভিখারীভাব দেখাইয়াছিলেন। ভিখারীভাবই যে ভগবানের স্বরূপ। তাহার পরেই দেখিতে পাই, বামনমূর্ত্তি ভগবান্ ভিক্ষায় চলিয়াছেন। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। বলি বৃহৎযজ্ঞ করিয়াছেন, তাহার নাম বিশ্বজিৎ। ভিখারীর বেশে ভগবান্ উপস্থিত। ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করিলেন। বলি তাহা দিলেন। অনেকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু বলি তাহ শুনিলেন না। তখন ভগবান্ দুইপদে বলির সমুদয় রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ বলিলেন, এখন তৃতীয় চরণ রাখি কোথায়? বলি বলিলেন, তৃতীয় চরণ আমার মস্তকে।

বামন ও তাঁহার ভিক্ষা।

ভগবান্ এই যে ভিক্ষা করিলেন, ইহাতে তাঁহার কি লাভ হইল—তাহাই ভাবিবার কথা ত্রিলোকের রাজ্য তো ইন্দ্র পাইলেন, তাঁহার লাভ এই হইল যে, তিনি বলির দ্বারে চিরদিনের মত দ্বারীভাবে বন্দী হইয়া থাকিয়া গেলেন। এ বড় মন্দ কথা নয়। প্রথমে এমন ভাবে আসিতেন, যেন মোটেই আমাদের মত নহেন, শেষে প্রহ্লাদের নিকট ধরা পড়িয়া ভিক্ষা আরম্ভ হইল। গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া বলিলেন, "ওগো আমি ভিখারী,, আমায় ভিক্ষা দাও" গৃহস্থ ভিক্ষার থালা হস্তে আনিয়া বলিল "এই ধর, ভিক্ষা লও" ভিক্ষার থালা পড়িয়া থাকিল,তিনি বলিলেন "ওগো তুমি আমাকেই তবে লও।" এই বলিয়া ভিখারী আত্মদান করিলেন।

ভিক্ষার লাভ· ভগবানের আত্ম-দান।

ইহার পর ভগবান্ যে দুই মূর্ত্তিতে আসিলেন তাহার একটি ঐশ্বর্য্য-বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ—দ্বিতীয়টীতে ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে মিলন

পরশুরাম ও রামচন্দ্র।

একাধারে রাজাও ভিখারী। তাহার পর বৃন্দাবনলীলা—এই বৃন্দাবনে ভিখারীভাবের পরিপূর্ণতা।

মন সংযত হউক, হৃদয় নির্ম্মল হউক, অহঙ্কার দূরীভূত হউক; সংসার ছাড়িয়া নহে, সংসারের তরঙ্গে ভাসিয়া সংসার-সংগ্রামে ক্ষত ও বিক্ষত হইয়া আমরা সেই বৃন্দাবনপুরন্দর, ভিখারী ভগবানের সাক্ষাৎ পাইব।

ভগবান্ ভিখারী।

শ্রীভগবানের এই ভিখারীভাবই মূল ও প্রধান ভাব। আমরা তাহা প্রথমে ধারণা করিতে পারি না, তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাবই আমরা বুঝিতে পারি। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনকে ভগবান্ বলিয়া ধারণা করা বড় কঠিন, কারণ জগৎ ঐশ্বর্য্যের উপাসক। কিন্তু ঐশ্বর্য্যে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ হয় না, মানুষও ঐশ্বর্য্য-উপাসনায় আপনার জীবনের শেষ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় না। বৃন্দাবনের লীলা, বাহির হইতে দেখিলে অবশ্য ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই। পূতনাবধ, অঘাসুর, বকাসুর, বৎসাসুর বধ, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের যাহা প্রাণ, তাহার অভিব্যক্তি এই সমস্ত লীলা নহে। সাধারণ বহির্মুখ মানব এই সমস্ত অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অনুভব করে, কিন্তু তাহারা ভাগবতধর্ম্মের তত্ত্ব জানে না এবং মানবাত্মার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ও তাহার পরিতৃপ্তি কি তাহাও জানে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশানুযায়ী যাহারা শ্রীবৃন্দাবনলীলা উপলব্ধি করেন, তাঁহাদের এই মত যে শ্রীকৃষ্ণ অসুর সংহার করেন না। "বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণকরে অসুর সংহারে" বিষ্ণু ভগবানের একটি বিশেষ প্রকাশ, বিশ্বপালন তাঁহার উদ্দেশ্য—এখানে ভগবানের স্বরূপের প্রকাশ নাই—এখানে অর্থাৎ বিষ্ণুতে তাঁহার যেন একটি আত্মকৃত বা স্বেচ্ছাকৃত সীমাবদ্ধতা (Self-imposed limitation) আছে। যেমন একজন মানুষ বন্ধুগণ সঙ্গে যখন আমোদ অহ্লাদ করে, অথবা স্ত্রীপুত্র লইয়া প্রেমের সংসার পাতিয়া জীবনের রস আস্বাদনে মত্ত থাকে, তখন সে প্রাণ খুলিয়া হাসে—কিন্তু সেই লোক

অসুর সংহার।

আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে যাইয়া বিচারাসনে উপবেশন করে, তখন তাহার আর একভাব প্রকাশিত হয়। তখন তাহার প্রাণ যদি হাসিতেও চায়, তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া সেই হাসি চাপা দিয়া গম্ভীরভাবে বিচার কার্য্য চালাইতে হইবে। ইহারই নাম স্বেচ্ছাকৃত সীমাবদ্ধতা।

বিশ্বের ও মানবের অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্যে আমরা ভগবান্‌কে দেখিতে শিখিয়াছি বলিয়া তাঁহার স্বরূপের মাধুর্য্যলীলা আস্বাদন করিতে পারি না—এই জন্যই শ্রীবৃন্দাবনের অনেক ব্যাপার আমাদের দুর্ব্বোধ্য হয়।

স্বরূপ প্রকাশ।

জগতের দিক্ হইতে ভগবান্‌কে দেখা, আর ভগবানের দিক্ হইতে জগৎকে দেখা, এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। 'ভগবানের দিক্ হইতে যে জগৎ দেখা' তাহাতে জগৎ নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম ভগবানের স্বরূপ দেখা। স্বরূপ দেখাকে As He is in His own nature বলা যায়; আর জগতের দিক্ হইতে দেখাকে As He seems to us when inferred from the manifested universe of ours বলা যায়। শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব ও তাহার উপসংহার শ্রীচৈতন্যলীলা আমাদের এই গৌড়মণ্ডল ভূমির ভক্ত আচার্য্যগণের মতানুযায়ী বুঝিতে হইলে শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার স্বরূপে দেখিতে হইবে। এই স্বরূপে দেখার অভ্যাস না থাকিলে কিছুতেই শ্রীবৃন্দাবন-রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

স্বরূপে যাঁহারা শ্রীভগবানের আনন্দভাব ধারণার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার ভিখারীভাবের পরিপূর্ণতা দেখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যেন এই ভিখারীভাব কিছু গোপন ছিল, সেই জন্য শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা।

স্বয়ং ভগবান্।

. শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে ভক্তগণ 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়াছেন। 'ভগবান্' ও 'স্বয়ং ভগবান্' এই দুইয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। স্বরূপে দর্শন করিলেই স্বয়ং ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যাঁহার

অংশবিভব, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ ভগবান্—আর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্!

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে যাঁহারা ভগবান্ বলিলেন, তাঁহারা ভগবান্‌কে কোথায় কি ভাবে দেখিলেন—আজ জগৎ যদি তাহা চিন্তা করিতে পারিত, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই জগতের যুদ্ধ-কোলাহল, জীবনসংগ্রামের ভীষণ ও তীব্র প্রতিযোগিতা থামিয়া যাইত। আমরা দেখিতাম, ভগবান্ আমাদের দুয়ারে ভিখারী বেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, অশ্রুসজল নেত্রে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এই ভাব প্রত্যক্ষ করিলে আর কি কেহ শক্তি লইয়া ঘরে বসিয়া স্বার্থসাধন করিতে পারিত? শক্তির কি অপব্যবহার হইত? তাহা হইলে বলবানের বল দুর্ব্বলকে সবলতায় উন্নীত করিবার জন্যই নিযুক্ত হইত—জ্ঞানী অজ্ঞানের কুটিরে কুটিরে ঘুরিয়া ডাকিয়া বলিতেন, "তুমি আমার সেবা গ্রহণ কর, নতুবা আমার জীবন বিফল হইয়া যাইতেছে" ধনী ধন লইয়া দরিদ্রের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া 'সেবা-লও' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। মানবের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হইলে মানব স্বয়ং ভগবান্‌কে ভিখারীর বেশে দেখিতে পায়।

ভগবান্ ধনী।

ভিখারী-ভাবের মধ্য দিয়া শ্রীবৃন্দাবনলীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ইহা আমরা জানিতাম না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দেখিয়া এই রহস্য আমরা উপলব্ধি করিলাম। কেবল যে ভগবান্ ভিখারী, তাহা নহে, যাঁহারা ভগবানের স্বগণ তাঁহারা সকলেই ভিখারী। আবার তাঁহাদের শিক্ষাও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, বামনদেবের ভিক্ষার মত—ভিক্ষা দিতে কেহ অগ্রসর হইলে নিজেকেই ভিক্ষা দিয়া ফেলেন; বৃন্দাবনে ঠিক তাহাই হইয়াছিল—ব্রজগোপীগণের নিকট তিনি ঋণী হইয়াছিলেন। গোপীকাগণ দৃশ্যতঃ অনেক হইলেও তাঁহারা শ্রীরাধার গণ। শ্রীমতী রাধিকার নিকট ভগবান্ ঋণী হইয়াছিলেন, সেই ঋণ পরিশোধের জন্যই তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভাব, ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য-

গণের অভিমত। লীলায় তিনি কি প্রকারে ঋণী হইলেন, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে, তাহা হইলে নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় অতীতকালের যাবতীয় লীলা কি প্রকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

পূর্ব্বে বলা হইল যে, আনন্দময় পরমপুরুষকে তাঁহার স্বরূপে উপলব্ধির চেষ্টার দ্বারাই শ্রীবৃন্দাবনলীলা বুঝিতে পারা যাইবে। এইভাবে লীলার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসা গেল, তখন দেখি ভগবান্ যেন মানুষকে হাতে চাপিয়া ধরিয়াছেন। মানুষ তো ভগবানের দিকে চাহিবে না, কারণ তাহার ভয়, পাছে, ভগবানের দিকে চাহিলে তাহার বড়সাধের সংসারস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। কাযেই সে চোক বুঁজিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীবৃন্দাবনে দেখা গেল যে সাধারণজ্ঞানে আমরা যাহাকে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরোধী ও সংসার বন্ধনের হেতু বলিয়া বিবেচনা করি, এখানে তাহাই ভগবান্‌কে অস্বাদন করিবার উপায়। তাহারই মধ্য দিয়া ভগবান্ ভক্তের হইয়াছেন। নাম আর রূপ, এই দুই ভববন্ধনের প্রধান রজ্জু। আর শ্রীবৃন্দাবনলীলায় এই দুই তাঁহাকে পাইবার উপায়—তবে নাম জগন্মঙ্গল হরিনাম, আর রূপ শ্যামসুন্দর মদনমোহন রূপ!

বৃন্দাবন লীলার উদ্দেশ্য।

এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবনলীলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে।

"স্বমূর্ত্ত্যা লোক-লাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥
আস্তীর্য্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্যহ্যঞ্জসানুকৌ।
তমোহনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥

এই শ্লোক দুইটিতে ভগবান্ কিজন্য আসিয়াছিলেন, তাহাই বলা হইতেছে। তাঁহার মূর্ত্তি লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্তিকর। শ্রীধরস্বামী

তাঁহার টীকায় এই নির্ম্মুক্তি পদটির দুইরূপ অর্থ করিলেন। এক অর্থ করিলেন "লোকানাং লাবণ্যস্য নির্ম্মুক্তিস্ত্যাগো যথা যামপেক্ষ্য লোকেষু লাবণ্যং নাস্তীত্যর্থঃ। যথা লোকেভ্যো লাবণ্যস্য নির্ম্মুক্তির্দানং যতঃ যৎসংপর্কেণ লোকা লাবণ্যবন্তো ভবন্তি॥" অর্থাৎ যেরূপ দেখিলে আর অন্য কোন বস্তুর রূপ, রূপ বলিয়া মনেই হইবে না, আর জগতে যে রূপ রহিয়াছে, তাহা তাঁহারই রূপের সম্পর্কে। এইরূপ ভগবানের রূপ। এই রূপের দ্বারা তিনি মানবের নয়ন আকর্ষণ করিলেন, নিজের বাক্যের দ্বারা স্মরণকারীর চিত্ত হরণ করিলেন, নিজের পাদপদ্মের দ্বারা মানবের সংসারগমনাদি ক্রিয়া নিবৃত্ত করিলেন এবং পৃথিবীময় শোভন কীর্ত্তি বিস্তার করিলেন। এই সকল করার পর তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার দ্বারা লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলেন। এই শ্লোকই বিশেষরূপে আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণলীলার তাৎপর্য্য এই শ্লোকের আশ্রয়ে আলোচনা করিলে ভিখারী ভগবান্‌কে বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত